কাব্যজিজ্ঞাসা

(রবীন্দ্র-কাব্যের মূলসূত্র)

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, পি-আর্-এস্
কলিকাতা যোগমায়া দেবী কলেজের ইংরাজী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক
ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের উপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণ
(পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত)

মিত্রবি

নবিহার

মিত্রবিহার প্রাইভেট লিমিটেড
৫ শঙ্কর ঘোষ লেন • কলিকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ—রাস পূর্ণিমা ১৩৫৮
দ্বিতীয় সংস্করণ—দশহরা ১৩৭১

প্রচ্ছদ
শ্রীনিমাই নন্দী

প্রকাশিকা শ্রীমতী মায়া মিত্র
মিত্রবিহার প্রাইভেট লিমিটেড
৫ শংকর ঘোষ লেন । কলিকাতা ৬

মুদ্রক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্-এ
বোধি প্রেস । ৫ শংকর ঘোষ লেন । কলিকাতা ৬

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান সংস্করণে কয়েকটি নূতন অধ্যায় যুক্ত হইয়াছে এবং পূর্ব্বতন সংস্করণের একটি অধ্যায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। অপরাপর অধ্যায়গুলি অল্পাধিক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত ও পুনর্লিখিত হইয়াছে। সে হিসাবে বর্ত্তমান সংস্করণকে প্রায় নূতন গ্রন্থ বলা যায়।

প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর অনেকেই আশা করিয়াছিলেন যে এই গ্রন্থের মন্তব্যগুলি সম্প্রসারণ করিয়া রবীন্দ্র-কাব্য সম্বন্ধে একটি বিস্তারিত আলোচনা-গ্রন্থ প্রকাশ করিব। দুঃখের বিষয়, সময়াভাবে ও অন্যান্য নানা কারণে এবারও তাহা করা সম্ভব হইল না। ফলে বর্ত্তমান সংস্করণও সংক্ষিপ্তসার রহিয়া গেল। অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে পাদটীকায় ইঙ্গিত মাত্র দিয়া নিরস্ত হইতে হইল।

রবীন্দ্রনাথের কবিতাবলীর বিশদ ব্যাখ্যা নহে, রবীন্দ্র-কাব্যের মূলসূত্রের নির্দ্দেশই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এই দুরূহ প্রয়াসে যদি কিঞ্চিন্মাত্র সাফল্য লাভ করিয়া থাকি, তবে কৃতার্থ বোধ করিব।

প্রথম সংস্করণ কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে যে বিলম্ব হইল তজ্জন্য অনুরাগী পাঠকবৃন্দের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি।

দশহরা
১৩৭১

বিনীত
গ্রন্থকার

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

"প্রভু কহে, এহ বাহ্য, আগে কহ আর"---এই মহাবাণী স্মরণ করিয়া আমি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে রবীন্দ্রকাব্যের তাৎপর্য্য ও বৈশিষ্ট্য এবং রবীন্দ্র-মানসের অভিব্যক্তির ধারা নির্ণয়ের প্রয়াস করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা সুধীজনের বিবেচ্য।

* * * *

আমার আলোচনা বিচারমূলক, তবে আশা করি তাহা একেবারে "শুষ্কং কাষ্ঠং" হয় নাই। উচ্ছ্বাসকে যুক্তি এবং কাব্যের গদ্যানুবাদকে সমালোচনা বলিয়া যাহাতে ভুল না করি, সে বিষয়ে সাবধান হইবার চেষ্টা করিয়াছি।

* * * *

রবীন্দ্র-কাব্য সম্বন্ধে শেষ কথা বোধ হয় কখনই বলা হইবে না। এই গ্রন্থ পাঠে সেই সুদূর লক্ষ্যের প্রতি যদি কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তবেই শ্রম সার্থক বিবেচনা করিব। অলমতিবিস্তরেণেতি।

রাস পূর্ণিমা
১৩৫৮

বিনীত
গ্রন্থকার

সূচীপত্র

প্রস্তাবনা

"স্বর্গের চক্রান্ত"

(কথিকা)

"স্বর্গের চক্রান্ত" সুরু হয়েছে।

পিতামহ ব্রহ্মার কাছে পৌঁছেচে আর্ত্ত ধরিত্রীর ক্রন্দন—

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব

সেখানে লেগেই আছে। মর্ত্ত্যের উদ্ধার যে কি করে হবে, তা কেউ ভেবে স্থির কর্ত্তে পার্চ্ছেন না।

যুগে যুগে বিষ্ণু ভূভার হরণের জন্য অবতীর্ণ হন, কিন্তু এবার তিনি আর যেতে রাজী নন। তিনি বলে পাঠিয়েছেন যে মানবের উদ্ধারের চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য এবং মানবের মুক্তির জন্য তিনি বারে বারে চেষ্টা করেছেন, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ ক'রে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন ক'রে দিয়েছেন, আদর্শ মানবের চরিত্র লোকের সাম্‌নে তুলে ধরেছেন। মানব তাঁর পূজা করেছে এবং এখনও করে, কিন্তু তাঁর মহৎ আদর্শের অনুসরণ করে নি। এই সে দিনও তিনি শাক্যমুনিরূপে গিয়ে ত্যাগ ও প্রেমের বাণী প্রচার করে এসেছেন। কিন্তু শাক্যমুনির ভক্তরা তাঁর বাণী পালন করে নি, করেছে তাঁর নখদন্তের পূজা, আর হিংস্র জন্তুর মত পরস্পরকে করেছে নখদন্তাঘাত। তাই তিনি স্থির করেছেন যে কাল পূর্ণ না হ'লে তিনি আর মর্ত্ত্যে যাবেন না, এবং যখন যাবেন তখন বর্ত্তমান নরজাতির উৎসাদন ক'রে আসবেন।

ধূর্জ্জটি ত অনন্ত কাল ধরে ধ্যানমগ্ন। মহামায়ার রহস্যভেদ কি আজও হ'ল না? যা হোক্, তাঁকে খবর দেওয়া বৃথা। ধ্যানভঙ্গের পর তিনি যদি এই সব অনাচারের সংবাদ পান, তা হ'লে তাঁর তৃতীয় নয়নের সুপ্ত বহ্নি হয়ত আবার জ্বলে উঠ্‌বে এবং ব্রহ্মার সুকুমার সৃষ্টি —নর—হয়ত মারের মতনই অবিলম্বে ধ্বংস হবে। কিংবা আপন ভুলে এমন প্রলয় নাচন আরম্ভ কর্ব্বেন যে ব্রহ্মার জটিল সৃষ্টির সমস্ত বাঁধনই খুলে যাবে।

তবে, উপায় কি?

* * * *

ব্যথিত স্বর্গে সেই নির্ব্বাক্ সভাগৃহে ব্রহ্মার করুণ নয়ন দুইটি সন্ধ্যাতারার মত ফুটিয়া রহিল।

অন্তরালে দেবী ভারতীর নয়ন হইতে দু'ফোঁটা অশ্রু যেন বাল্মীকির দুটি শ্লোকের মতই ঝরিয়া পড়িল।

(২)

এমন সময় রক্তভাল লাজনম্রশিরে একজন অগ্রসর হইয়া ব্রহ্মার চরণে একটি শ্বেত শতদল রাখিয়া প্রণাম করিল।

সভাস্থ সকলে চাহিয়া দেখিল, সে দেবী ভারতীর মালঞ্চের মালাকর। সকলে বলিত যে ভারতীর বিশেষ অনুগ্রহ ও প্রসাদ সে লাভ করিয়াছিল। স্বর্গে সে নবাগত। পূর্ব্বে সে ছিল অলকার অধিবাসী, নটরাজের ভক্ত। মহাকালের নৃত্যের তালে সে পাইয়াছিল মুক্তির মন্ত্র। তাহার প্রিয়ার সহিত একাসনে বসিয়া একমনে নটরাজের পূজা করিত, ধূর্জ্জটির মুখের পানে পার্ব্বতীর হাসি দেখিয়া সে ধন্য হইত। একদা দোলফাগুনের চাঁদের আলোয় স্বাধিকারপ্রমত্ত হওয়ায়

সে শাপেনাস্তংগমিতমহিমা হইয়া বর্ষকাল পৃথিবীতে বিরহ যাপন করিয়াছিল। সেই সময়ে সে দেখিয়াছিল ধরণীর অতুল সৌন্দর্য্য, আর অনুভব করিয়াছিল মানবহৃদয়ের অনন্ত মাধুর্য্য। সমুদয় মানবের সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া তাহার হৃদয় অক্ষয় সুন্দর হইয়াছিল। নিজে বিরহের ক্লেশ ভোগ করিবার সময় বিড়ম্বিত মানবের প্রতি তাহার গভীর সহানুভূতির উদ্রেক হইয়াছিল। অনেক সময় অর্দ্ধরাত্রি অনিদ্র-নয়ান থাকিয়া সে ভাবিত—মানুষকে

> কে দিয়াছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান ?
> কেন ঊর্দ্ধে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ ?
> কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ ?

পরে পুণ্যফলে তাহার গতি হয় ব্রহ্মলোকে। মানবের প্রতি তাহার অপরিসীম সহানুভূতি দেখিয়া মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহার বীণাযন্ত্র তাহাকে দান করিয়াছিলেন। সঙ্গীত ও কাব্যে তাহার অতুল অধিকার জন্মিয়াছিল, সুরসভাতলে উর্ব্বশী তাহারই ছন্দের তালে নৃত্য করিত।

(৩)

ব্রহ্মা স্মিতমুখে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বৎস, কি চাও ?

সে বলিল,—প্রভু, আমাকে অক্ষম মানবের সেবার অধিকার দিন।

ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার উপকরণ কি কি ?

সে বলিল,—প্রভু, শুধু এই ছিন্নতন্ত্রী বীণা, আর আমার যাত্রা-সহচরীর দেওয়া এই অম্লান মাধবীমঞ্জরীর রাখি।

একটু ভাবিয়া ব্রহ্মা বলিলেন,—যাও, বৎস, তোমার পন্থা জয়যুক্ত

হউক্। মানবের মুক্তির যথার্থ সন্ধান তুমিই পাইয়াছ। রবির ন্যায় দীপ্তি হইবে তোমার প্রতিভার ও ইন্দ্রের ন্যায় গৌরব হইবে তোমার জীবনের। বিশ্ব-ভারতীর বাণী তোমার কণ্ঠে ধ্বনিত হইবে। অশীতি-বর্ষকাল এই বাণী মর্ত্ত্যে প্রচার করিয়া রাখি-পূর্ণিমার দিনে আবার এখানে ফিরিয়া আসিবে।

কবিগুরু

কবিগুরু

(১)

আমাদের দেশে মহাপুরুষ অনেক জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের স্মৃতি দেশ যত্নে রক্ষা করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্মরণে শিক্ষিত বাঙ্গালী হৃদয়ে হৃদয়ে যে স্পন্দন অনুভব করেন, তাহা অন্য কোন মহাপুরুষের স্মৃতিতে করেন কি না সন্দেহ। অবশ্য কোন কোন দিক্ দিয়া রবীন্দ্র-নাথের অপেক্ষা মহত্তর পুরুষের আবির্ভাব যে আধুনিক কালেও বঙ্গদেশে হয় নাই তাহা নহে। তাঁহারা আমাদের নমস্য, তাঁহাদের কাছে আমরা ঋণী, তাঁহাদের দান দেশকে উন্নত বা সমৃদ্ধ করিয়াছে, তাঁহাদের ধী ও চরিত্রের গৌরব দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে। কিন্তু তবুও স্বীকার করিতে হয় যে, রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি আমাদের মর্ম্মে ও রক্তে যে দোলা আনিয়া দেয়, যে পুলকের আভাস মনে সঞ্চার করে, তাহা বোধ হয় আব কাহারও স্মৃতিতে আমরা অনুভব করি না। অন্যান্য মহাপুরুষদের আমরা ভক্তি করি, রবীন্দ্রনাথকে আমরা সকল হৃদয় দিয়া ভালবাসি, রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি আমাদের কাছে শুধু তাঁহার স্মৃতিপূজার দিন নয়, তাহা আমাদের অন্তরাত্মার উৎসবের দিন।

রবীন্দ্রনাথের স্মরণ মাত্রে আমাদের যে এই পুলকমিশ্র হৃৎস্পন্দন হয়—এ কি শুধু তাঁহার কবিত্বের জন্য? এইজন্যই কি সরস্বতী পূজার ন্যায় নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে রবীন্দ্রস্মৃতিপূজার ভিড় জমিয়া উঠে? মহাকবি ত আরও অনেক জন্মিয়াছেন। **Shakespeare** জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, কিন্তু তাঁহার জন্মদিনে কি ইংরেজ-হৃদয়ে

এমন হিল্লোল বহিয়া যায় ? এমন কি সমগ্র ভারতের মুগ্ধ প্রীতির অর্ঘ্য যে মহাকবি দ্বিসহস্র বৎসর ধরিয়া পাইয়া আসিয়াছেন, সেই কবিকুল-শিরোমণি কালিদাসের স্মৃতিও আমাদের মনে প্রাণে এমন তরঙ্গ তুলিতে পারে না।

(২)

রবীন্দ্রনাথ যে আমাদের মনে এমন ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, তাহার কারণ **রবীন্দ্রনাথ মাত্র কবি ছিলেন না।** ইংরাজ সমালোচকেরা যাহাকে "mere poetry" অর্থাৎ রসাত্মক বাক্য মাত্র বলিয়াছেন, তাহাতেই রবীন্দ্রনাথ সীমাবদ্ধ ছিলেন না। Shakespeare, কালিদাস—ইঁহারা অবশ্যই মহাকবি। তাঁহাদের চেয়ে রবীন্দ্রনাথ বড় কবি কি না সে তর্ক নিষ্ফল ও নিষ্প্রয়োজন। তবে এ কথা ঠিক যে, শুধু কবি হিসাবেই রবীন্দ্রনাথকে দেখিলে তাঁহার মহত্ত্ব ঠিক অনুধাবন করা যাইবে না। "তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ"—একথা আমরা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহেই বলিতে পারি।

অবশ্য কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের ঐশ্বর্য্য ছিল অপর্য্যাপ্ত। কাব্য-ছন্দ এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য আঙ্গিকের উপর অভূতপূর্ব্ব আয়ত্তি, কবিকল্পনার বৈভব, ধ্বনির অপরূপ হিল্লোল, অলঙ্কারের দীপ্তি, অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য ও ব্যঞ্জনা, ভাষার ছটা, ভাবের প্রাচুর্য্য, প্রসার ও গভীরতা, এই সমস্ত উপকরণের সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস সৌষম্য এবং ভাস্বর রসলোক সৃষ্টির ক্ষমতা—এ সমস্তের দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয়। তাঁহার কাব্যকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে "বাঙ্গালী আজ গানের রাজা", সে কথা কিছুমাত্র অত্যুক্তি নহে। বাঙ্গলা ভাষার রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে এত সুর বাজিতে পারে, তাহা রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে কে ভাবিতে পারিত ?

তাঁহার আঙ্গিকের মধ্যে যদি কোন দোষ থাকে, তাহা সম্পদের আতিশয্য—রাজোচিত অতিদাক্ষিণ্য।* কিন্তু কোন দেশে বা যুগে কোন কবিই এত বহুল পরিমাণে, এত বিচিত্র রকমের উৎকৃষ্ট কাব্য ৬০ বৎসর ধরিয়া সদাসর্ব্বদা সৃষ্টি করেন নাই। যদি 'সরস্বতীর বরপুত্র' কাহাকেও বলিতে হয়, তবে রবীন্দ্রনাথই সেই অভিধার শ্রেষ্ঠ অধিকারী।

তবুও একথা মানিতে হইবে যে, শুধু কবি বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রীতি ও ভক্তির পাত্র নহেন, রবীন্দ্রনাথ আরও অনেক কিছু। সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি ঔপন্যাসিক, গল্পলেখক, নাট্যকার, নিবন্ধকার; রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে তিনি সংস্কারক, প্রচারক, শিক্ষাব্রতী, রাষ্ট্রবিদ্, জননায়ক; তিনি গায়ক, সঙ্গীতজ্ঞ, সুরস্রষ্টা, নৃত্য-শিল্পবিৎ, অভিনেতা এবং চিত্রকর; তিনি জগৎবিখ্যাত বক্তা, পণ্ডিত, দার্শনিক, জ্ঞানী ও মনীষী। তিনি আজীবন কর্ম্মী; রাষ্ট্র ও জাতির উন্নয়ন ও গঠনমূলক সর্ব্ববিধ আন্দোলন ও প্রচেষ্টার সহিত যেমন তিনি বিজড়িত ছিলেন, আবার তেমনি অতি ক্ষুদ্র গ্রামের উন্নতি ও গ্রাম-বাসীর সেবাতেও তিনি উৎসৃষ্ট ছিলেন। সর্ব্বদেশের মনীষীদের সহিত যেমন তিনি চিন্তা ও ভাবের সংযোগ রক্ষা করিতেন, তেমনি আবার সামান্য পরিচারক ও দর্শনার্থী কিশোর-কিশোরীর মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাদের তৃপ্তি বিধানে যত্নবান্ ছিলেন। 'অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়' আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য তাঁহার জীবনস্রোত বহু ধারায় প্রবাহিত হইত। তাঁহার মহত্ত্বের পরিচয় শুধু কবিত্বে নয়, সংসারের কর্ম্মপ্রবাহেও; শুধু রসলোকে বিহারের ক্ষমতাতে নয়, ধূলির ধরণীর আপাত-নীরস কর্ম্মে নিষ্ঠা ও কুশলতাতে-ও।

* ইহাকে কোন কোন সমালোচক prolixity বা বাহুল্যদোষ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহা একজাতীয় রোমান্টিকতার লক্ষণ।

তাহার উপর, রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। রূপে, স্বাস্থ্যে, কণ্ঠস্বরে,—আলাপে, পরিহাসে, বাগ্মিতায়, ব্যবহারে, শীলে—উদ্যমে, ধৈর্য্যে, সহিষ্ণুতায়—ধৃতিতে ও ধী-শক্তিতে—বাহ্য ও আন্তরিক সৌম্যতায়—এক কথায় সার্বিক "দৈবী সম্পদে" তাঁহার সমতুল আধুনিক জগতে কে জন্মিয়াছেন ?

(৩)

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আমাদের খণ্ডিত, সঙ্কুচিত জীবনের মাঝখানে **পূর্ণতর মানবতার অবতার,** আমাদের ঈপ্সিত স্বর্গের দূত ও জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। এইজন্য রবীন্দ্রনাথের নাম স্মরণ করিলেই যেন একটা আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গের স্পর্শ আমরা অনুভব করি। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব। তিনি শুধু রূপদক্ষ সুরস্রষ্টা রসবিলাসী কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন আমাদের জীবনের মূর্ত্ত আদর্শ। আধুনিক যুগে সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া যে অভিনব সাধনা চলিতেছে, যে সাধনার বিভিন্ন রূপ আমরা মহাত্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তরলমতি তরুণ ও তরুণীর ভাব ও চিন্তার মধ্যে দেখিতে পাই, সেই সাধনার পরিপূর্ণ আদর্শ যেন বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল রবীন্দ্রনাথের দেহে, মনে ও জীবনে। এক দিক্ দিয়া তিনি 'Son of man'—মানবতায় পরিপূর্ণ "পৃথিবীর শিশু", আর এক দিক্ দিয়া তিনি 'Son of God' —দৈবী প্রেরণার অবতার, দৈব ঐশ্বর্য্যের বিগ্রহ। এইজন্য তিনি শুধু কবি নহেন, তিনি কবিগুরু।

বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথকে আধুনিক যুগের prophet বলা যাইতে পারে। প্রাচীন ইহুদীদিগের ইতিহাসে কোন কোন যুগে যেমন Isaiah, John প্রভৃতি পয়গম্বর ভগবৎ-প্রেরণা লাভ করিয়া সমগ্র

জাতির ভাব ও কর্ম্মধারা নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস করিয়াছিলেন, মানব-জীবনের সত্য ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথও আধুনিক যুগে পৃথিবীতে সেই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার রচনায় ও জীবনাদর্শের মধ্যে আধুনিক মানবচিত্ত এমন কিছুর সন্ধান পাইয়াছে যাহা পরশপাথরের মত মানবপ্রকৃতির একটা মৌলিক পরিবর্ত্তনই সাধন করিতে পারে। বর্ত্তমান কালের খণ্ডিত ও বন্ধ-জটিল জীবনে তিনি আনিয়াছেন পূর্ণতার আভাস ও পরিত্রাণের আশ্বাস। এইজন্যই পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই যাঁহারা শ্রেষ্ঠ মনীষী ও জ্ঞানী, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে আপনার বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, তাঁহাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করিয়াছেন, তাঁহার বাণী আবাহন করিয়াছেন। আধুনিক যুগে খিন্ন নিপীড়িত বিষয়-বিষ-বিকার-জীর্ণ মানব আত্মাকে যথার্থ মুক্তির বাণী যে রবীন্দ্রনাথই শুনাইয়াছেন, তাহা সর্ব্বদেশের সুধীবৃন্দ স্বীকার করিয়াছেন। যে অনুভূতি ও উপলব্ধির ফলে জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান হয় ও মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়, তাহাই রবীন্দ্রসাহিত্যের উপজীব্য। এই অনুভব মানুষের প্রাণে আবির্ভূত হইলে সমগ্র মানবসত্তায় চরিতার্থতার ঝঙ্কার বাজিয়া উঠে, অমৃত-লোকের আনন্দে চিত্ত আপ্লুত হয়। এই আনন্দ-ই মুক্তির লক্ষণ, এবং ইহারই বাণী রবীন্দ্রসাহিত্যে ধ্বনিত হইয়াছে। পৃথিবীর দুর্ভাগ্য যে, সে বাণী সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা অনুসৃত হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথকে কেহ কেহ ঋষি বলিয়াছেন এবং এই কথা লইয়া কিছু কিছু প্রতিকুল সমালোচনাও হইয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় মুনি ঋষিদের ন্যায় আহার-বিহার, আচার ও জীবনধারা অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ছিল না, কিন্তু এ সমস্ত তর্ক সম্পূর্ণ অবান্তর। আহার বা আচারের কোন বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করিলেই কেহ ঋষি হইতে পারেন না।

যিনি জীবন-সত্যের সহজদ্রষ্টা, সেই সত্যের মূর্ত্ত প্রতীক ও প্রচারক, সেই সত্যের মন্ত্রবলে যিনি সমগ্র জাতিকে বা জগৎকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন, তিনিই ঋষি। ইহাই যদি ঋষিত্বের পরিচায়ক হয়, তবে রবীন্দ্রনাথকে ঋষি কিংবা প্রাচীন ঋষিদের উত্তরসাধক বলিতে আমাদের কোন দ্বিধা থাকিতে পারে না। বেদ ও ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য অস্বীকার করিয়াও যদি শাক্যসিংহ বোধ লাভ করিয়া দশাবতারের মধ্যে অন্যতম বলিয়া গণ্য হইতে পারেন, তবে রবীন্দ্রনাথও প্রাচীন মুনিদের আচার পালন এবং সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের মতানুসরণ না করিয়াও জীবনসত্যের অন্যতম দ্রষ্টা হিসাবে ঋষি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন। অবশ্য প্রাচীন ঋষিদের সহিত তাঁহার অনুভূতির ও দৃষ্টির পার্থক্য আছে। তিনি আধুনিক জগতের কবি; বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও বিচারের দ্বারা তাঁহার কাব্য পরিশীলিত; বুদ্ধির দ্বারা তাঁহার দৃষ্টি পরিচালিত; সংসাব তাঁহার কাছে মায়া নয়, সত্য, এবং এই সংসারের বিচিত্র সত্যের তিনি দ্রষ্টা ও ভোক্তা; মানবসুলভ অনুভূতিই তাঁহার উপলব্ধির মূল। তত্রাচ ঋষিদের সহিত এই হিসাবে তাঁহার মিল আছে যে ঋষিদের ন্যায় তাঁহারও জীবন ছিল একটা সাধনা—সত্যোপলব্ধির একটা ঐকান্তিক প্রয়াস। তাঁহার সাহিত্য-চর্চ্চা, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, গ্রামসেবা, নৃত্যগীতাদি সুকুমার শিল্পের অনুশীলন ইত্যাদি জীবনব্যাপী নানা কর্ম্মের সমস্তই ছিল সত্যকে উপলব্ধি করিবার ও জীবনের মধ্যে তাহাকে পরিস্ফুট করিবার প্রয়াস। মহাত্মার ন্যায় **তাঁহারও জীবন ছিল একটা সাধনা** বা "Experiment with truth."

(৪)

এই সাধনার ইতিহাস রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারায় পরিস্ফুট। 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত' হইতে 'শেষ লেখা' পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যগ্রন্থ যদি আমরা মনোযোগ দিয়া পাঠ করি, তবে দেখিতে পাইব যে, তাহার মধ্যে রহিয়াছে এক উন্মুখ মানবাত্মার ক্রমবিকাশের ইতিহাস। বিশ্বের বিচিত্র লীলার মধ্যে বিশ্ব-আত্মার প্রকাশ, সেই বিশ্ব-আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে কবিহৃদয়ের উপলব্ধির বিকাশ এবং এই উভয়ের মধ্যে একটা নিবিড় যোগাযোগ—এই কয়টি বিষয় অবলম্বন করিয়াই রবীন্দ্রকাব্য গড়িয়া উঠিয়াছে। নিরপেক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ মানবিকতার কবিতা তিনি কখনও কখনও রচনা করিয়া থাকিলেও তাঁহার কাব্য প্রধানতঃ একটা আস্তিক্য ভাবে অনুপ্রাণিত; তাঁহার প্রেরণা, তাঁহার ধর্ম্ম মূলতঃ আত্মিক। 'ওঁ ইতি ব্রহ্ম'—যাহা কিছু মানবানুভূতির বিষয় সমস্তই ব্রহ্ম—ইহাই তাঁহার মন্ত্র। তাই বলিয়া যেন কেহ মনে না করেন যে, রবীন্দ্রকাব্যে মানবসুলভ অনুভূতি বা আবেদনের অভাব আছে। বস্তুতঃ আধ্যাত্মিকতা ও মানবতা উভয়ই রবীন্দ্রকাব্যে ওতপ্রোত, এইখানেই রবীন্দ্রপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য। তাঁহার কাছে যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাই অতীন্দ্রিয়রূপে প্রতিভাত হইয়াছে, প্রেয়সীই দেবী হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার কাব্যে "জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে" একটা রহস্যলোকের আভা প্রতিফলিত হইয়া মানব জীবনের অনুভব ও আকাঙ্ক্ষাকে উদ্ভাসিত, রঞ্জিত ও রূপায়িত করিয়াছে। তাঁহার কাব্য-সাধনায় মানবপ্রেম ও ঈশ্বরভক্তি একই হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তথাকথিত মোহ-ই মুক্তির সন্ধান আনিয়া দিয়াছে। তিনি যথার্থই "true to the kindred points of Heaven and Home"; মর্ত্ত্য অনুভূতি ও স্বর্গের উপলব্ধি যেখানে পরস্পরকে স্পর্শ করিয়াছে, সেই মিলন-

রেখাতেই তাঁহার কাব্যের স্থান। "আকাশপৃথিবীর বিবাহমন্ত্রগুঞ্জন"-ই রবীন্দ্রকাব্যের বাণী।

এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা কখনও দুঃখবাদ, সংশয়বাদ বা আত্ম-অবিশ্বাসে পর্যবসিত হয় নাই।

(৫)

রবীন্দ্রপ্রতিভার মৌলিকতা হইল মানুষের মানবিক বৃত্তি ও আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে এই সংযোগসূত্রের আবিষ্কারে। ইহার দ্বারা **রবীন্দ্রনাথ ভারতের সাধনার সনাতন ধারাকে নূতন দিকে, নূতন আদর্শের অভিমুখে মোড় ফিরাইয়া দিয়াছেন।** ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের ইহাই বিশিষ্ট দান। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সহিত আধ্যাত্মিক সাধনার বিরোধিতা—ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে চিরদিনই গৃহীত হইয়া আসিয়াছে। "যোগঃ চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ" ইহাই সাধন-মার্গের গোড়ার কথা। সঙ্কল্পজাত কামনাসমূহকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া এবং মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়-সমূহকে বিষয়-ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করিয়া সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে হইবে, এই উপদেশই শাস্ত্রকারেরা দিয়াছেন। শঙ্করাদি আচার্য্যগণের মতেও একমাত্র পথ হইল বিষয়াদি হইতে ইন্দ্রিয়সমূহের প্রত্যাহার, বিবিক্তসঙ্গ হইয়া অবস্থিতি, কূর্ম্মনীতি গ্রহণ এবং একমাত্র লক্ষ্য হইতেছে নির্ব্বাণ—বৌদ্ধমতের নির্ব্বাণ না হউক, ব্রহ্মনির্ব্বাণ। সত্ত্ব ও রজোগুণের মধ্যে তাঁহারা কোন মিল দেখেন নাই, রজোগুণকে জয় করাই ছিল তাঁহাদের লক্ষ্য। সংসারের বন্ধনকে এড়াইতে হইবে, বিষয়কে ত্যাগ করিতে হইবে,—এই কথাই তাঁহারা বলিয়াছেন; মানবসুলভ সমস্ত প্রবৃত্তির শিরে মোহমুদ্গরের আঘাত

হানিয়া বৈরাগ্যের ধূসর পথ-ই একমাত্র মুক্তিপথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যীশুখৃষ্টের সুমহান্ নীতিধর্ম্মও এবম্বিধ মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বর্গরাজ্য (Kingdom of Heaven) বা মুক্তির আশা করিলে পার্থিব রাজ্য (Kingdom of the Earth) অর্থাৎ ভোগসুখ একেবারে বিসর্জ্জন দিতে হইবে, ইহাই ছিল যীশুর অভিমত।

মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বাচার্য্যগণ প্রায় সকলেই মানবসুলভ প্রবৃত্তি ও আধ্যাত্মিক মুক্তি—এতদুভয়ের মধ্যে বিরোধিতা কল্পনা করিয়া আসিয়াছেন। ইঁহারা সৃষ্টির মধ্যে দেখিয়াছেন একটা বিরাট দ্বিধাভাগ (dichotomy), বিধাতার পরিকল্পনার মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছেন একটা অনাবশ্যক, নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব। যে সহজ প্রবৃত্তি জীবনকে নিরন্তর পরিচালিত করিতেছে, সেই প্রবৃত্তির সহিত জীবনের লক্ষ্যের কোন সঙ্গতি নাই,—ইহাই তাঁহাদের অভিমত। এরূপ দৃষ্টি যে একদেশদর্শিতাদুষ্ট, তাহা অবিলম্বেই প্রতীত হয়। জীবন ও সংসারের অখণ্ড সত্যকে বুঝিবার ও সেই সত্যকে যথার্থরূপে গ্রহণের অক্ষমতাই এই একদেশদর্শিতার দ্বারা সূচিত হয়। বিধাতার পরিকল্পনার মধ্যে একটা মৌলিক অসামঞ্জস্য ও অপচয় কখনই সত্য হইতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথও মুক্তি-সন্ধানী, কিন্তু তাঁহার মত পূর্ব্বাচার্য্যগণের মত হইতে বিভিন্ন। এই মত একটা **মহত্তর সমন্বয়ের** (Higher Synthesis) উপর প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য সমাজে ও ধর্ম্মব্যবস্থায় ভারত অনেক সমন্বয় পূর্ব্বে করিয়াছে, কিন্তু সে সমন্বয় আংশিক, তাহার পরিধিও সঙ্কীর্ণ। আধুনিক জগতের পীড়িত আত্মা যে সমন্বয় চায়, সে সমন্বয়ের পথ রবীন্দ্রনাথই পুরাপুরি দেখাইয়াছেন। এ সমন্বয় শুধু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের ভাব, চিন্তা বা আদর্শের সমন্বয় নহে। এ সমন্বয় ঐহিকের

সহিত পারত্রিকের, কর্ম্মের সহিত ধর্ম্মের, বুদ্ধির সহিত বোধির, রজোগুণের সহিত সত্ত্বগুণের, ভোগের সহিত ত্যাগের, 'সঙ্গে'র সহিত মুক্তির, নীরস কর্ত্তব্যপালনের সহিত রসোচ্ছল উপলব্ধির সমন্বয়। সঙ্কীর্ণতর ক্ষেত্রে ইহা কাজের সহিত খেলার সমন্বয়, গদ্যের সহিত পদ্যের সমন্বয়।

এইখানেই রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য। মানবপ্রকৃতির নানা বৃত্তির মধ্যে যে একটা পারস্পরিক আপাতবিরোধ আছে বলিয়া মনে হয়, তাঁহার অপূর্ব্ব সমন্বয়ে সেই বিরোধের অবসান ঘটিয়াছে এবং সমগ্র-ভাবে মানবসত্তা ও মানববৃত্তির সমাকলন (integration) হইয়াছে, মানবের যুগপৎ আনন্দ ও মুক্তির অভিনব পথ খুলিয়া গিয়াছে। অসংখ্য বন্ধনের মাঝেই তিনি মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ পাইয়াছেন, ইন্দ্রিয়দ্বারেই ভগবানকে আসিতে দেখিয়াছেন। এই অনুভবের ফলে রবীন্দ্রসাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে একটা জীবনব্যাপী সুরসঙ্গতির বোধ। এই সঙ্গতি "বসন্তরাগেন যতিতালাভ্যাং গেয়" কোন আলাপ (melody) নহে, ইহা একটা মহৎ ঐকতান (harmony)। জীবনের সব কিছুকে জানিয়া, দুঃখ ও বেদনাকে গ্রহণ করিয়া, কঠোর কর্ত্তব্যপালনের সহিত মহত্ত্বের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠার সামঞ্জস্য সাধন করিয়া এই ঐকতানের সৃষ্টি। জীবনে অনুভূতির ঐকতানের মধ্যে প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতাই একটা খণ্ড সুরের মত, তাহাদের সমাবেশের মধ্যে একটা মহাসৌন্দর্য্যের সূত্র নিহিত রহিয়াছে। এই মহাসৌন্দর্য্য যখন জীবনে উপলব্ধ হয়, তখনই লাভ হয় যথার্থ মুক্তি। "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।" "বিশ্বতোমুখ", "অনেকবর্ণ" বিচিত্রের-ই জয়গান রবীন্দ্রসাহিত্যে ধ্বনিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের সাধনায় শুষ্ক বৈরাগ্য নাই, কিন্তু তামসিক আসক্তিও

নাই। রবীন্দ্রনাথ ওমর খৈয়াম নহেন, সংশয়বাদীর ভোগ-তৃষ্ণা তাঁহার নাই। জীবনে যে একটা শুদ্ধ উপভোগের দিক্ আছে, তাহাকে তিনি কোন মূল্য দেন নাই। এমন কি সেই দিক্‌টার প্রতি তাঁহার নজর নাই বলিলে চলে। জীবনে কোমলতা ও লালিত্যের চর্চ্চাকে তিনি কখনই প্রাধান্য দেন নাই। দুঃখ ও মৃত্যুর কথাই বোধ হয় তাঁহার কাব্যে বেশী। "আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন—সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে"—ইহাই তাঁহার জীবনের বাণী। জ্যোৎস্না ও ফুলের কথা রবীন্দ্রকাব্যে যে অপেক্ষাকৃত কম, শুধু তাহাই নহে, জ্যোৎস্না ও ফুলের যে স্থূল ভোগের দিক্‌টা আছে, তাহাকে উপেক্ষা করিয়া তাহার সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক আবেদনের কথাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন। আসলে কোন বস্তুগত ভোগের প্রতি, কোন বিশেষ বস্তুর প্রতিই তাঁহার কোন লিপ্সা নাই। "ভাল মন্দ যাহাই আসুক, সত্যেরে লও সহজে" ইহাই তাঁহার মূল মন্ত্র। এই উদার বলিষ্ঠ মনোবৃত্তি-ই তাঁহার গৌরবস্থল। বিষয়কে তিনি বর্জ্জন করেন নাই, আবার তাহাকে আঁকড়াইয়াও ধরেন নাই; দুঃখকে তিনি ভয় করেন নাই, অশান্তিতে তিনি বিচলিত হন নাই। বৃহত্তর সত্যের সহিত সংঘাতের ফলেই জীবনে দুঃখের উৎপত্তি, অহঙ্কার ও ক্ষুদ্রতা হইতে ভূমার উপলব্ধিতে আরোহণের ইহা সোপান, মানবের আত্মবিকাশের জন্যই ইহার প্রয়োজনীয়তা—এ কথা তিনি বারংবার বলিয়া গিয়াছেন। মোটের উপর সর্ব্ববিধ অভিজ্ঞতাকেই তিনি ভগবানের প্রকাশ জানিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, সমস্তই তাঁহার মুক্তির সহায়ক হইয়াছে। **ইহাই তাঁহার রাজযোগ।**

(৬)

এই যোগের রহস্য রবীন্দ্রনাথ পাইয়াছেন মানবের সহজ সৌন্দর্য্যবোধের মধ্যে। ইহাই ভূলোক ও স্বর্লোকের যোগসেতু, ইহাই মর্ত্ত্যজীবনে অমৃতের স্পর্শ আনিয়া দেয়, ইহার আস্বাদন ও সৃষ্টিতেই মানবজীবনের সার্থকতা।

সৌন্দর্য্যানুভূতির যে বিশেষ লক্ষণটির উপর রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়াছেন, তাহা হইতেছে পুলক-স্পন্দন বা ছন্দোময়তা। ছন্দোময় অনুভূতির দ্বারাই রবীন্দ্রনাথ স্থূলের সহিত সূক্ষ্মের, দুঃখের সহিত আনন্দের সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করিয়া অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছেন। যখন বেগের সহিত যতির, নিয়মের সহিত গতির, আবেগের সহিত সংযমের সমাবেশ ও সামঞ্জস্য ঘটে, তখনই ছন্দের সৃষ্টি হয়। পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত দুইটি আ-বিরোধী শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়ার দ্বারাই ছন্দের উৎপত্তি হয় এবং তাহার ফলে এক অভিনব স্পন্দন ও অস্তিত্বের আবির্ভাব হয়। এই আবির্ভাব একটা নূতন সৃষ্টি; এই সৃষ্টির মূলে যে দ্বিবিধ শক্তির ক্রিয়া আছে, তাহার সমন্বয় হইতে ইহা উদ্ভূত হইলেও ইহার প্রকৃতি অন্যরূপ। ইহা উপাদানীভূত শক্তির প্রভাব হইতে মুক্ত একটা নূতন উপলব্ধি আমাদের আনিয়া দেয়। এই **ছন্দোময় অনুভূতিতেই আনন্দ ও মুক্তির সন্ধান রবীন্দ্রনাথ পাইয়াছেন**। এই আনন্দ পার্থিব সুখভোগ হইতে সঞ্জাত নহে। বরং সুখের আকাঙ্ক্ষা ও অপরাপর পার্থিব বন্ধ হইতে যখন আত্মার মুক্তি ঘটে, যখন অন্তর বিকশিত, নির্ম্মল ও স্বভাবসুন্দর হয়, যখন বিশ্বের সহিত আত্মার যোগ সাধিত হয় এবং ঐশ ছন্দে জীবন প্রবাহিত হয়, তখনই আনন্দের উপলব্ধি হয়। তখন অন্তর জাগ্রত, উদ্যত, নিঃসংশয় ও নির্ভয় হয়। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।"—তখন

ব্রহ্মানন্দ লাভের ফলে আমরা আর কিছুতেই ভয় পাই না। আমাদের সাংসারিক জীবনে দুঃখ আছে, সুখ আছে, কান্নাও আছে, হাসিও আছে, কিছুতেই যথার্থ আনন্দ বা মুক্তি নাই। কিন্তু যদি আমরা "কান্না-হাসির দোল দোলানো পৌষ-ফাগুনের পালা"র ছন্দের তালে তালে নৃত্য করিতে পারি, তবে সেই নৃত্যের ছন্দেই আমরা উপলব্ধি করিব আনন্দ, লাভ করিব মুক্তি। সমস্ত জগৎময় চলিতেছে একটা ছন্দের লীলা, সেই লীলায় যোগ দিবার জন্যই কবিগুরু আহ্বান করিয়াছেন।

"পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে,
খসে যাবার, ভেসে যাবার ভাঙ্‌বারই আনন্দে রে।
সেই আনন্দ-চরণপাতে ছয় ঋতু যে নৃত্যে মাতে,
প্লাবন বহে যায় ধরাতে বরণ-গীতে গন্ধে রে॥"

আসক্তি-ই মৃত্যু, এইজন্য "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। 'পথের মাঝে নিজ সিংহাসন পাতা'—ইহাতেই আত্মার অপমান ও অধোগতি। রবীন্দ্রনাথ একান্ত সৌন্দর্য্যসাধনার "ivory tower"-এ নিজে বাস করেন নাই, বা কাহাকেও আহ্বান করেন নাই। এমন কি ভজন, পূজন, আত্মোপলব্ধির নিভৃত মন্দিরেও তিনি প্রয়াণ করেন নাই। তাঁহার মতে, জগতের ছন্দে ছন্দে সুর মিলাইয়া মানবাত্মা তীর্থযাত্রীর মত সুদূর লক্ষ্যের দিকে কেবলই অগ্রসর হইবে, ইহাতেই মুক্তি ও তৃপ্তি। তীর্থযাত্রীর পক্ষে পথের মূল্য নাই, যাত্রারই মূল্য আছে, অথচ পথ ধরিয়াই তাহাকে চলিতে হয়। চলার পথে অগ্রসর হইতে হইলে পশ্চাতের পথের প্রেমে আবদ্ধ হইয়া থাকিলে চলিবে না। জীবনের বস্তু ও অভিজ্ঞতা এইভাবেই অপরিহার্য্য অথচ উপেক্ষণীয়।

এই জন্য রবীন্দ্রনাথের দেবতা নটরাজ, কারণ নৃত্যেই ছন্দোময় সত্তার প্রকাশ। শিশু ভোলানাথ নৃত্য-পাগল, বস্তুর প্রতি আসক্তিহীন, এই জন্য সে কবির আদর্শস্থানীয়। এই নৃত্যের স্পন্দন, মুক্তির সাধনা বিশ্বের সর্ব্বত্র,—প্রকৃতির কন্দরে, নদীর প্রবাহে, আকাশে বাতাসে, পত্রে পুষ্পে, গ্রহে নক্ষত্রে, অণুতে রেণুতে। **এই নৃত্যচ্ছন্দে প্রাণ জাগ্রত হইলে সব বন্ধন হইতে মুক্তি হয়।** নতুবা প্রেমও নিগড় হইয়া দাঁড়ায়।

এইভাবে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সাধনাকে জীবনে ও জগতে সার্থক ও পূর্ণ করার পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই পথে চলিলে আমরা যাহা পাইব, তাহা **ব্রহ্মনির্ব্বাণ নহে, স্পন্দনময় ব্রহ্মানন্দ।** এই আনন্দ তিনি মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন শুধু কাব্যে নয়, জীবনেও—বিশেষ করিয়া সেই মুহূর্ত্তগুলিতে যাহার পরিচয় পাওয়া যায় রবীন্দ্র-সঙ্গীতে।

এই রবীন্দ্রসঙ্গীত ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। যে সুরলোকে রবীন্দ্রনাথ বাস করিতেন, তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায় এই সঙ্গীতে। "সুরের গুরু, দাও গো সুরের দীক্ষা"—ইহাই ছিল জীবনদেবতার নিকট তাঁহার প্রার্থনা। এই সুরলোক "Paradise" নয়, গোলোক বা শিবলোকও নয়; ইহা রবীন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি, অতি সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যানুভূতি ও মানবাত্মার উচ্চতম প্রবৃত্তি ইহার উপাদান। ইহার রূপ ও রস অপূর্ব্ব। রবীন্দ্রসঙ্গীতের মূর্চ্ছনা এই সুরলোকের আভাস আমাদের মনে আনিয়া দেয়, বস্তুময় জগৎ হইতে উদ্ধারের মন্ত্র আমাদের কানে কানে গুঞ্জরণ করে, "in tune with the Infinite" জীবনযাপনের প্রেরণা দেয়, অসীমের সুরে জীবনতন্ত্রী বাঁধিয়া দেয়। ইহার ঝঙ্কারে অকস্মাৎ আমাদের বক্ষমাঝে চিত্ত আত্মহারা হয়। ইহাই হয়ত রবীন্দ্র-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অবদান।

(৭)

রবীন্দ্রনাথকে একটা নবধর্ম্মের প্রচারক বলিলে হয়ত অনেকেই আপত্তি করিবেন। যে অর্থে আমরা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টীয় মতবাদ ও অনুশাসনকে ধর্ম্ম বলিয়া থাকি, সে অর্থে রবীন্দ্রনাথ কোন ধর্ম্মের প্রচার অবশ্য করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ নিজে কখনও ধর্ম্মগুরু বলিয়া আত্মপ্রচার করেন নাই।

তত্রাচ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি, ভাবনা ও প্রেরণা একটা নবজীবনের বাণী ও মুক্তিসাধনার আদর্শ আধুনিক জগতে উপস্থাপন করিয়াছে, অনির্ব্বচনীয়ের স্পর্শ লাভ করিবার সন্ধান দিয়াছে। সেই হিসাবে তিনি একটা অভিনব ধর্ম্মের, অন্ততঃ পন্থার প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে।

এই নবধর্ম্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ, ইহা আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টির সহিত সঙ্গত। অ-লৌকিক উপলব্ধির সহিত ইহার সংস্রব নাই, কোন তন্ত্রমন্ত্র আচার-অনুষ্ঠান বা গূঢ় প্রক্রিয়ার উপর ইহার বিশ্বাস নাই। পারত্রিক মতবাদ, তাত্ত্বিক গোঁড়ামি, আপ্তবাক্য ইত্যাদিতে ইহার প্রত্যয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, বাস্তব জগৎ ও সাংসারিক সত্যের প্রতি ইহার ঔদাসীন্য নাই, বরং সামগ্রিক-ভাবে মানবিক বৃত্তি ও ক্ষমতার বিকাশ এবং জীবন-সাধনাই ইহার সূত্র। তৃতীয়তঃ, সুস্থ মানবের সহজ সংস্কারে যাহা স্বাভাবিক, সুন্দর ও মহৎ বলিয়া প্রতীত হয়, তাহার দ্বারাই ইহা জীবনের মূল্যায়ন করে; * বহুমুখী মানবপ্রীতিই ইহার ভিত্তি।

এ সমস্তই বিধৃত রহিয়াছে এক মহান্ আস্তিক্য উপলব্ধিতে। অনুভবের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী, বিশ্বনিয়ন্তা, আনন্দস্বরূপ এক বিরাট্ সত্তার স্পর্শলাভ করাই এই ধর্ম্মের লক্ষ্য, সেই পরমপুরুষের কাছে

* এজন্য কেহ কেহ রবীন্দ্রনাথকে Victorian বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন।

আত্মনিবেদনই পরমার্থ। সঙ্গীত, প্রেম, ত্যাগ ও পৌরুষের সাধনা সেই পরমার্থলাভের উপায়স্বরূপ।

(৮)

'লিপিকা'য় একটা কথিকা আছে। এক ফালি সরু, বাঁকা গলি,—জঞ্জালে ও আলো-আঁধারিতে পূর্ণ—তাহার মাঝে এক ঝলক সূর্য্যা-লোক হঠাৎ কখন আসিয়া পড়ে, গলির মনে একটা সন্দেহ জাগে হয়ত বা আরও কিছু আছে, হয়ত অন্য রকমের একটা অস্তিত্বও সম্ভব। **আধুনিক জগতে রবীন্দ্রকাব্য সেই রকম একটা বিস্ময় ও পুলকিত সন্দেহ জাগায়।** আজকাল জগতে নানাভাবে পুঞ্জ পুঞ্জ জঞ্জাল জমিয়া উঠিতেছে; সত্যের সন্ধানের পরিবর্ত্তে স্থূলতনু বস্তুর লালসাই জীবনে প্রবল হইয়াছে, দর্শন হইয়াছে জড়বাদী, মানুষে মানুষে মিলনের স্থলে দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামেই ক্ষমতা ব্যয়িত হইতেছে, আসুরী সম্পদই হইয়াছে একমাত্র লক্ষ্য, মানুষ হইয়াছে বস্তুজগতের কৃমিকীট, লোকে "অনেক-চিত্ত-বিভ্রান্তা মোহজাল-সমাবৃতাঃ প্রসক্তাঃ কামভোগেষু" হইয়া পড়িয়াছে; এমন কি

"অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্।"

এখন জীবনে "নাই সুর, নাই ছন্দ", শুধু আছে "অর্থহীন, নিরানন্দ জড়ের নর্ত্তন।" ফলে মানবজীবন "Waste Land" অর্থাৎ ঊষর মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। ইহার মাঝখানে রবীন্দ্রকাব্য বাজাইতেছে একটা সুন্দরের সুর, "জটিল সে ঝঞ্চনায়—বাঁধিয়া তুলিতে চায়—সৌন্দর্য্যের সরল সঙ্গীতে।" পৃথিবীতে ও মানবজীবনে আজ সৌন্দর্য্যের স্থান সঙ্কীর্ণ। এমন কি সাহিত্যেও আছে প্রধানতঃ

আধুনিক মনোবিকারের পরিচয়, তাহাতে শাশ্বত মানব-আত্মার তৃপ্তি বা আশ্রয়ের নির্দেশ নাই। জীবনে প্রেম অপেক্ষা উদগ্র কামনা এবং ধর্ম্ম অপেক্ষা power politics ও party politics-র প্রভাবই বেশী। এইভাবে "নিখিল করিছে মগ্ন—জড়িত মিশ্রিত ভগ্ন—গীতহীন কলরব কত"; রবীন্দ্রনাথের বাণী "পড়িতেছে তারি পর—পরিপূর্ণ সুধাস্বর—পরিস্ফুট পুষ্পটির মত।" সে বাণী আমাদের অহরহ স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে মনুষ্যত্বের পরিচয় ও বিকাশ সুন্দরের আরাধনা ও সৃষ্টিতে; সুন্দরের প্রীতির জন্যই মানুষ পশু হইতে শ্রেষ্ঠ। সুন্দর-ই মর্ত্ত্যে স্বর্গের প্রকাশ। যেমন আলোকের আরাধনায় পঙ্কে কমল ফুটিয়া উঠে, তেমনি সুন্দরের আকর্ষণেই মানুষের মন, হৃদয় ও আত্মা বিকশিত হয়। সুন্দরের আরাধনার মধ্যে পীড়ন বা জ্বালা নাই, ক্ষুদ্রতা বা পঙ্কিলতা নাই; আছে সুখ, প্রীতি, স্থির স্নিগ্ধ হৃদ্য অনুভূতি ও আনন্দ। ইহাতে হয় সত্ত্বগুণের বিকাশ। রবীন্দ্রনাথ এই আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের বাণী নূতন করিয়া জগৎকে শুনাইয়াছেন। তাঁহার ধ্যান-দৃষ্টি ও সৃষ্টিকুশল কল্পনার সাহায্যে তিান উপলব্ধি করিয়াছেন যে কি ভাবে বর্ত্তমান জগতের দ্বন্দ্ব ও সমস্যা, বিরাট কর্ম্মপ্রচেষ্টা ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা সৌন্দর্য্যের অনুভূতিতে রূপায়িত হইতে পারে, মানুষ সংসারে থাকিয়াও "অমৃতস্য পুত্রাঃ" অভিধার যোগ্য হইতে পারে এবং মর্ত্ত্যজীবনের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই দিব্যজীবন যাপন করিতে পারে। "সত্যম্ আনন্দরূপমমৃতং"—এই বলিয়া যাহার নির্দ্দেশ করা হয়, তাহারই আভাস তিনি দিয়াছেন। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের বাণী পাশ্চাত্ত্য জগতেও এত শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিল, এমন সাড়া জাগাইয়াছিল। **এই জন্য রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নহেন, তিনি জগদ্‌গুরু।**

রবীন্দ্রকাব্যের মর্ম্মবাণী

(১)

সূর্য্যমণ্ডলের স্বরূপ নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে দীপ্ত মধ্যাহ্নসূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহার প্রদীপ্ত প্রভায় যেভাবে আমাদের চক্ষু ঝলসিয়া যায় এবং আমাদের দৃষ্টিশক্তিই সাময়িকভাবে যেন অবলুপ্ত হইয়া পড়ে, রবীন্দ্রকাব্যের প্রকৃতি ও লক্ষণ নির্দ্ধারণ করিতে গেলেও আমাদের প্রায় সেই দশাই ঘটে। তাঁহার কাব্যের ঐশ্বর্য্য এত অধিক ও এত প্রোজ্জ্বল যে, সমালোচকের বিচারশক্তি সাময়িকভাবে পঙ্গু হইয়া পড়ে, এবং অতিশয়োক্তির আশ্রয় লইয়া নিজের অক্ষমতা গোপন করিতে হয়। তাঁহার কাব্যে "এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে", এত বিচিত্র অনুভূতি, ভাব ও চিন্তার অপরূপ ছটা আছে যে সমালোচনার মানদণ্ডে তাহাদের মূল্য নিরূপণ করা, এমন কি তাহাদের প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করাই দুরূহ হইয়া পড়ে। তথাচ যেভাবে ধূম্র কাচখণ্ডের অন্তরাল হইতে দৃষ্টিক্ষেপ করিলে রবিরশ্মির তীক্ষ্ণ দীপ্তির প্রভাব এড়াইয়া সূর্য্যমণ্ডলের অনেক লক্ষণ গোচর করা যায়, সেইভাবে রবীন্দ্রকাব্যের ভাব ও চিন্তার সম্পদ এবং তাহার ভাষা ও ছন্দ প্রভৃতি আঙ্গিকের ঐশ্বর্য্য উপেক্ষা করিয়া যদি তাহার অন্তরের উপলব্ধি ও তাহার হৃদয়ের স্পন্দন বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করা যায়, তবে রবীন্দ্রকাব্যের বিশিষ্ট প্রকৃতি ও লক্ষণগুলি নির্ণয় করা সম্ভব হইতে পারে এবং তাহা কেবলমাত্র আমাদের মুগ্ধ বিস্ময়ের উদ্রেক না করিয়া আমাদের বিচারশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে, আমাদের রসবোধকে জাগ্রত করিতে পারে, আমাদের সত্যদর্শনের সহায়তা করিতে পারে।

রবীন্দ্রকাব্যের মধ্যে যাহা 'বাহ্য' তাহা অতিক্রম করিয়া কাব্যের মর্ম্ম-স্থলে প্রবেশ করিতে না পারিলে আমাদের পক্ষে রবীন্দ্রকাব্যের চর্চ্চা বহুল পরিমাণে ব্যর্থ হইবে।

(২)

রবীন্দ্রকাব্যের মর্ম্মকথা কি তাহা নির্দ্দেশ করার চেষ্টা অনেকে করিয়াছেন। এমন কি রবীন্দ্রনাথ নিজেও বাদ যান নাই। কিন্তু সমালোচক রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, কবি রবীন্দ্রনাথকে সমালোচক রবীন্দ্রনাথও সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রকাব্যের সমস্ত পর্ব্বেই "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর" এই একটি মাত্র মূল সুর ধ্বনিত হইতেছে, অথবা "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়" ইহাই রবীন্দ্রকাব্যের মর্ম্মবাণী,—ইত্যাকার উক্তি ভ্রান্ত না হইতে পারে, কিন্তু ইহাতেই রবীন্দ্রকাব্যের বিশিষ্ট তত্ত্বটি ধরিতে পারা যায় না। সীমার মাঝে অসীমের সুরের ঝঙ্কার আরও অনেক কবি উপলব্ধি করিয়াছেন, ইংরেজী কাব্যের ইতিহাসে রোম্যান্টিক যুগের অনেক কবিই তো তাহা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের কাব্যের মর্ম্মকথা এবং রবীন্দ্রকাব্যের মর্ম্মকথা ঠিক এক বলিয়া আমাদের মনে হয় কি? "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়" একথা ব্রাউনিং-এর কাব্যেরও বাণী, তত্রাচ রবীন্দ্রনাথ ও ব্রাউনিং এই উভয়কে আমরা সহোদর ভাই বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি না। সুতরাং "এহ বাহ্য, আগে কহ আর" এই কথাই বলিতে ইচ্ছা হয়। রবীন্দ্রকাব্যে ভারতবর্ষের সনাতন সাধনার বাণী ব্যক্ত হইয়াছে, এবম্বিধ মত শুনিলেও অতৃপ্তি জন্মে। যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে, নানা বিরোধী আচার ও সাধন-

মার্গ ভারতবর্ষে প্রচলিত ও পরিগৃহীত হওয়া সত্ত্বেও ভারতের সাধনার একটি সনাতন আদর্শ আছে, তবে তাহার বাণী কি বৈরাগ্য সাধনে মুক্তিরই উপদেশ দেয় না? "উর্ব্বশী" ও "শেষের কবিতা" যদি রবীন্দ্রনাথের লক্ষণীয় রচনা হয়, তবে তাহার সহিত ভারতের সনাতন সাধনার আদর্শের সামঞ্জস্য কোথায়?

(৩)

ছন্দ, ভাষা ও নানা কবিকল্পনার ন্যায় নানা ভাব ও চিন্তা কাব্যের বহিরঙ্গ মাত্র। কোন কবির ভাব ও চিন্তা সঙ্কলন করিলেই তাঁহার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় না, তাঁহার কাব্যের যথার্থ রস বা আবেদন কি তাহা ধরিতে পারা যায় না, তাঁহার কাব্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্টের পার্থক্য বিচার করা যায় না। কাব্য একটা সৃষ্টি, তাহারও একটা আত্মা আছে; সে আত্মা "ধ্বনি" বা অন্য যাহা কিছু হৌক, সেই আত্মার জন্যই কাব্যের মূল্য। কাব্যের সমস্ত উপাদান সেই আত্মার দ্বারাই বিধৃত, তাহার সঞ্জীবনীশক্তির প্রভাবেই ভাষা ইত্যাদি কাব্যের উপাদান অলৌকিক মহিমায় উদ্ভাসিত হয়। আবার কবিই কাব্যের জননী, কাব্যের আত্মা কবির আত্মা হইতেই উদ্ভূত, উভয়ের মধ্যে নাড়ীর সংযোগ আছে, কবির অন্তরের স্পন্দনই কাব্যে প্রাণ সঞ্চার করে। যেখানে এই আত্মার প্রকাশ আছে সেখানেই কাব্য সার্থক; যেখানে এই স্পন্দনের অভাব বা যেখানে এই স্পন্দন ক্ষীণ, সেখানে কাব্য নানালঙ্কৃত সারগর্ভ রচনা হইতে পারে কিন্তু প্রাণহীন ও নিরর্থক। এই জন্য Tennyson-এর Lotos-eaters সার্থক কবিতা এবং Idylls of the King সুচিন্তিত রচনা হইলেও কাব্য হিসাবে ব্যর্থ। আবার কবি Tennyson-এর যথার্থ পরিচয় পাইতে

হইলে তাঁহার নৈতিক আদর্শ, তাঁহার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য, তাঁহার ধর্ম্মমত, এমন কি তাঁহার কাব্যের দার্শনিক তত্ত্ব দেখিলেই চলিবে না, তাঁহার কাব্যের প্রাণস্পন্দন কোথায় তাহা দেখিতে হইবে। হয়ত সেই প্রাণের সুস্পষ্ট পরিচয় আমরা পাইব Crossing the bar অথবা Tears, idle tears প্রভৃতি স্বল্পপরিসর কবিতায়, Princess বা Idylls of the King প্রভৃতি সুদীর্ঘ নানাতত্ত্বময় কাব্যে নয়। কবি ও কাব্যের সত্য পরিচয় পাইতে হইলে বা রসগ্রহণ করিতে হইলে কাব্যেব ভাব ও তত্ত্বের অন্তবে যে প্রাণস্পন্দনটুকু আছে তাহা আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে। ববীন্দ্রকাব্যের স্বরূপ বুঝিতে হইলে এইভাবেই আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে।

(৪)

এইভাবে যদি আমরা রবীন্দ্রকাব্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করার চেষ্টা করি, তাহা হইলে যাহা পাইব তাহা কোন ধর্ম্মমত নয়, কোন দার্শনিক তত্ত্ব নয়, কোন আদর্শ নয়। আমরা পাইব এক অসাধারণ মানব আত্মার নিগূঢ় সত্য, তাহার হৃদয়ের স্পন্দন। রবীন্দ্রনাথ ঋষি ছিলেন কি না, কোন অপৌরুষেয় সত্য তিনি নিরীক্ষণ ও প্রচার করিয়াছিলেন কিনা, তিনি হস্তামলকবৎ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন কি না—এ সমস্ত তর্কে প্রবৃত্ত হইব না। আমরা তাঁহার কবি-হৃদয়ের যথার্থ প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বুঝিবার চেষ্টা করিব। তাঁহার মনোমুকুরে কোন কোন তত্ত্ব প্রতিভাত হইয়াছিল এবং সেই প্রতিভাসের মূল্য কি, তাহার মধ্যে কতটা সত্য আর কতটা মিথ্যা, এ সমস্ত আলোচনা বর্ত্তমান প্রসঙ্গের মধ্যে আনিব না।

এই প্রসঙ্গে কবি Tennyson-এর কথা আর একবার উত্থাপন

করিব। রবীন্দ্রনাথ Tennyson-এর অনুরাগী ভক্ত ছিলেন, তাঁহাব কবিপ্রকৃতির সহিত Tennyson-এর যথেষ্ট মিল ছিল। আধুনিক যুগের সমালোচকেরা Tennyson-এর কাব্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়া পাইয়াছেন কোন দার্শনিক তত্ত্ব বা আদর্শবাদ নহে, পাইয়াছেন এক ভীত নিঃসঙ্গ মানবাত্মার আর্ত্ত ক্রন্দন। অজানা জগতের গোধূলিময় প্রান্তে দাঁড়াইয়া কবির চিত্ত শিহরিয়া উঠিয়া অস্ফুটস্বরে বলিতেছে—"হারিয়ে গেছি আমি"; সেই হারিয়ে যাওয়া আত্মার আর্ত্তনাদ ও শিহরণ-ই Tennyson-এর কাব্যের মর্ম্মকথা।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের নানা ভাব, চিন্তা, আদর্শ ইত্যাদির মূলে আছে একটা বিশিষ্ট অনুভূতি ও আকুতি। তাঁহার প্রায় সমস্ত কাব্য, মৌলিক ও লক্ষণীয় গদ্য রচনা, নাটক, এমন কি তাঁহার চিন্তাধারার মধ্যে ইহা গানের রেশের ন্যায় ঝঙ্কৃত হইতেছে। ইহাই তাঁহার গান, তাঁহার সাহিত্য ও তাঁহার চিত্রের মূল সুর। এখানেই রবীন্দ্রপ্রতিভার সত্য ও সার্থক পরিচয়।

(৫)

রবীন্দ্রচিত্তের এই বিশিষ্ট অনুভূতির সন্ধান পাওয়া যায় রবীন্দ্র-সঙ্গীতে। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে রবীন্দ্রসঙ্গীত যে একটা অভিনব সৃষ্টি, বাঙলার রামপ্রসাদী সঙ্গীত বা কীর্ত্তনের মত ইহার যে একটা নিজস্ব অতুলনীয় আবেদন আছে তাহা সকলেই জানেন ও স্বীকার করেন। এই সঙ্গীতের মধ্যেই যে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব প্রতিভার, তাঁহার রসোপলব্ধির সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও স্বাভাবিক প্রকাশ তাহা রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন এবং রবীন্দ্রকাব্যরসিক মাত্রেই স্বীকার করেন। সুতরাং এই রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশিষ্ট প্রকৃতি কি তাহা অনু-

ধাবন করিলে রবীন্দ্রচিত্তের বিশিষ্ট অনুভূতি কি তাহা নির্ণয় করার সুবিধা হইবে।

সঙ্গীতকলার দিক্ দিয়া রবীন্দ্রসঙ্গীতের গঠনকৌশলের মধ্যে কি কি বৈশিষ্ট্য আছে তাহা সঙ্গীতাচার্য্যদিগের আলোচ্য বিষয়। মার্গসঙ্গীত-বিশারদগণের মতে রবীন্দ্রসঙ্গীতে মাধুর্য্য থাকিলেও রাগ-রাগিনীর শুদ্ধ রূপ রক্ষিত হয় নাই। তাঁহার প্রায় সমস্ত সঙ্গীতই মিশ্র-জাতীয়। এই সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের শিল্পকলা সর্ববিধ একদেশদর্শিতার বিরোধী, বৈচিত্র্যের সন্ধানই তাহার ধর্ম্ম, সমন্বয়ই তাহার লক্ষ্য। সনাতন রাগ-রাগিনীর মধ্যে একটা সুমহৎ অথচ একান্তবর্ত্তী ভাববিলাস আছে, উর্দ্ধলোকেই তাহার যথার্থ স্থান, বাস্তব জীবনের সহিত তাহার সঙ্গতি নাই, রবীন্দ্রপ্রতিভা কখনও তাহাতে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে না এবং সেই পরিসরে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। যাহা হউক এখানে সেই সঙ্গীতের আবেদনই আমাদের বিবেচ্য। রবীন্দ্রসঙ্গীতের রস যখন আমাদের চিত্তে অনুপ্রবিষ্ট হয়, তখন মনে একটা "বেদনাবিধুর" অথচ অভিনব পুলকমিশ্র বেপথুময় ভাবের সঞ্চার হয়। মনের অনাবিষ্কৃত কোমল পর্দ্দাগুলির উপর অতি সূক্ষ্ম অঙ্গুলিক্ষেপণ করিয়া যেন কোন "অলক্ষ্য সুন্দরী" আমাদের "হৃদয়গহনের দ্বার" ঈষৎ উন্মোচন করিয়া দেয়। সেই রহস্যঘন রসলোক হইতে এক অপার্থিব মাধুর্য্যের আভাস আমাদের চিত্তকে স্পর্শ করিয়া উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে। এক বিস্মৃতপ্রায় বিরহ-বেদনা যেন মনকে আকুল করিয়া তোলে; এ বিরহ কাহার জন্য তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না, মনে হয় সেই "অজানা" "গানের ওপারে" থাকিয়া বীণা বাজাইতেছে; এবং "সহসা এ জগৎ ছায়াবৎ হয়ে যায় তাহারি চরণের পরশের লালসে"—আমাদের প্রাণে

রহিয়া যায় শুধু একটা উন্মুখ ব্যাহত "চঞ্চলতা" এবং তাহার ফলে একটা ছন্দের আন্দোলন ও আবর্ত্তন। একটা অতি-কোমল, স্থূল-হস্তের স্পর্শকাতর, রহস্যোন্মুখ, ছন্দোবিলসিত অধীরতা কম্পিত দীপশিখার মত শিহরণ করিতে করিতে একটা পরিক্ষীয়মাণ মূর্চ্ছনার মধ্যে বিলীন হইয়া যায়, রাখিয়া যায় একটা অতৃপ্ত স্পন্দন। এ যেন প্রণয়োন্মুখ বিরহখিন্ন তরুণীচিত্তের স্বতঃপ্রকাশ।

(৬)

রবীন্দ্রকাব্যের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিলে যে কেন্দ্রীয় উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা রবীন্দ্রসঙ্গীতেরই অনুরূপ। নানা কবিতায় নানা ভাব ও আদর্শের সহযোগে ইহা ব্যক্ত হইয়াছে, যথেষ্ট উদ্ধৃতির দ্বারা তাহা পরিস্ফুট করা এ প্রবন্ধের পরিসরের মধ্যে সম্ভব নহে। তবে তাঁহার শেষ বয়সের একটি লেখা হইতে কয়েকটি পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি, রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মর্ম্মস্থলে যে অনুভূতি আছে তাহা শুদ্ধরূপে এখানে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

"একদিন নিমফুলের গন্ধ অন্ধকার ঘরে অনির্বচনীয়ের আমন্ত্রণ নিয়ে এসেচে ;

মহিষী বিছানা ছেড়ে বাতায়নের কাছে এসে দাঁড়ালো,
মহিষীর সমস্ত দেহ কম্পিত,
ঝিল্লী-ঝঙ্কৃত রাত,
কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ দিগন্তে।"

(শাপমোচন—পুনশ্চ)

একটু বিশ্লেষণ করিলে এখানে রবীন্দ্রকাব্যের অনেকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

(ক) "অনির্ব্বচনীয়ের" উপলব্ধি।

এই লক্ষণটি রবীন্দ্রসাহিত্যে সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন এবং ইহাকেই সাধারণতঃ 'অসীমের সুর' ইত্যাদি কথার দ্বারা নির্দ্দেশ করা হয়। কিন্তু শুধু অনির্ব্বচনীয় বা অসীম ইত্যাদি নেতিবাচক শব্দ দ্বারা ইহার স্বরূপ ঠিক ব্যক্ত করা যায় না। "অবাঙ্‌মনসোগোচরম্" বলিতে সাধুসন্তরা যাহা বুঝিতেন, সে উপলব্ধি এখানে নাই।

"To me the meanest flower that blows can give
Thoughts that do often lie too deep for tears."

এ কথায় Wordsworth হাসিকান্নার সীমানা ছাড়াইয়া যে উপলব্ধির আভাস দিয়াছিলেন, তাহাও এখানে নাই। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে মুক্তির কথা আছে, **সে মুক্তি ভোগেরই ঊর্দ্ধ্বগ সংস্করণ** (sublimation)। "যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে" তাহারই উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত ; "এই বসুধার মৃত্তিকার পাত্রখানি" সেই আনন্দের রসে পরিপূর্ণ। সংসারের ক্ষুদ্র বৃহৎ কর্ম্মে, সংসারের নানা সুখ-দুঃখময় অভিজ্ঞতার স্পর্শে সেই আনন্দ বিধৃত। এক কথায় বলিতে গেলে, তাহা **বস্তুর মধ্যে রসের উপলব্ধি, একপ্রকার** higher aestheticism. "রসো বৈ সঃ"—ব্রহ্মের এই পরিচয়ের উপরই রবীন্দ্রনাথ বার বার জোর দিয়াছেন, কিন্তু 'রস' কথাটি বৈষ্ণব মহাজন ও অন্যান্য শাস্ত্রকারেরা যে অর্থে গ্রহণ করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সে অর্থে গ্রহণ করেন নাই। বৈষ্ণবদের "শুদ্ধা ভক্তি"র ন্যায় ইহা কোনরূপ 'শুদ্ধা' কিংবা নিরপেক্ষ উপলব্ধি নহে। ইহার সহিত সাংসারিক বস্তু, বিষয় ও ব্যবহারের একান্ত ও অত্যন্ত সংযোগ আছে, এবং এই সংযোগই রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও দর্শনের প্রধান তত্ত্ব। ইহা সত্যই "দেবতারে প্রিয়" করিতে পারে কিনা তাহা সন্দেহের বিষয় ; তবে ইহা "প্রিয়েরে

দেবতা" করিয়া তোলে তাহা নিশ্চিত। ইহা দ্বারা apotheosis of the artistic motif সাধিত হয় অর্থাৎ রসবৃত্তিতেই দৈবীভাবের সঞ্চারণ করা হয়। অতি শৈশবে যখন তিনি "জল পড়ে—পাতা নড়ে" এই সরল বাক্য দুইটি হইতে কাব্যদীক্ষা পাইয়াছিলেন অথবা খিড়কীর বাগানে নবধারাবর্ষণের দৃশ্য জানালার খড়খড়ির ভিতর দিয়া দেখিয়া অনির্ব্বচনীয় পুলক অনুভব করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতে তাঁহার এই রসোপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণ অনুভব অপেক্ষা এই উপলব্ধি বহুগুণে তীব্র, প্রগাঢ়, ব্যাপক ও মর্ম্মস্পর্শী। এই রসানুভূতির প্রবণতা ছিল বলিয়াই "যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই", "মধুময় এ পৃথিবীর ধূলি"—এই স্বীকৃতি তাঁহার জীবনের শেষকথা।

তবে এই সম্পর্কে একটা কথা প্রণিধানযোগ্য। যদিও এই রসোপলব্ধির সহিত সাংসারিক কর্ম্মময় জীবনের সংযোগ আছে, সে কর্ম্মের পরিধিতে এই উপলব্ধি সীমায়িত নহে। "অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতা"র কথা রবান্দ্রকাব্যে সাংসারিক জীবনের আদর্শ হিসাবে স্থান পাইয়াছে বটে, কিন্তু যে বিশিষ্ট অনুভূতির স্পন্দন রবীন্দ্রকাব্যের মর্ম্মস্থলে আমরা পাই, তাহার উৎস বাস্তব জীবনের বিস্তৃতির মধ্যে নহে, **ভাবের গোপন নিবিড়তার মধ্যে। রোম্যান্টিকতার উচ্চতম পর্দ্দাতেই রবীন্দ্রকাব্যের সুর বাঁধা। ভাবাবেশেই তাহার চরিতার্থতা। "মোর কিছু ধন আছে সংসারে,—বাকি সব ধন স্বপনে,—নিভৃত স্বপনে," ইহাই কবির স্বীকৃতি।** রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও নাটকে যে যে চরিত্রের মধ্যে কবির বিশিষ্ট মনোবৃত্তি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহারা সংসারে থাকিয়াও সংসার-বিমুখ; "ছুঁয়ে থেকে দুলে শিশির যেমন শিরীষ ফুলের অলকে" সেইভাবেই তাহারা জীবনযাপন করিতে চায়।

সংসারে তাহারা রসোপলব্ধির সুযোগই খুঁজিয়া থাকে, "কর্ম্মবন্যার উচ্ছলিত স্রোত" বা "মহাবিশ্ব-জীবনের তরঙ্গ" হইতে একান্তে থাকিয়া "চক্ষে স্বপ্নাবেশ" লইয়া বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে সংসার-সীমা ছাড়াইয়া "রসলোকের একান্ত সুদূরে" চলিয়া যাইবার দিকেই তাহাদের প্রবৃত্তি। "মালঞ্চের মালাকর", "ব্রজের রাখাল বালক", ঠাকুর্দ্দা, বাউল, পঞ্চক, 'ডাকঘরে'র অমল প্রভৃতি চরিত্রেই রবীন্দ্র-কাব্যের মর্ম্মবাণী ফুটিয়া উঠিয়াছে। এমন কি "যোগাযোগে"র ন্যায় বাস্তবধর্ম্মী উপন্যাসেব নায়িকা কুমুও সাংসাবিক গ্লানিব মধ্যে গীতবাদ্যের রসেই শান্তি ও জীবনের সার্থকতার সন্ধান পাইয়াছে।

এই 'একান্ত সুদূব' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা সুস্পষ্ট নহে এবং হইতেও পাবে না, কাবণ ইহা অনির্ব্বচনীয়। ইহার কয়েকটি লক্ষণ রবীন্দ্রনাথের চিত্তে প্রতিভাত হইয়াছিল।

প্রথমতঃ, ইহা রহস্যময়, ইহাব নির্দ্দিষ্ট রূপ নাই, ইহার স্বরূপ নির্ণয় কবা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, ইহার মধ্যে একটা ব্যক্তিত্ব, একটা ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে জীবনদেবতা বা এবংবিধ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। কবিকে লইয়া ইহা নানাভাবে লীলা করিয়া থাকে, কখনও বা কঠোর স্বামিনীব মত, কখনও বা প্রণয়ীর মত, কখনও বা সখীর মত ইহা ব্যবহার করে; কিন্তু চিরদিনই ইহা "হাসালো, কাঁদালো, চিরদিন দিল ফাঁকি"। ইহার সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট দার্শনিক প্রত্যয় বা প্রাচীন যুগের সাধকদের ন্যায় কোন প্রত্যক্ষ দৃষ্টি কবির নাই।

এই "ফাঁকিই" রবীন্দ্রনাথের সাধনার শেষ কথা। যে জিজ্ঞাসা তাঁহার অন্তরে জাগ্রত হইয়াছিল শেষ পর্য্যন্ত তাহার "মেলেনি উত্তর",

অনন্ত রহস্য তাঁহার কাছে কখনই হস্তামলকবৎ হয় নাই। অনিশ্চয়ের দোদুল সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহার ভাবাবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, এই অনির্ব্বচনীয়ের প্রকাশ সুন্দরের মধ্যে; সে সৌন্দর্য্য বিশ্বপ্রকৃতির প্রায় সর্ব্বত্র—তাহার রুদ্র ও কান্ত, স্তব্ধ ও উদ্দাম—সমস্ত রূপে এবং মানবচরিত্রের সুকুমারবৃত্তির মধ্যে প্রকাশিত। এই সৌন্দর্য্যের কয়েকটি লক্ষণ হইল সৌষম্য, সামঞ্জস্য, সমন্বয় এবং তাহার সহিত কমনীয়তা। রমণীর রূপ ও প্রকৃতি সেই অনন্ত রহস্যময় সৌন্দর্য্যের মূর্ত্ত প্রকাশ ও প্রতীক; "রমণীরূপে আপন মাধুরী আপনি বিশ্বের নাথ করিছেন চুরি", "রমণী ক্ষণকাল" আমাদের পাশে আসিয়া সেই "রহস্য-আ াসে" চিত্ত ভরিয়া দেয়। এইজন্য রবীন্দ্রকাব্যে শুধু স্বর্গের "অনন্তযৌবনা উর্ব্বশী" নহে, পৃথিবীর প্রতিবেশিনী "পঞ্চদশী" কিশোরীও অনির্ব্বচনীয়ের আস্বাদ আনিয়া দিয়াছে। এইজন্য "নরনারী-মিলন মেলায়" যে প্রেমের মাল্য গ্রথিত হয়, রবীন্দ্র-সাহিত্যে তাহার বিশেষ একটা মূল্য আছে, এই বরমাল্য বঁধুর জন্য রচিত হইলেও তাহা জীবনদেবতারই কণ্ঠে অর্পিত হয়। প্রেমই বর্ত্তিকাহস্তে আমাদিগকে সসীম হইতে অসীমের "নিশীথ-অন্ধকার" পথে লইয়া যায়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রবীন্দ্রকাব্যের প্রেম ধরাছোঁয়ার প্রেম নহে, তাহা একটা চিরন্তন মানসিক অভিসার; তাহার "একটুকু ছোঁওয়া" আমাদের মনে "ফাল্গুনীর" মাধুর্য্য সৃষ্টি করে, অনন্তের আভাস আমাদের মনে আনিয়া দেয়। **এই স্বপন-বিহারী প্রেমেরই জয়গান রবীন্দ্রকাব্যে ধ্বনিত হইয়াছে।**

রবীন্দ্রনাথ **অসীম ও অনির্ব্বচনীয়ের প্রকাশ** কেবল যে প্রকৃতির ও জীবনের নানা সৌন্দর্য্যের মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা নহে, মানব-

চরিত্রে পৌরুষের লীলার মধ্যেও তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মানুষ যখন কর্ত্তব্যের আহ্বানে, মহত্ত্বের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠায় "বজ্রাদপি কঠোর" হয়, লাভালাভ উপেক্ষাপূর্ব্বক সঙ্কোচের বিহ্বলতা ও সঙ্কটের ভয় দমন করিয়া দুর্দ্দিনের বারিধারার মধ্যে অবিচলিতচিত্তে অগ্রসর হয়, তখন মানবের মধ্যেই সেই অসীমের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

শুধু জগৎ ও মানবজীবন নহে, **মৃত্যুর বিরাট্ অন্ধকারের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ অনির্ব্বচনীয়কে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।** মৃত্যু আমাদিগকে সাধারণ জীবনের ধূলিমলিন ক্ষুদ্রতা হইতে উদ্ধার করিয়া অনন্তের কোলে আশ্রয় দেয়; নিশীথিনীর মৌন স্তব্ধতা ও রহস্যময় ইঙ্গিত আমাদের মনে যে সত্যের আভাস আনিয়া দেয়, সেই সত্যের পারাবারে আমরা বিলীন হইতে পারি জীবনস্রোতের মোহানা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়াই। এইজন্য সৌন্দর্য্যের পূজারী রবীন্দ্রনাথ মহাকালের একান্ত ভক্ত। "অতি নিবিড় ঘন তিমিরে" আচ্ছন্ন একটা গোপন স্তব্ধতা রবীন্দ্রকাব্যের ঈপ্সিত অনির্ব্বচনীয়ের অন্যতম প্রধান লক্ষণ, মৃত্যু আমাদিগকে সেই বিরাট্ স্তব্ধতার অংশভাগী করে বলিয়াই তাহা রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তকে এত আকৃষ্ট করে।

(৭)

(খ) **ছন্দঃস্পন্দন।**

যে বিশিষ্ট রস রবীন্দ্রনাথের কাব্যে পরিব্যাপ্ত তাহার পরিচয় একপ্রকার ছন্দোময় স্পন্দনে। রসোপলব্ধিতে এই স্পন্দন রবীন্দ্রনাথের কাছে অপরিহার্য্য। রবীন্দ্রকাব্যে যেখানেই কোন রসোপলব্ধির কথা, কোন মহান্ বা অনির্ব্বচনীয় অনুভূতির কথা আছে, সেখানেই রক্তের

দোলা, বক্ষের স্পন্দন, অন্তরে অন্তরে শিহরণ ইত্যাদির উল্লেখ আছে। বীণাতন্ত্রীর বা আবেগপ্লুত কণ্ঠস্বরের বিকম্পনের সহিত ইহা তুলনীয়। এমন কি যখন তিনি প্রকৃতির মধ্যেও একটা লীলারস বা মহত্তর আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়াছেন, তখনও তিনি সেখানে লক্ষ্য করিয়াছেন এই স্পন্দন। সন্ধ্যার অন্ধকারে ঝিলমের তীরে গিরিশ্রেণী ও দেওদার-বন শিহরিয়া উঠিতেছে, "ব্যোমে মহাকাল ছন্দে ছন্দে" তাল দিতেছেন, "দশদিক্‌বধূ খুলি কেশজাল" নৃত্য করিতেছেন। কবিহৃদয়ও "সুদূরের পিয়াসী", এইজন্য চিরচঞ্চল।

বস্তুবিশেষকে আঁকড়াইয়া স্থিতি বা আসক্তিই, কবির মতে, আধ্যাত্মিক অপমৃত্যু। কিন্তু মাত্র উদ্দাম উধাও চঞ্চলতাকে রবীন্দ্রনাথ কখনও খুব উচ্চ স্থান দেন নাই; যে চঞ্চলতা সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি, যাহার আন্দোলন ও আবর্ত্তন আমাদের রসানুভূতির প্রতীক, যাহা ছন্দোময় তাহাকেই রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন। ছন্দোময় গতির নামই নৃত্য, এইজন্য নৃত্যচর্চ্চাকে রবীন্দ্রনাথ এত মূল্যবান্ মনে করিতেন। এমন কি নৃত্যেই তিনি মুক্তির রূপ এবং এই বিশ্বের অধিদেবতার ছায়া প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। কোন বস্তুতেই আসক্ত না হইয়া বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে প্রগতি এবং এই প্রগতির দ্বারাই চিরসুন্দরের মাধুর্য্য জীবনে উপলব্ধি, পুলকমিশ্র চাঞ্চল্যের প্রভাবে বস্তুকে বারংবার স্পর্শ করিয়াও তদূর্দ্ধে অবস্থিতি ও তদ্দ্বারা জীবন্মুক্তির হিল্লোলের অনুভূতি, সমগ্র সত্তাকে মথিত করিয়া এক অপূর্ব্ব পুলকের সৃষ্টি—এ সমস্তই নৃত্যের এবং রবীন্দ্রনাথের মতে মুক্ত মহাজীবনের লক্ষণ। এইজন্য রবীন্দ্রনাথের দেবতা নটরাজ; সমগ্র দেহ, মন ও জীবনের ছন্দ দিয়া 'নটীর পূজা'ই তাঁহার বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ পূজা। এমন কি যে স্তব্ধতা অনির্ব্বচনীয়ের একটা

পরিচয়, সেই "স্তব্ধতার ঢাকা" খুলিয়া ফেলিলে পাওয়া যাইবে একটা স্পন্দন। আধুনিক পদার্থতত্ত্ব-ও পদার্থের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিতে গিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাইয়াছে একটা স্পন্দন। এই **ছন্দঃস্পন্দনই রবীন্দ্র-কাব্যের মর্ম্মকথা।**

(৮)

রবীন্দ্রকাব্যের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়া আমরা পাইলাম একটা বিশিষ্ট সুর ও তাল। সেই সুর রবীন্দ্রসঙ্গীতেও আমরা পাই। ইহা আমাদের মনে আনিয়া দেয় **একটা অনন্ত রহস্যবোধের সহিত একপ্রকার উন্মুখ স্বপনচারী রসঘন বেপথুময় ভাব।** আর যে তালে রবীন্দ্রকাব্য ধ্বনিত হইতেছে, তাহা নটরাজের নৃত্যের তাল; তাহা আমাদের আত্মাকে **কর্ম্মবহুল জীবনেই ছন্দোবিলাসের পথে জীবন্মুক্তির সন্ধান দেয়।** এই সুরে ও তালে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করিয়াছেন এক গীতমুখর গন্ধর্ব্বলোক; তাহা স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যে একটা অপরূপ সেতু রচনা করিয়াছে, তাহা ইন্দ্রধনুর রঙে উজ্জ্বল ও শেষবর্ষণের রসে স্নিগ্ধ। এই সেতুপথে

"পুষ্পমাল্যমাঙ্গল্যের সাজি লয়ে সপ্তর্ষির দলে
কবি সঙ্গে চলে।" *

* ববীন্দ্র-মানসেব সম্যক্ পবিচয দিতে হইলে আরও বিস্তারিত আলোচনার প্রযোজন, এই পরিচ্ছেদেব সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে তাহা সম্ভবপর নহে। ববীন্দ্র-প্রতিভার অপর একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি—তাঁহার চিত্রকলাব স্বরূপ হৃদযঙ্গম না কবিলে রবীন্দ্রমানসেব রহস্যের পরিচয পাওয়া যায় না। বাহ্যতঃ রবীন্দ্রনাথকে সহজ মানুষ বা কাছের মানুষ বলিযা মনে হইলেও আসলে চিরদিনই তিনি ছিলেন অ-সাধাবণ, অন্তরের মৌন রহস্যে মগ্ন। তাঁহার ন্যায কবি-ই আত্ম-পরিচয় উপলক্ষে বলিতে পারেন—

রবীন্দ্র-মানসের ত্রিধারা

(১)

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য যাঁহারা প্রয়াস করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট একটি লক্ষণ প্রথমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে : তাহা হইতেছে রবীন্দ্র-প্রতিভার বৈচিত্র্যমুখিতা। তাঁহার এই বৈচিত্র্যমুখিতার জন্য তাঁহার প্রতিভা জীবনে নানা বিভিন্ন-রূপে বিকশিত হইয়াছে। কখনও তিনি সঙ্গীতসাধক, কখনও তিনি দেশনায়ক ; কখনও তিনি রেখা ও রঙের অদ্ভুত বিলাসী চিত্রকর,

---

"O men ! it must ever be
That we dwell, in our dreaming and singing,
A little apart from ye."

সম্ভবতঃ তাঁহার অন্তঃকরণের রহস্য তিনি নিজেও সম্পূর্ণভাবে জানিতেন না, এই জন্যই তিনি বলিয়াছেন—

আমি—কান পেতে রই আমার আপন হৃদয়গহন-দ্বারে
কোন্—গোপনবাসীর কান্নাহাসির গোপন কথা শুনিবারে।
ভ্রমর সেথায় হয় বিবাগি নিভৃত নীলপদ্ম লাগি
কোন্—রাতের পাখি গায় একাকী সঙ্গীবিহীন অন্ধকারে।

মহাপুরুষদের হৃদয়গহনের রহস্য উদ্ঘাটন করা ভাগীরথীর উৎস সন্ধানের ন্যায়ই দুরূহ। বহু প্রয়াসের পর যখন যাত্রী গোমুখীর সন্নিধানে উপনীত হয়, তখন দেখে আর অগ্রগতি অসম্ভব, যে গহন কন্দর হইতে গৈরিক জলধারা উৎসারিত হইতেছে, তাহা মর্ত্ত্যবাসীর পক্ষে অগম্য ও দৃষ্টির অগোচর। রবীন্দ্রমানসের সন্ধানীর পক্ষেও এতাদৃশ অভিজ্ঞতা অবশ্যম্ভাবী।

Hamlet-র ন্যায় চির-রহস্যময় চরিত্রের ব্যাখ্যা সমালোচকের মন ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। এই জন্য একজন Coleridge-র ব্যাখ্যার সহিত একজন Goethe-র ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ সঙ্গতি হয় না। রবীন্দ্রকাব্যের তাৎপর্য্যও এই কারণেই বিভিন্ন জিজ্ঞাসুর নিকট বিভিন্নরূপেই প্রতীত হয়।

কখনও তিনি জীবনের যাত্রাপথে সুধীর পথিক ; কখনও তিনি উদাসীন বাউল, কখনও তিনি সতর্ক সুবিজ্ঞ কর্ম্মী ; কখনও তিনি মরমী দার্শনিক, কখনও তিনি জনসেবক ; কখনও তিনি লোকগুরু, কখনও তিনি হাস্যরসিক ; কখনও তিনি অনাবিল সত্যের, কখনও তিনি উদ্ভট "খাপছাড়া"র সন্ধানী। তাঁহার প্রতিভার কোনও একটা বিশেষ প্রকাশের মধ্যে তাঁহার সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায় না, কোনও একটা সুলভ বিশেষণ দিয়া তাঁহার প্রতিভার স্বরূপ ব্যক্ত করা যায় না।

কেবল রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী কর্ম্মের ও প্রচেষ্টার, তাঁহার চরিত্রের ও আচরণের পরিচয় নহে, তাঁহার কবিপ্রতিভারও পরিচয় দিতে হইলে অনুরূপ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। তাঁহার কাব্য কি কেবল ঐকান্তিক নিরপেক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ রসযোগের সাধনা ? "বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশী কাটবে সকল বেলা"-ইহাই কি তাঁহার কাব্যের মর্ম্ম-বাণী ? না, তিনি সমস্যাজর্জ্জর মানবজীবনের শুভসাধনার মন্ত্রদাতা কল্যাণব্রতী গুরু ? না, তিনি তত্ত্বসন্ধানী দার্শনিক, বিশ্বের বিচিত্র লীলার মধ্যে সেই "দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টমে"র উপলব্ধির প্রয়াসী ? তিনি কি চিরচঞ্চল উদ্দাম প্রাণশক্তির সাধক ? তিনি কি "শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্"-এর প্রচারক, না, "তা-তা-থৈ-থৈ নিতিনৃত্যে"র সাধক ? তাঁহার রচনা হইতে উদ্ধৃতি সহযোগে ইহার যে কোনটাই প্রমাণ করা যায়।

তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের বিভিন্ন যুগে তিনি যাহা রচনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যেও এই লক্ষণ বিদ্যমান। তখন 'রোগশয্যায়', 'শেষ লেখা' প্রভৃতি দার্শনিক কাব্য রচনা করিয়াছেন সেই সময়েই তিনি রচনা করিয়াছেন "ছড়া"র কৌতুকময় খেয়ালী কবিতা। "প্রান্তিকে"র উপনিষদ্-তুল্য কবিতাগুলি যখন রচিত হয়, প্রায় সেই

সময়েই রচিত হয় খেয়ালখুসির কাব্য 'ছড়ার ছবি' ও বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ 'বিশ্বপরিচয়' ; আন্দামানের রাজবন্দীদের অনশন ধর্ম্মঘট সম্পর্কে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক বক্তৃতা-ও সেই সময়ে করেন, আবার 'বর্ষামঙ্গলের' জন্য নূতন নূতন স্নিগ্ধ গান-ও রচনা করেন।

একই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত এবং প্রায় একই সময়ে রচিত কবিতাবলীর মধ্যেও এই লক্ষণ বর্ত্তমান। "সোনার তরী"র বিদ্রূপাত্মক কবিতা "হিং টিং ছট্" যে দিন রচিত হয়, তাহার পরের দিনই রচিত হয় অলৌকিক আকৃতিময় কবিতা "পরশপাথর"। যে দিন তাঁহার সুবিদিত সঙ্গীত—"যামিনী না যেতে জাগালে না কেন, বেলা হল মরি লাজে"-রচনা করেন, সেই দিনই লেখেন—

"অমর মরণ রক্ত-চরণ নাচিছে সগৌরবে
সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।"
(বিদায়—কল্পনা)

(২)

রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে এই যে বিস্ময়কর বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ব্যাখ্যা পাইতে হইলে রবীন্দ্র-মানসের গভীরতর সত্যের সন্ধান করিতে হইবে। এই সত্যের ভিত্তি রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ ব্যক্তিত্বে।

সাধারণতঃ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কোন একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকে। তাহার রুচি, প্রকৃতি, চিন্তা, লক্ষ্য ইত্যাদি হইতে এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়, এবং এই বৈশিষ্ট্যই অন্যান্য মানুষ হইতে তাহার পার্থক্য সূচনা করে। রামের মধ্যে রাম-ত্ব বলিয়া

একটা বৈশিষ্ট্য আছে, সুতরাং সে কদাপি শ্যাম হইতে পারে না। তাহার মনে একতারার একটি সুরই বাজে, তাহার যে নিজস্ব চারিত্রিক ধর্ম্ম তাহাতেই সে একনিষ্ঠ। তাহার যদি কোন রুচি-র বা প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইলে অন্ততঃ তদ্বিরোধী অন্য কিছু তাহার সম্বন্ধে প্রত্যাশা করা যায় না।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণাদি ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষ সম্বন্ধে এ কথা সত্য নহে। তাঁহাদের বিরাট্ ব্যক্তিত্বের মধ্যে যেন বহুবিধ ব্যক্তিত্বের সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। যিনি যশোদানন্দন, তিনিই পূতনা-হন্তা; যিনি গোপীবল্লভ, তিনিই কংসারি; যিনি পার্থসারথি, ভীষ্মের মতে তিনিই নরশ্রেষ্ঠ। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত এ কালের কোনও মানবের তুলনা হইতে পারে না। তবে মানুষের ইতিহাসে Goethe বা রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বিরাট্ ব্যক্তিত্বেব অধিকারী যে সমস্ত পুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও প্রতিভাব ও প্রকৃতির বহুমুখিতা দেখা যায়। তাঁহাদের মধ্যে আপাতবিরোধী বহু গুণের ও প্রবৃত্তির সমন্বয় হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের সম্বন্ধেও বলা যায়

> বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
> ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।

রবীন্দ্রনাথের "ধেয়ানে" বা মনের গহন-লোকে বহু সাধনার ধারাই মিলিত হইয়াছিল, নানা প্রবণতার সমন্বয় হইয়াছিল। রূপকচ্ছলে বলা যায় যে এই সম্মিলিত প্রবাহ গঙ্গার পাবনী ধারার তুল্য। লোক-চক্ষুর অগোচর গোমুখের কন্দরে ইহার উৎপত্তি। সেখান হইতে বাহির হইয়া নানা নগর জনপদ অতিক্রম করিয়া এই প্রবাহ ক্রমেই অগ্রসর হইতে থাকে অজানা এক সাগরসঙ্গমের অভিমুখে। ক্রমেই ইহার জলরাশির গভীরতা বাড়িতে থাকে, প্রসার হয় বিস্তৃত। গতি

কখনও দ্রুত কখনও মন্থর হইলেও বেগ হয় ক্রমশঃ প্রবল। বহুজনে ইহার পুণ্যোদকে স্নান ও পান করে, কূলে কূলে ইহা বিস্তার করে উর্ব্বরতা ও সরস শ্যামশ্রী, ইহার প্রভাবে বৃদ্ধি পায় কল্যাণ সম্পদ্ ঐশ্বর্য্য। চলার পথে কত ক্ষুদ্র বৃহৎ উপনদী আসিয়া ইহার স্রোতে মিলিত হয়, জলধারার আয়তন বৃদ্ধি হয়, স্রোত হয় বিশাল। ফলে অনেক সময় মনে হয় যেন একই প্রবাহে কয়েকটি স্রোত গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর ন্যায় একই সঙ্গে পাশাপাশি চলিতেছে; কখনও একটি স্রোত দক্ষিণে ও অপরটি বামে; কখনও বা একটি উপরে অপরটি নীচে; কখনও একটির টান বেশী, অপরটির কম। মাঝে মাঝে ইহার ফলে জলধারায় আবর্ত্তের সৃষ্টি হইতেছে, জলরাশি বিক্ষুব্ধ ফেনিল হইয়া উঠিতেছে, স্রোতধারার দিক্-পরিবর্ত্তন হইতেছে, নদী কূল ভাঙিয়া মোড় ফিরিতেছে, বাঁকের মুখে নদী যেন দিশাহারা হইয়া নূতন কোনও অজানা লক্ষ্যের সন্ধানে ছুটিতেছে। রবীন্দ্রকাব্য-ধারার অনুধাবন করিলে সহৃদয় কাব্যামোদীর মনেও অনুরূপ একটা উপলব্ধি হয়। গঙ্গাস্রোতের ন্যায়ই রবীন্দ্রকাব্যের পাবনী শক্তি, উভয়ই আর্য্যাবর্ত্তের মর্ম্মবানীর প্রবাহিণী। ইহারও সৃষ্টিতত্ত্ব পাঠক ও সমালোচকের অগোচর, ইহাও জীবনের অভিজ্ঞতার দেশে দেশে বিচিত্র কুটিল গতিতে প্রবাহিত হইয়া পরিশেষে এক বিশ্বানুভূতির সাগরসঙ্গমে মিশিয়াছে। ইহারও প্রবাহে নানা স্রোতের মিলন ঘটিয়াছে, তাহার মধ্যে তিনটি ধারাই প্রবল। প্রধানতঃ এই তিনটি ধারার সংযোগের ফলে রবীন্দ্রকাব্যের বিচিত্র রূপ ও লক্ষণের সৃষ্টি হইয়াছে। এক একটি ধারার উৎপত্তি হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের বিরাট্ ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত এক এক একটি অংশসত্তা হইতে। তাঁহার সামগ্রিক সত্তার সহিত এই সমস্ত অংশসত্তা অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বদ্ধ।

(৩)

রবীন্দ্র-মানসের একটি ধারা হইল তাঁহার ধী-সত্তার প্রকাশ। বিজ্ঞান শব্দটিকে যদি একটা বিশেষ অর্থে * গ্রহণ করা হয়, তবে এই ধারা তাঁহার বিজ্ঞানময় কোশ হইতে উদ্ভূত,—এইরূপ বলা যায়। এই ধারারই প্রভাব দেখা যায় তাঁহার যুক্তিবাদে, তাঁহার বাস্তবনিষ্ঠায়, তাঁহার অনলস কর্ম্মসাধনায়। তাঁহার সহজ মানবিকতা, সেবাপরায়ণতা ইত্যাদি প্রবৃত্তি-ও এই ধারা-রসে সঞ্জীবিত। রবীন্দ্রনাথের wit, তাঁহার ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, কৌতুকপ্রবণতা এই ধী-সত্তার অন্যতম পরিচয়। এই সত্তার বিহার অন্তর্জগতের ভূ-লোকে।

রবীন্দ্রনাথের এই সত্তার প্রকাশ হইয়াছে প্রধানতঃ তাঁহার গদ্য-রচনায় ও কর্ম্মজীবনে। তিনি ভারত-পথিক রামমোহনের উত্তরাধিকারী। যে বাস্তববোধ, যে মানবিক আদর্শ, যে ব্যবহারিক জীবন-দর্শন, ধ্রুব ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর যে আস্থা ;—ও যে আত্ম-প্রত্যয়, যে বিচারবুদ্ধি, যে নৈতিক নিষ্ঠা, যে ঈশ্বর-বাদ ;—এবং যে স্বদেশপ্রীতি, যে উদার জাতীয়তাবোধ, যে বিশ্ব-মানবতা রামমোহনকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, তাহাই রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যকে বহুল পরিমাণে অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত করিয়াছে, এবং তাঁহার রসানুভূতির সহিত সংযুক্ত হইয়া নানা ভাবে বিকশিত হইয়া গৌরবোজ্জ্বল হইয়াছে।

ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের ইতিহাসে। প্রথম যৌবন হইতেই তিনি দেশের অন্যতম চিন্তানায়ক, আধুনিক জগতের চিন্তাধারার মহত্তম আদর্শের প্রচারক। দেশের রাষ্ট্রনৈতিক

---

* বিজ্ঞানং যজ্ঞ তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ।

(তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ২।৪ ও ২।৫ দ্রঃ)

আন্দোলনে অনেক সময়ই তিনি পুরোধা ছিলেন এবং সারা জীবনই এই আন্দোলনে নানা ভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন ও ইহার লক্ষ্য ও আদর্শ নিরূপণ করিয়াছেন। শিক্ষাসংস্কার, সমাজসেবা, দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ইত্যাদি সর্ব্ববিধ জাতীয় হিত-প্রচেষ্টায় তিনি অনেক সময়ই পথিকৃৎ ছিলেন এবং নানা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তাঁহার এই প্রবণতার প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন।

ইহার আরও প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁহার মনস্বিতায়। কবি হইলেও মননশীল রচনার প্রতি তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল, বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারের প্রত্যেকটি বিভাগের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদি বহু বিষয়ে তিনি গবেষণা করিয়াছেন বা গবেষণার পথনির্দ্দেশ করিয়াছেন। সর্ব্ববিষয়ে চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণধী বোদ্ধা ও বিচারক, গোঁজামিল বা "গণ্ডায় এণ্ডা মিলান" তাঁহার কাছে চলিত না।

রবীন্দ্রনাথের এই বুদ্ধিদীপ্ত মননশীলতা ও বাস্তববোধের প্রভাব তাঁহার কাব্যেও আছে। বস্তুতঃ ইহা রবীন্দ্রকাব্যের অন্যতম মূলধারার উৎস। তাঁহার কবিতাকুঞ্জে যে রাগিনী ঝঙ্কৃত হইয়াছে, তাহার অন্যতম মূলসুরের ইহাই উপাদান। তাহাই রবীন্দ্রকাব্যের সংবাদী সুর। *

(৪)

রবীন্দ্রকাব্যের অপর ধারা হইল তাঁহার রসসত্তার প্রকাশ।

* [তবে রবীন্দ্র-মানসের এই ধাবা সর্ব্বদা তাঁহাব কাব্যধারাব অনুগামী নহে। অনেক সময়ে ইহা পৃথক-গামী, এমন কি আপাতদৃষ্টিতে বিপরীত-গামী। 'কড়ি-ও-কোমলে'ব কবিতাগুলি যখন লিখিত হয, সেইসময়কাব বিতর্কমূলক ও বিদ্রূপাত্মক গদ্যবচনার সহিত 'কড়ি-ও-কোমলে'র মূল ভাবেব সঙ্গতি নাই]।

আনন্দময় কোশ হইতে এই ধারার উদ্ভব। * অন্তর্জগতের ভুবর্লোকে অর্থাৎ ভূলোক ও স্বর্লোকের মধ্যবর্ত্তী অন্তরীক্ষে অপার্থিব অথচ পৃথ্বীস্পর্শী নভোমণ্ডলে এই সত্তার বিহার।

এই রসসত্তার আবেশই রবীন্দ্রজীবনের প্রধান তত্ত্ব, ইহাই তাঁহাকে মুখ্যতঃ কবি ও শিল্পী করিয়াছে। শিশুকালে 'জল পড়ে পাতা নড়ে' এই দুইটি পদের সরল ছন্দ এবং আসন্নবৃষ্টি অপরাহ্নে নীলাঞ্জনপুঞ্জের রূপ ও রেখা তাঁহার মনে প্রয়োজন ও মননের অতিরিক্ত যে অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যের সন্ধান দিত, তাহাই ছিল তাঁহার সমগ্র জীবনের মূল সুর। এই সুরই রবীন্দ্রকাব্যের বাদী সুর।

এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "কবিরে পাবে না, পাবে না, তাহার জীবন চরিতে।" কেবল যে বাল্যকালে তিনি ছিলেন "কুনো,—একলা,—একঘরে"—তাঁর খেলা ছিল আপন মনে—তাহা নয়, চিরদিনই তিনি ছিলেন মূলতঃ "স্বপনমূরতি, গোপনচারী"। আত্মপরিচয় দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন যে "নিরঞ্জনের···এক শুভ্র জ্যোতি যখন বহুবিচিত্র হন, তখন তিনি নানাবর্ণের আলোক-রশ্মিতে আপনাকে বিচ্ছুরিত করেন, বিশ্বকে রঞ্জিত করেন; আমি সেই বিচিত্রের দূত। * * বিচিত্রের লীলাকে অন্তরে গ্রহণ ক'রে তাকে বাইরে লীলায়িত করা—এই আমার কাজ। * * যে বিচিত্র বহু হয়ে খেলে বেড়ান দিকে দিকে সুরে গানে নৃত্যে চিত্রে, বর্ণে বর্ণে রূপে রূপে, সুখদুঃখের আঘাতে-সংঘাতে, ভালো মন্দের দ্বন্দ্বে—তাঁর বিচিত্র রসের বাহনের কাজ আমি গ্রহণ করেছি।" সারা জীবন নানা কাজে সময় কাটাইলেও কাজ-কে তিনি "খেলা" হিসাবেই—অর্থাৎ রসসাধনার উপায় হিসাবেই গ্রহণ করিতে চাহিতেন; যখনই কোন

* তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ২।৫ দ্রঃ

কাজে আর সেই রসের আস্বাদ থাকিত না, তখনই তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্যভাবে রস সাধনায় মনোনিবেশ করিতেন। "সুর ভুলে যেই ফিরতে গেলেম কেবল কাজে", তখনই যে তিনি ভুল করিয়াছেন সে বোধ বারবার করিয়া তাঁহার মনে জাগ্রত হইয়াছে। স্বীকার করিয়াছেন যে জীবনে "বস্তু যা পেয়েছি তার চেয়ে রস পেয়েছি অনেক বেশী। আজ বুঝতে পেরেছি এই জন্যই আমার আসা।··· বিশ্ব-রচনার অমৃতস্বাদের আমি যাচনদার।"

তাঁহার এই রসসত্তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার গানে ও তাঁহার চিত্রকলায়। তাঁহার বহু গান অবশ্য জীবনের সহজ ও সর্ব্বজনীন সত্যের উপলব্ধির প্রকাশ; কিন্তুব হুতর গান—যাহাকে সাধারণতঃ অস্পষ্ট ভাষায় "রবীন্দ্রসঙ্গীত" বলা হয়—তাহা হইল শুদ্ধ তাঁহার মনের গহনে অনির্ব্বচনীয়ের আভাসের বা "হঠাৎ আলো"র ঝলকানি। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের অনেক গান, অনেক প্রখ্যাত ব্রহ্মসঙ্গীত, দেশপ্রেমের ও প্রণয়ের গান প্রথম-জাতীয়। কিন্তু তাঁহার মৌলিক রসানুভূতি বিশেষ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার উত্তর-জীবনে রচিত অনেক সঙ্গীতে—"কেন বাজাও কাঁকন কন কন" ইত্যাদি হইতে "স্বপনপারের ডাক শুনেছি", "মন মোর মেঘের সঙ্গী", "পাগলা হাওয়ায় বাদল দিনে" ইত্যাদি গানের ভাবে, সুরে ও ঝঙ্কারে। কথা অপেক্ষা সুরের বিন্যাসেই এই সব গানের পরিচয়, তাঁহার ধী-সত্তার সহিত এই সকল গানের সম্বন্ধ খুব ক্ষীণ। অন্তরীক্ষ হইতে যেন ইহা ঝরিয়া পড়িতেছে, ইহা যেন ভুবর্লোক-বিহারী কোনও গন্ধর্ব্বের বীণায় ক্বচিৎশ্রুত ঝঙ্কার।

In the golden lightning
Of the sunken sun,

O'er which clouds are brighetning,
Thou dost float and run,
Like an unbodied joy whose race is just begun—

এই সমস্ত সঙ্গীতের স্রষ্টা সম্বন্ধে Shelley-র এই কথাগুলি প্রয়োগ করা যায়।

এই রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধারা কখনও কূলপ্লাবী, কখনও অন্তঃসলিলা। কখনও ইহা কাব্যধারার সহগামী, কখনও বা ইহা স্বাধীনভাবে প্রবাহিণী। রবীন্দ্রনাথের সাংসারিক জীবনের অভিজ্ঞতা সব সময়ে ইহার উৎস নহে ; জীবন যখন শুকায়ে যায়, কাব্যধারা যখন মরুপথে লুপ্ত, এমন সময়েও এই সঙ্গীতের ধারা উৎসারিত হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব ইহার উপরে সামান্যই।

রবীন্দ্রনাথের সংসারমুক্ত অবাধ কল্পনা মূর্ত্ত হইয়াছে তাঁহার খেয়াল-খুসীর আর এক সৃষ্টিতে অর্থাৎ তাঁহার চিত্রকলায়। "স্বপ্ন যত অব্যক্ত আকুল/খুঁজে মরে কূল"-ইহাই তাঁহার চিত্রকলায় নানা অভাবনীয় বিচিত্ররূপে ইঙ্গিত হইয়াছে। রবীন্দ্রচিত্তের নিগূঢ় রহস্যের চাবির সন্ধান বোধ হয় রবীন্দ্রচিত্রের মধ্যেই পাওয়া যাইবে।

(৫)

এই যে দুইটি ধারা রবীন্দ্র-মানসে বরাবরই প্রবল ছিল, তাঁহার কাব্যে তাহারা অনেক সময় পাশাপাশি বহিয়া চলিয়াছে ; কখনও একটি প্রবল, কখনও অপরটি প্রবল। ইহাদের মধ্যে যে একটা মৌলিক বিরোধ আছে, তাহাও তিনি অনেক সময় অনুভব করিয়াছেন। মধ্যজীবনের 'এবার ফিরাও মোরে' এবং শেষ জীবনের 'ঐকতান' ইত্যাদি কবিতায় এই বিরোধানুভূতির পরিচয় পাওয়া

যায়। এই দুই ধারাকে তিনি মিলাইবার চেষ্টা বরাবরই করিয়াছেন, এই চেষ্টা তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনায় রূপায়িত হইয়াছে। "সূর্য্যদেব, তোমার বামে এই সন্ধ্যা, তোমার দক্ষিণে ঐ প্রভাত, এদের তুমি মিলিয়ে দাও"—ইহাই তাঁহার অন্তরের বাণী।

(৬)

রবীন্দ্রকাব্যের তৃতীয় ধারা হইল তাঁহার "চৈতন্যসত্তা"র প্রকাশ। তাঁহার চিন্ময় "সত্যাত্মা"* হইতে ইহার উদ্ভব। অন্তর্জগতের স্বর্লোকে এই সত্তার বিহার। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ইহার তপস্যা, "আত্মানং বিদ্ধি" ইহার মন্ত্র। যে "ধর্ম্মবোধ" রবীন্দ্রকাব্যে পূর্ব্বাপর অনুস্যূত রহিয়াছে, তাহাতেই এই ধারার পরিচয়।

আপাতদৃষ্টিতে ইহাই রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান ধারা বলিয়া প্রতীত হয়। ইহাই মূলধারা কিনা সে বিষয়ে তর্কের অবকাশ থাকিলেও ইহাই যে আর দুই ধারার সহযোগে রবীন্দ্রকাব্যের বিশিষ্ট গুণ ও রূপের সৃষ্টি করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রকাব্যের আবেদন প্রধানতঃ এই ধর্ম্মবোধের জন্যই। এই বোধই তাঁহার সমগ্র জীবনের সাধনাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, জীবনের তাৎপর্য্য নানা-ভাবে তাঁহার অন্তরে ক্রমশঃ পরিস্ফুট করিয়াছে।

বলা বাহুল্য যে এই ধর্ম্মবোধ মানে কোনও সাম্প্রদায়িক বা কোনও শাস্ত্রীয় তত্ত্ব, মতবাদ বা আচার-অনুষ্ঠানের অনুবর্ত্তন কিংবা তৎসম্পৃক্ত উপলব্ধির জন্য প্রয়াস নহে। তাঁহার নিজের মধ্যে যে এক "গূঢ়াত্মা" ক্রমেই বিকাশের পথে চলিয়াছে, বিশ্বজগতের সহিত তাহার একটা আত্মীয়তার সম্বন্ধ আছে; এবং যে এক অধিদেবতা

* তৈত্তিরীয়োপনিষৎ—১।৬।২ দ্রঃ

তাঁহার জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রিত ও তাঁহার প্রবৃত্তিকে প্রণোদিত করিতেছেন, রসানুভূতি ও কর্ম্মযোগের মাধ্যমে তাঁহার সহিত আত্মিক মিলনেই জীবনের সার্থকতা বা মোক্ষ ; এবং বিশ্বের সর্ব্বত্র ও প্রতিটি ব্যাপারে সেই অধিদেবতার প্রকাশ রহিয়াছে,—এই জাতীয় অনুভব ও স্বতঃসিদ্ধ উপলব্ধির মধ্যেই এই ধর্ম্মবোধের পরিচয়। এই ধর্ম্মবোধ তাঁহার নিজস্ব, স্বতঃস্ফূর্ত্ত একটা প্রবণতা ; ইহাকে সুনির্দ্দিষ্ট তত্ত্বের নিরূপিত ভাষায় প্রকাশ বা ব্যাখ্যা করা যায় না। উপনিষদের অনেক বচন যে জাতীয় উপলব্ধির প্রকাশ, তাহার সহিত রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সৌসাদৃশ্য অবশ্য আছে, তত্রাচ স্বীকার করিতেই হইবে যে সমগ্রভাবে রবীন্দ্রকাব্য ঔপনিষদিক তত্ত্বের কাব্যরূপ নহে। রবীন্দ্রনাথ কাব্যে তাঁহার স্বকীয় উপলব্ধির কথাই বলিয়াছেন ; তাঁহার প্রেরণার উৎস ঋষিবাক্য নহে, তাঁহার "অন্তরতমের" নির্দ্দেশ। কোন কোন ক্ষেত্রে সেই নির্দ্দেশের মধ্যে উপনিষদের দুই একটি বচনের প্রতিধ্বনি থাকিতে পারে, এই মাত্র বলা যায়। মানবপ্রেম ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অনুভূতি রবীন্দ্রকাব্যে যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে ও তৎসম্পর্কে যে উপলব্ধির প্রকাশ রবীন্দ্রকাব্যে রহিয়াছে, তাহার উপর উপনিষদের বাণীর কোন প্রভাব নাই।

যে রোম্যাণ্টিকতা রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান লক্ষণ, তাহার উৎস এই ধর্ম্মবোধ বা আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তি। প্রথম জীবনে এই রোম্যাণ্টিকতার যে প্রাথমিক রূপটি দেখা যায় তাহার পরিচয় "নিষ্ফল কামনা"য় ও "নিরুদ্দেশ যাত্রা"য়। শেষ জীবনে এই রোম্যাণ্টিকতার পরিণত রূপটি দেখা যায় "মধুময় পৃথিবীর ধূলি" এই উপলব্ধিতে এবং "পথের শেষে" পৌঁছিয়া "আমার আমির ধারা মিলে যেথা যাবে ক্রমে ক্রমে

পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগরসঙ্গমে" সেই দিকে শ্লথবৃন্ত পরিপক্ক ফলের মত ঝরিয়া পড়িবার এষণায়।

(৭)

রবীন্দ্রকাব্যে এই তিনটি ধারাই প্রবল। কখন কখন এক একটি ধারার স্বতন্ত্র স্রোতোবেগ অনুভব করা যায়, তবে সম্মিলিত স্রোত-ধারা রূপেই তিনটি প্রায়শঃ প্রবাহিত। রূপকচ্ছলে বলা যায় যে ইহারা যেন গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী ; যমুনা হইল কবির যুক্তিবাদী বাস্তব-নিষ্ঠ সত্তার প্রকাশ ; সরস্বতী হইল কবির রসবিলাসী সত্তার প্রকাশ ; আর গঙ্গা হইল কবির আত্মোপলব্ধির ও ধর্ম্মবোধের প্রকাশ। এই ত্রিধারা লইয়া অন্যবিধ রূপকও রচনা করা যায়। রবীন্দ্রকাব্য গঙ্গা-প্রবাহ হইলে তাহার তিনটি ধারা হইল অলকানন্দা, ভোগবতী ও মন্দাকিনী। অলকানন্দা মর্ত্যে প্রবাহিতা, ইহাই হইল বাস্তববাদী যুক্তিনিষ্ঠার ধারা ; ভোগবতী পাতালে প্রবাহিতা, ইহাই হইল কবির অবচেতন মানসের প্রবণতা, তাঁহার নন্দনবৃত্তি (aestheticism) ও রসানুভবের প্রকাশ ; মন্দাকিনী স্বর্গে প্রবাহিতা, ইহাই হইল কবির চিদানন্দানুভূতির প্রকাশ।*

(৮)

এই ত্রিধারা ছাড়া আরও একটা অন্তঃসলিলা ধারাও আছে। তাহাকে কবির ভাষায় "খেয়ালস্রোত" বলা যায়। চপলতা, উন্মার্গতা, খাপছাড়া বচন, হাল্‌কা হাসি, পাগলা-ভোলা ক্ষ্যাপার নাচনে তাহার

* এই জাতীয় রূপকে অবশ্য কবির জীবনসত্যের সহিত সর্ব্বগত সৌসাদৃশ্য রক্ষিত হইতে পারে না, সুতরাং এই লইয়া কোন কূটতর্কের উত্থাপন না করাই সঙ্গত।

প্রকাশ। মাঝে মাঝে সমস্ত নিয়মকে তুচ্ছ করিয়া এই স্রোত ফুলিয়া ফাঁপিয়া অপরাপর স্রোতকে ছাপাইয়া ওঠে। কবি নিজেই বলিয়াছেন—

আমার জীবনকক্ষে জানি না কী হেতু
মাঝে মাঝে এসে পড়ে খ্যাপা ধূমকেতু
তুচ্ছ প্রলাপের পুচ্ছ শূন্যে দেয় মেলি,
ক্ষণতরে কৌতুকের ছেলেখেলা খেলি
নেড়ে দেয় গম্ভীরের ঝুঁটি।

তাঁহার মতে, চতুর্ম্মুখের যদি চারিটি মুখ হয়,

নিশ্চিত জেনো তবে
একটাতে হো হো রবে
পাগলামি বেড়া ভেঙে উঠে উচ্ছ্বাসিয়া।
তাই তারি ধাক্কায়
বাজে কথা পাক খায়,
আওড় পাকাতে থাকে মগজেতে আসিয়া।

এই আওড় বা আবর্ত্ত হইতে কেবল যে "খাপছাড়া" ইত্যাদি কাব্যের সৃষ্টি তাহা নয়; 'ক্ষণিকা', 'শিশু', 'ছড়ার ছবি' ইত্যাদি অল্লাধিক চপল অথচ ভাব-গভীর কাব্যেরও উৎপত্তি।

রবীন্দ্রনাথের সাধনা

(১)

রবীন্দ্রনাথের বহুবিচিত্র কবিপ্রতিভা ও তাঁহার বহুবিস্তৃত কর্ম্মশক্তির নানা প্রকাশের মধ্যে একটা ঐক্যের বন্ধন খুঁজিতে গেলে তাঁহার জীবনব্যাপী একটা সাধনার ইতিহাস পাওয়া যায়। তাঁহার সর্ব্বতো-মুখী প্রতিভার বহু বৈচিত্র্যের উৎস সন্ধান করিলে দেখিতে পাইব যে, আসলে তিনি সাধক; নানা কর্ম্মের ও নানা অনুভূতির ভিতর দিয়া তাঁহার একটি প্রয়াসই প্রকট হইয়াছে, সে প্রয়াস **আত্মোপলব্ধির প্রয়াস বা সাধনা** *

(২)

সাধনা কথাটি আমাদের দেশে সুপরিচিত। যে প্রয়াসের দ্বারা মানুষ নিজের আধ্যাত্মিক সত্তার উপলব্ধি করিতে ও জীবনের চরম

* এই প্রসঙ্গে একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার। আমাদের দেশে অনেক সময়ই গুহ্য প্রক্রিয়াসক্ত, অণিমা-লঘিমা ইত্যাদি অতি-প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য বা বিভূতির সন্ধানী, লোকোত্তর শক্তির অধিকারী সংসারত্যাগী তপস্বীকেই সাধক বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় সাধক ছিলেন না, মানবসুলভ প্রবৃত্তির বিকাশ ও উৎকর্ষই ছিল তাঁহার সাধনার লক্ষণ। এই জন্যই তিনি বারবার করিয়া বলিয়াছেন যে "আমি সাধু নই, সাধক নই," "আমি তত্ত্বজ্ঞানী শাস্ত্রজ্ঞানী গুরু বা নেতা নই," "একটা মাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র।" তবুও একটা সাধনার লীলা যে তাহার জীবনে চলিতেছিল সে সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন, এবং অনুভব করিতেন যে "আমি হইয়া উঠিতেছি, আমি প্রকাশ পাইতেছি" ইহাই এক পরম আশ্চর্য্য। তিনি স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন, "আমার মনে সন্দেহ নেই আমার মধ্যে ...সৃষ্টিসাধনকারী একাগ্র লক্ষ্য নির্দেশ করে চলেছেন একটি গূঢ় চৈতন্য; বাধার মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে।"

সার্থকতা লাভ করিতে পারে, তাহাকেই বলা হয় সাধনা। এক কথায়, মোক্ষলাভের প্রচেষ্টাকেই সাধনা বলা হইয়া থাকে। অবশ্য, সঙ্কীর্ণতর অর্থেও সাধনা শব্দের প্রয়োগ আছে। যেমন, শিল্পীব সাধনা বা বীরের সাধনা। এই সব ক্ষেত্রে একটা সঙ্কীর্ণতর সাংসারিক লক্ষ্যের জন্য সমস্ত প্রয়াস নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু নদীমাত্রেই যেমন শেষ পর্য্যন্ত সাগরের জলে মিশিয়া যায়, সেইরূপ সমস্ত সাধনাই শেষ পর্য্যন্ত আত্মোপলব্ধি বা মোক্ষলাভের দিকে অগ্রসর হয়। সাধনার লক্ষণ এই যে, ইহা মানুষের চিত্তবৃত্তিকে স্ফারিত করে, সুনিয়ন্ত্রিত করে, উন্মার্গতার অভিশাপ হইতে রক্ষা করে, ফলে মানুষ "ইতো ভ্রষ্টঃ ততো নষ্টঃ" না হইয়া জীবনের সার্থকতা লাভ করে। মানুষের জীবনের যে সার্থক প্রয়াস, তাহার গতি মাত্র এক ধ্রুব লক্ষ্যের দিকেই হইতে পারে ; সুতরাং সার্থক সাধনা যে কোন সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই আরম্ভ হউক না কেন, ইহা শেষ পর্য্যন্ত মোক্ষের দিকেই লইয়া যায়। এই জন্য যথার্থ শিল্পী-ও আধ্যাত্মিক সাধক, যথার্থ বীর-ও আধ্যাত্মিক সাধক। সাধনা মাত্রেরই চরম লক্ষ্য—জীবন্মুক্তি ; সাধনায় চরম সিদ্ধিলাভ করিলে এমন একটা উপলব্ধি হয়, যাহাতে মানুষের আত্মা আর মায়াপ্রপঞ্চের দাস থাকে না, বিশ্বরহস্য যেন করতলগত আমলকের ন্যায় স্পষ্ট হয় এবং ব্রহ্মাস্বাদের লাভ হয়।

সাধনার নানা পথ, নানা মত আছে। প্রাচীনকালে এবং মধ্যযুগে ভারতবর্ষে ও ইউরোপে নানা সুধী ও সাধক এই বিষয়ে চর্চ্চা করিয়া ছিলেন। মানুষের মধ্যে প্রবৃত্তি ও যোগ্যতার নানা বৈচিত্র্য আছে। এই বৈচিত্র্য অনুসরণ করিয়াই সাধনার বিচিত্র পথের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ—হীনযান, মহাযান, সহজবাদ প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে কত বৈচিত্র্যময় সাধনার

ইতিহাস জড়িত হইয়া রহিয়াছে। এক হিসাবে আমরা সকলেই সাধক, আমাদের প্রত্যেকের পক্ষেই "The world is a valley of soul-making." আমরা প্রত্যেকেই যেন এক একটি বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে রহিয়াছি, নানাভাবে আমাদের সহিত এই বিশ্বের সংঘাত চলিতেছে, সেই সংঘাতের প্রতিক্রিয়ায় আমাদের অন্তর্নিহিত জীব-শক্তির উদ্বোধন হইতেছে। এই উদ্বোধন কাহারও পক্ষে সতেজ ও সাবলীল, কাহারও পক্ষে অতি ক্ষীণ, কাহারও পক্ষে জড়তাগ্রস্ত ও ব্যর্থ। যাহার জীবনে এই ক্রমশঃ আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্রিয়া সদাজাগ্রত ও অস্খলিত, তাহাকেই আমরা সাধক বলি।

কবি—রসসৃষ্টি যাঁহার কাজ—তিনিও **এক রকমের সাধক।** ভক্তি যেমন এক প্রকারের উপলব্ধি ও মনোবৃত্তি নির্দ্দেশ করে, রস-ও তদ্রূপ একটা বিশিষ্ট উপলব্ধি, অভিজ্ঞতা ও আনুষঙ্গিক মনোবৃত্তি নির্দ্দেশ করে। ভক্তিযোগের দ্বারা যেমন মোক্ষলাভ সম্ভব, রসযোগের দ্বারা তদ্রূপ সম্ভব। কারণ, "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী-ভবতি।" * কবিচিত্ত সচ্ছিদ্র বংশীর ন্যায়; মানবসুলভ যে কোন অভিজ্ঞতা সুকৌশলে তথায় প্রবাহিত করিতে পারিলে অলৌকিক মাধুর্য্যময় রসের উৎপত্তি হয়। অনেক কবির জীবনে এই সৃষ্টি—জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে রস-সৃষ্টি—আকস্মিক বা সাময়িক মাত্র। তাঁহাদের রসোপলব্ধির মধ্যে একটা সমগ্রতার অভাব থাকে, তাঁহারা সাধকের পর্য্যায়ে উঠিতে পারেন না। কিন্তু যাঁহারা বাল্মীকি প্রভৃতির ন্যায় কবিকুলশ্রেষ্ঠ আখ্যা পাইবার যোগ্য, তাঁহাদের জীবনে এক অখণ্ড রসসৃষ্টির প্রবৃত্তি ও যোগ্যতা দেখা যায়, তাঁহারা সাধক নামের সম্পূর্ণ যোগ্য।

* তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।৭

(৩)

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যজীবন পর্য্যালোচনা করিলে এরূপ একটা যথার্থ সাধনার ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি কবি ; মনে প্রাণে, সাংসারিক ও সামাজিক আচরণে তিনি কবিসুলভ মনোবৃত্তি ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ অভিজ্ঞতার বিভিন্ন লোকে বিচরণ করে,—কেহ স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংসারে, কেহ অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মলোকে, কেহ শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য মনোলোকে নিজের যথার্থ স্থান খুঁজিয়া পায়। **রবীন্দ্রনাথের জগৎ—রসলোক,** যেখানে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াতীতের সঙ্গমে একটা ছন্দোময় সত্তার উৎপত্তি হইতেছে এবং সমগ্র বিশ্বের প্রতিচ্ছায়া একটা নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া "রসাত্মক বাক্যে" প্রকট হইতেছে। **গন্ধর্ব্বলোক যেমন স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মাঝামাঝি,** সেখানে মর্ত্ত্যের রস, সৌন্দর্য্য ও মানবসুলভ প্রবৃত্তির সহিত স্বর্গের অনন্ত মহিমা ও অমরত্ব আসিয়া মিশিয়াছে, **রবীন্দ্রনাথের মানসজগৎ সেইরূপ স্থূল উপলব্ধির সংসার ও সূক্ষ্ম ধ্যানলোকের মাঝামাঝি।*** রসসৃষ্টি বা কবিত্বই তাঁহার যথার্থ কাজ, সে কথা তিনি নিজেই বারংবার ব্যক্ত করিয়াছেন। এই কবিত্ব তাঁহার পক্ষে একটা সাময়িক কিছু নহে, ইহার মধ্যে তাঁহার জীবনব্যাপী একটা অখণ্ড সাধনার ইতিহাস রহিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র, ধর্ম্মপিপাসার প্রবল প্রভাবের মধ্যে প্রতিপালিত, ভারতীয় চিন্তাধারার যথার্থ মর্ম্মগ্রাহী ও উত্তরাধিকারী—এই সব কারণেই যে তিনি সাধক হইয়াছেন তাহা

* এই প্রসঙ্গে উপনিষদের কয়েকটি বচন স্মর্ত্তব্য :

তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ স এক মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ।...

তে যে শতং মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণামানন্দাঃ স এক দেবগন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ।...

(তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।৮)

নহে। এই সমস্ত কারণ সত্ত্বেও হয়ত কাহারও কাহারও জীবনে সাধনার সূত্রপাত অসম্ভব হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ সাধনার পথে অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহার অন্তরতমের নির্দ্দেশে। এই সাধনার পথ তিনি কোন প্রাচীন গুরুর নিকট শিক্ষা করেন নাই, তাঁহার অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তিই নদীর স্রোতের মত নিজের পথ করিয়া লইয়াছে। এই সম্পর্কে তিনি স্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন, "আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমি ক্রমশ আপনার মধ্যে আপনার একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারব,—আমার সুখ-দুঃখ, অন্তর-বাহির, বিশ্বাস-আচরণ, সমস্তটা মিলিয়ে জীবনটাকে একটা সমগ্রতা দিতে পারব।" এই উপলব্ধির প্রেরণার বলে সারা জীবন ধরিয়া যে পথে তিনি চলিয়াছেন ও যাহার সন্ধান তিনি দিয়াছেন তাহা হয়ত অন্য কোন পথের সমান্তরাল, হয়ত সেই "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ" চলিবার জন্য পাথেয় বা উপদেশ নানা স্থান হইতে তিনি পাইয়াছেন। কিন্তু সে পথ সর্ব্বসাধারণের রাজপথ নহে, সে পথের অভিজ্ঞতাও সর্ব্বসাধারণের নহে। ইহার ইতিহাস মেরুপথের যাত্রার ন্যায় কিম্বা Pilgrim's Progress-এর ন্যায় চমকপ্রদ, ইহা সর্ব্বাংশেই একটা "Soul's adventure, brave and new" বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। *

---

* বহির্জগতের প্রতি তিনি উদাসীন ছিলেন না, সাংসারিক জীবনেও একান্ত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও স্নেহপ্রবণ ছিলেন। কিন্তু পার্থিব জগতের ও জীবনের প্রতিক্রিয়া, এমন কি ব্যক্তিগত শোকও তাঁহার আত্মানুভব ও উপলব্ধির উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে নাই। তাঁহার সম্বন্ধে বলা যায়—

আপনার মাঝে আছে সে অনেক দূরে।
শান্ত মনের স্তব্ধ গহনে
ধ্যানের বীণার সুরে
বেখেছে তাহারে ঘিরি।
হৃদয়ে তাহার উচ্চ উদয় গিরি।

(৪)

একটা **চিরচঞ্চল গতিশীলতা** এই সাধনার একটা বিশিষ্ট লক্ষণ। স্থির হইয়া কোন একটা কিছুকে আঁকড়াইয়া থাকা চিরদিনই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। এইজন্য কোন ক্ষেত্রেই তিনি সনাতনী হইতে পারেন নাই। কোন একটা বস্তু, অবস্থা বা ভাবের প্রতি একান্ত আসক্তি কখনই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

"ওরে পথিক, ধর না চলার গান,
বাজা রে একতারা,
এই খুসিতেই মেতে উঠুক প্রাণ—
নেইক কূল কিনারা"

ইহাই তাঁহার মূলমন্ত্র। এই চঞ্চলতাই তাঁহাকে একটা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও মুক্তির প্রেরণা দিয়াছিল, ইহাই তাঁহাকে ভোগের মধ্যে ত্যাগের সন্ধান দিয়াছিল। বলিতে কি, মুক্তি সম্বন্ধে তাঁহার যে প্রত্যয় বা সংস্কার তাহা তাঁহার ব্যক্তিত্বের এই লক্ষণটির সহিত বিশেষরূপে জড়িত। রবীন্দ্রনাথের কাছে মুক্তি একটা নেতিবাচক (negative) প্রত্যয়; ইহা যে সীমা ও আসক্তি হইতে অসীমের দিকে, অনাসক্তির দিকে ও অজানার দিকে লইয়া যায় এইটুকুই তাঁহার কাছে বিশেষরূপে স্পষ্ট ছিল, এবং ইহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট। কোন একটা বিশেষ ভাব বা উপলব্ধি এক সময়ে তাঁহার কাছে যতই মহৎ বলিয়া মনে হউক না কেন, তাহাকে অতিক্রম বা transcend করিয়া সর্ব্বদাই তিনি অগ্রসর হইতে প্রস্তুত। "আরো কোথা, আরো কত দূর ?"— এই জিজ্ঞাসা সর্ব্বদাই তাঁহার মধ্যে জাগরূক।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই চিরচঞ্চলতার মধ্যে সর্ব্বদাই একটা **ছন্দের**

পরিচয় পাওয়া যায়। "শুধু ধাও, শুধু ধাও, উদ্দাম উধাও"—এই ধরণের গতি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিগত নহে, বরং "দে দোল্, দে দোল্" বলিয়া যে স্পন্দনময় আন্দোলন তিনি কল্পনা করিয়াছেন তাহাই তাঁহার অনুভূতি ও উপলব্ধির অনুগামী। ছন্দোময় গতির মূলে আবিরোধী কয়েকটি শক্তির ক্রিয়া থাকে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও তাহা ছিল। ছন্দের যে একটা cycle বা আবর্ত্ত থাকে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া পূর্ব্বস্থানে আসার যে একটা প্রবৃত্তি থাকে, তাহাও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল। তাঁহার সমগ্র কাব্যপ্রবাহের মধ্যে এই ছন্দোময় গতির পরিচয় পাওয়া যায়। তরঙ্গে তরঙ্গে এই ছন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং প্রত্যেকটি তরঙ্গভঙ্গের মধ্যে এই গতির একটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক দার্শনিকের মতে এই ছন্দঃপারম্পর্য্যই বিশ্বের গূঢ়তম রহস্যের পরিচায়ক। অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের মানস-জগতের পরিচয় এই ছন্দের মধ্যেই পাওয়া যায়।

এই ছন্দোময় গতির সম্যক্ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার জন্য দর্শনের একটা নূতন পরিভাষা ও নূতন সঙ্কেতের প্রয়োজন। তবে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের ভাব-প্রবাহের মধ্যে একটা ত্রিধাগতি আছে।* ভারতীয় দর্শনের ভাষায় বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জগতে সৃষ্টির মূলে যে শক্তি আছে তাহা ক্রমাগত একটা বিবর্ত্তনের পথে চলিতেছে। তাহার ফলে একটা অভাবের (ভাবাভাব) পর একটা ভাবের আবির্ভাব এবং সেই ভাব হইতে মহাভাবের উৎপত্তি

* এই প্রসঙ্গে Hegel-এর Thesis—Antithesis—Synthesis এই পারম্পর্য্যের কথা স্বভাবতঃই স্মরণ হইতে পারে। কিন্তু Hegel কথিত সূত্রের সহিত রবীন্দ্রমানসের বিবর্ত্তন-সূত্রের সাদৃশ্য আপাততঃ থাকিলেও মূলতঃ তাহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। (পরবর্ত্তী অধ্যায়ের শেষ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

ঘটিতেছে। পুনশ্চ মহাভাবের পর আবার নূতন করিয়া ভাবাভাব ও তাহার পর একটা নূতন ভাব এবং তাহা হইতে একটা নূতন আর এক রকমের মহাভাব এবং তাহারও পর আর একটা ভাবাভাব—এইভাবে নক্‌শা কাটিয়া তাঁহার উপলব্ধির ইতিহাস অগ্রসর হইতেছে। কবি ও সাধকের জীবনে এই ত্রিধাগতির সত্যতা অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই স্বীকার করেন। একজন ইংরেজ সমালোচক বলেন,—

"By those who seek self-betterment through the conscious exercise of the will there must ever be experienced the round of sin, forgiveness and regeneration ; or, put more baldly, of the sense of failure, renewed resolve and success."

সমালোচকের কথিত এই "self-betterment through the conscious exercise of will" মানেই সাধনা। তিনি failure, renewed resolve ও success বলিতে যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাই ভারতীয় দর্শনের ভাবাভাব, ভাব ও মহাভাব। ইহাদের পারম্পর্য্য বোধ হয় অনেক সাধনার ইতিহাসেই দেখিতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে এই পারম্পর্য্য আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এক সময়ে তিনি নিজেই ইহা কতকটা লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন—

চিরকাল এ কি লীলা গো—
অনন্ত কলরোল।
অশ্রুত কোন্ গানের ছন্দে
অদ্ভুত এই দোল।
দুলিছ গো, দোলা দিতেছ।

পলকে আলোকে তুলিছ, পলকে
আঁধারে টানিয়া নিতেছ।

অস্পষ্টভাবে যাহা এখানে বলা হইয়াছে, তাহা আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে অন্যত্র। "আত্ম-পরিচয়ে" রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "ধর্ম্মবোধের এই যে যাত্রা, এর প্রথমে জীবন, তার পর মৃত্যু,-তার পরে অমৃত।" সুতরাং ভাব, অভাব ও মহাভাব—এই তিনটি মূলতত্ত্ব তিনি নিজেও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

এই ভাবে দেখিলে রবীন্দ্রনাথের কাব্যচক্রকেএকটা continued spiral (সীমাহীন কম্বুরেখা) মনে হয়। কম্বুরেখার গতির অনুসরণ করিয়া তাঁহার কাব্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবিরাম ঊর্দ্ধ হইকে ঊর্দ্ধতর লোকে প্রয়াণ করিয়াছে।

(৫)

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা পর পর কয়েকটি প্রেরণার তরঙ্গ দেখিতে পাই। প্রত্যেক তরঙ্গের প্রভাবকালকে একটি **যুগ** মনে করা যাইতে পারে। দেখা যায় যে, কোন একটি প্রেরণা কবির মনে আসিবার পর তাহা পর পর কয়েকটি অবস্থার ভিতর দিয়া সুনিয়মিতভাবে অগ্রসর হইতে থাকে, যতক্ষণ না ইহার বেগের পরিণতি ও অবসান ঘটে। তরঙ্গের ইতিহাসে যেমন কয়েকটি অবস্থার পর্য্যায় আছে, এ ক্ষেত্রেও তেমনি কবি-প্রেরণার আত্মপ্রকাশের একটা নির্দ্দিষ্ট পর্য্যায় আছে। এক একটি বিশিষ্ট প্রকাশকে আমরা রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের এক একটি **পর্ব্ব** মনে করিতে পারি। প্রত্যেক পর্ব্বেই কবির একটা বিশিষ্ট অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গিমার পরিচয় আছে। কিন্তু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে.

যে কোন পর্ব্বের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী পর্য্যায়ের প্রতিসম পর্ব্বের একটা প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। অবশ্য, উপলব্ধির দিক দিয়া ঐক্য নাই, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গিমার দিক্ দিয়া সাদৃশ্য আছে, তাহা দেখিতে পাওয়া যাইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, 'মানসী'র অনুভূতি ও 'কল্পনা'র অনুভূতি এক নয়, কিন্তু উভয়ত্রই একটা অভাবের ব্যাকুলতা রহিয়াছে এবং সেই দিক্ দিয়া ইহাদের মধ্যে একটা মিল আছে। সুতরাং সঙ্গীতের রাজ্যে যেমন বিভিন্ন গ্রামের অষ্টক আছে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও তদ্রূপ বিভিন্ন পর্য্যায়ের ত্রিক আছে মনে করা যাইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এক একটা পর্ব্ব আসে, যখন তিনি বাস্তব জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে খুব সচেতন এবং তাহাকে সর্ব্বজনসুলভ দৃষ্টি দিয়াই দেখেন। এই সময়ে তাঁহার কাব্যে মানবসুলভ উপলব্ধি ও সহৃদয়তার (humanism) পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার সহিত বিচারবুদ্ধির (rationality) তীব্র লীলাও দেখা যায়। কিন্তু ঈপ্সিত "অমৃতং" যে তিনি লাভ করিতে পারেন নাই, "সত্যং" যে তাঁহার জ্ঞানের পরিধির বাহিরে রহিয়া গিয়াছে, সে বোধ হয় খুব তীব্র এবং তাহার জন্য আকূতি হয় প্রবল। সঙ্গে সঙ্গে স্থূল ও বাস্তব সম্বন্ধে সচেতন থাকার জন্য কবি-হৃদয়ে এই সময়ে একটা ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়, সে ছায়া বাস্তব জগতের ছায়া। ফলে অনেক সময় একটা বিষাদ ও ব্যর্থতার অনুভূতি তাঁহার কাব্যে প্রতিফলিত হয়। কখন কখন সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও দুর্জ্ঞেয় বাস্তব সত্যকে অতিক্রম করার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা (yearning) এই সময়কার কাব্যে পরিস্ফুট হয়। এই সমস্ত লক্ষণের জন্য এই পর্ব্বের কাব্যকে অনেক সময়েই আধুনিক রুচির দিক দিয়া সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক বলিয়া মনে হয়। এই জন্যই 'মানসী' 'বলাকা' ইত্যাদি কাব্য আধুনিকের কাছে

বিশেষ রুচিকর। দার্শনিকদের ভাষায় **এই পর্ব্বকে "অভাব" বা "ভাবাভাব"সূচক বলিতে পারি।** "অ-ভাব", "অ-সৎ", "নাস্তিক্য" জাতীয় অনুভূতিই এখানে প্রবল। তবে এই "অভাব" হইতেই পরবর্ত্তী "ভাবে"র উৎপত্তি, এই "নাস্তি" হইতে "অস্তি"র উৎপত্তি। প্রলয়ের মধ্যে যেমন সৃষ্টির বীজ থাকে, ইহাও তদ্রূপ। তবে ইহাকে "ভাবাভাব"সূচক বলাই সঙ্গত, কারণ এখানে অভাবের সহিত ভাব জড়িত হওয়ায় একটা বিচিত্র সত্তার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। এই ভাবাভাবের পর্ব্বে কবিচিত্ত "কেন", "কুতঃ"* ইত্যাদি প্রশ্নে উচ্ছল হইয়া থাকে। সত্যজ্ঞানের জন্য এষণা এই পর্ব্বে প্রবল হয় বলিয়া ইহাকে **জিজ্ঞাসার** পর্ব্ব বলা যাইতে পারে। এই সময়ই হয় ভাবী আবির্ভাবের বোধন।

তাহার পর রবীন্দ্রনাথের জীবনে আর একটা পর্ব্ব আসে, যখন সহসা একটা নূতন ভাব বা অনুভূতির উচ্ছ্বাসে তাঁহার মন প্রাণ আপ্লুত হইয়া উঠে। বিষাদ ও ব্যর্থতার অন্ধকার কাটিয়া যায় এবং এক নূতন আলোকের (revelation) দীপ্তি কবিকে মুক্তির বা মোক্ষের একটা নূতন সন্ধান দেয়। এই সময় মনে হয় যে, কবি বাস্তবের রাজ্য ছাড়িয়া ভাবের রাজ্যে পাখা মেলিয়া স্বেচ্ছাবিহার করিতেছেন, সমগ্র পার্থিব অভিজ্ঞতাই তাঁহার চোখে বদলাইয়া গিয়া নূতন রূপ ও অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই পর্ব্বে উচ্ছ্বাস বেশী, দার্শনিকতা ও মননশীলতা অপেক্ষাকৃত কম। অনেকের কাছে, বিশেষতঃ বাস্তবপন্থীদের কাছে এই সময়ের কাব্যকে অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে বলিয়া বোধ হয় এবং তাঁহাদের কাছে কবি "a beautiful and ineffectual angel, beating in the void his lumin-

* কেনোপনিষৎ ও প্রশ্নোপনিষৎ দ্রঃ

ous wings in vain" বলিয়া প্রতীত হন। কারণ, **এই সময়ের কাব্যের মূল উপাদান একটা অ-সাধারণ অনুভব, কবিচিত্তের একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব উল্লাস।** ইহা মূলতঃ এক প্রকারের পলায়নী বৃত্তির বা escape-এর কাব্য এবং স্বীকার করিতে হয় যে, যদিও এই যুগে কবি একটা অভিনব উপলব্ধির স্বর্গে আরোহণ করিয়া মুক্তির আনন্দ পাইতেছেন, তাহা জীবনে সত্য, সফল ও মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে না; জীবনের সহিত ভাবের একটা ব্যবধান থাকিয়া যাইতেছে। ইহা একটা আবির্ভাব, কিন্তু ইহাতেই নবজীবনের সৃষ্টি হইতেছে না। তত্রাচ এই পর্ব্বে জিজ্ঞাসু মনে একটা নূতন জ্ঞানের আলোক ফুটিয়া উঠে, এই জন্য ইহাকে **সংজ্ঞানের** পর্ব্ব বলা যাইতে পারে।

ইহার পরে যে পর্ব্ব আসে, তাহাকে আমরা **মহাভাবের পর্ব্ব** বলিতে পারি। পূর্ব্বে যে ভাবের প্রকাশ ঘটিয়াছিল, সেই ভাব এই যুগে পরিণতি লাভ করে। * দেখা যায় যে, পূর্ব্বে যাহা আবেগময় একটা কল্পনা ছিল, তাহা এখন একটা জীবনব্যাপী উপলব্ধিতে (realisation) পরিণত হইয়াছে। কল্পনা ও অভিজ্ঞতার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য হইয়াছে, উভয়ই পরস্পরকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। মনে হয়, এইবার যেন কবি তাঁহার লক্ষ্যে পৌঁছিয়াছেন, তাঁহার সাধনার চূড়ান্ত সিদ্ধি হইয়াছে। অতৃপ্তি, আকাঙ্ক্ষা, ব্যাকুলতা ইত্যাদির স্থলে এখন একটা সুগভীর তৃপ্তি, শান্তি ও পূর্ণতা বিরাজ করিতেছে। জীবন ও বাস্তবের প্রতি আর বিদ্রোহ নাই, কারণ নূতন দৃষ্টিতে কবি সর্ব্বত্রই তাঁহার মহাভাবের প্রকাশ দেখিতে

* ভাবের ক্রমিক শোধন ও গাঢ়তাবৃদ্ধির ফলে মহাভাবের উদয় হয় ইহাই আচার্য্যগণের মত।

পাইতেছেন। এইকারণে ইহাকে * **প্রজ্ঞানের** পর্ব্ব বলা যাইতে পারে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ সাধনার পথে কোন আশ্রয়ই তাঁহার অবিরাম গতির সীমা টানিয়া দেয় না। এইজন্য মহাভাবের যুগের পরই আবার ভাবাভাবের যুগ আসে, এইরূপে সেই পুরাতন পালা বারবার করিয়া আরম্ভ হয় এবং শেষ হইয়া পুনরায় সুরু হয়। **ভাব ও অভাবের দ্বন্দ্ব তাঁহার জীবনে সনাতন,** কাহাকেও তিনি একেবারে অস্বীকার বা নিঃশেষরূপে বর্জ্জন করিতে পারেন নাই। বার বার করিয়া নানা রূপ ধরিয়া এই কয়েকটি মূল তত্ত্ব তাঁহার কাছে আসিয়াছে ; তাহারা যে তাঁহারই মানসের বিভিন্ন মুখের প্রতিচ্ছবি।

* জ্ঞানের প্রথম ও শেষ রূপ নির্দ্দেশ করার জন্য সংজ্ঞান ও প্রজ্ঞান শব্দ দুইটির ব্যবহার উপনিষদে আছে।

(ঐতরেয়োপনিষৎ, ৩।১।২ দ্রঃ)

রবীন্দ্রকাব্যে পর্ব্ব ও যুগ-বিভাগ

(১)

রবীন্দ্রকাব্যের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া তাঁহার সাধনার অর্থাৎ তাঁহার আত্মোপলব্ধি ও ধর্ম্মবোধের ইতিহাস অনুসরণ করিতে হইলে প্রথমতঃ কয়েকটি বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই যে আধ্যাত্মিক মার্গে প্রগতিপরায়ণ ছিলেন, কখনই যে তিনি পথের মাঝে নিজ সিংহাসন পাতিয়া বসেন নাই, যুগে যুগে পর্ব্বে পর্ব্বে যে তিনি "অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে" অগ্রসর হইয়াছেন, "অজানা হইতে অজানা"য় পরিক্রম করিয়াছেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। বস্তুতঃ সাধারণ রোম্যান্টিক অনুভব হইতে মহামানবের চিত্তবৃত্তি পর্য্যন্ত বিকাশের ইতিহাস রবীন্দ্রকাব্যে পাওয়া যায়। এইজন্য রবীন্দ্র-কাব্য বুঝিতে হইলে তাহার ক্রমবিকাশের পারম্পর্য্য, তাহার পর্ব্ব-বিভাগ ইত্যাদি হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজনীয়। নহিলে, রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহকে আমরা আবর্ত্ত বলিয়া ভুল করিব, 'সোনার তরী'র রহস্যময়ীর আর 'শেষলেখা'র ছলনাময়ীর প্রত্যয় একই মনে করিব, মৃত্যু সম্পর্কে 'চিত্রা'য় যে ধারণা তাহার সহিত 'জন্মদিনে'র ধারণা মিশাইয়া ফেলিব। রবীন্দ্রকাব্যের আলোচনার সময় কবির স্বীকৃতি স্মরণ রাখিতে হইবে যে তাঁহার "কাব্যের ঋতুপরিবর্ত্তন ঘটেছে বারে বারে। কালে কালে ফুলের ফসল বদল হয়ে থাকে, তখন মৌমাছির মধু যোগান নতুন পথ নেয়। ফুল চোখে দেখবার পূর্ব্বেই মৌমাছি ফুলগন্ধের সূক্ষ্ম নির্দ্দেশ পায়, সেটা পায় চারদিকের হাওয়ায়। যারা ভোগ করে এই মধু তারা এই বিশিষ্টতা টের পায় স্বাদে।

কোনো কোনো বনের মধু বিগলিত তার মাধুর্য্যে, তার রঙ হয় রাঙা ; কোনো পাহাড়ি মধু দেখি ঘন, আর তাতে রঙের আবেদন নেই, সে শুভ্র ; আবার কোনো আরণ্য সঞ্চয়ে একটু তিক্ত স্বাদেরও আভাস থাকে। কাব্যে এই যে হাওয়া-বদল থেকে সৃষ্টিবদল এতো স্বাভাবিক, এমন স্বাভাবিক যে এর কাজ হতে থাকে অন্যমনে। কবির এ সম্বন্ধে খেয়াল থাকে না।"

রবীন্দ্রকাব্যের 'পালাবদল' বা ভাবান্তর ঋতুপরিবর্ত্তনের সহিত তুলনীয়। অর্থাৎ 'সময়ের ঘড়িধরা অঙ্কে'তে ইহার সন তারিখ নির্ণয় করা যায় না। ষড়্ঋতুর পারম্পর্য্য পঞ্জিকাকার কখনই তারিখ ধরিয়া সুস্থির রূপে নিরূপণ করিতে পারেন না। প্রচণ্ড গ্রীষ্মেও বর্ষা কোন কোন দিন নামে, কিন্তু তখনও বর্ষাকাল নয় ; এমন কি শীতকালেও কখন কখন বর্ষণ হয় ; আবার বর্ষাকালেও প্রচণ্ড তাপ অনেক সময় অনুভূত হয়। বর্ষার পরে এবং হেমন্তের পূর্ব্বে মধুর শরৎকালের আবির্ভাব হয়, কিন্তু শরৎকাল যেন বড় ক্ষণস্থায়ী, তাহার পূর্ণরূপটি কয়েকদিন মাত্র দেখা যায়, শরতের বাকি কয়টা দিন বর্ষা ও হেমন্তের প্রকোপ অনুভূত হয়। তেমনি রবীন্দ্র-কাব্যের এক একটি যুগের কিম্বা পর্ব্বের কবে সূচনা হইল এবং কবেই বা শেষ হইল, তাহার ঠিক সন তারিখ দেওয়া যায় না। 'চিত্রা' পর্ব্বে 'সোনার তরী'র ভাব এবং 'কল্পনা' পর্ব্বে 'চিত্রা'র ভাব অনেক সময় দেখা দিয়াছে। তবুও গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরৎ যেমন বিভিন্ন ঋতু, তেমনি 'সোনার তরী', 'চিত্রা' ও 'কল্পনা' রবীন্দ্রকাব্যের বিভিন্ন পর্ব্বের নিদর্শন। আবার, নদীর প্রবাহে যেমন কখনও কখনও একই সময়ে যুগপৎ জোয়ার ও ভাটার টান অনুভব করা যায়, একটা টান জল-প্রবাহের উপরের দিকে ও আর একটা টান নীচের দিকে বহিয়া চলে,

কবিমানসেও তাহা সময়ে সময়ে হইয়া থাকে। যুগান্তরের বা পর্ব্বান্তরের সীমারেখায় অনেক সময় রবীন্দ্রকাব্যেও দুইটি ভাবধারার ক্রিয়া যুগপৎ দেখা যায়।

বসন্তকালেই কোকিল ডাকে বটে, কিন্তু বসন্ত সমাগমের পূর্ব্বেই যে কদাচ দুই একটি অগ্রদূত কোকিলের ডাক শোনা যায় না এমন নয়। সেই রকম নূতন একটা যুগ বা পর্ব্বের প্রারম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই সেই যুগের বিশিষ্টভাব কিছু কিছু পূর্ব্বের রচনায় কখনও দেখা যায়। আবার অনেকদিন পরেও একটা বিগত যুগের বিশিষ্ট ভাবের পুনরুজ্জীবন হইতে পারে, যেমন বর্ষাকালেও কখন কখন কোকিল ডাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে 'চিত্রা'র 'সুখ' কবিতাটি 'সোনার তরী' পর্য্যায়ের কবিতাগুচ্ছ রচনার সময়েই লেখা হয়; আবার শেষ জীবনে 'পুনশ্চ-শেষসপ্তক' রচনার পর্ব্বেই 'বীথিকা'র এমন কতকগুলি কবিতা রচিত হয় যেগুলি বিগত বর্ষার অবশিষ্ট মেঘমালার শেষ বর্ষণ।

এইজন্য সময়ের অঙ্কের অনুবর্ত্তন না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন কাব্যগ্রন্থের রচনার অনুক্রম অনুসারে পর্ব্ব-বিভাগ করিলে অনেক সময় সুবিধা হইতে পারে। কারণ, "অল্পকালের ব্যবধানে যে সমস্ত (কবিতা) পরে পরে রচিত হইয়াছে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটি ভাবের ঐক্য থাকা সম্ভবপর মনে করিয়া" তদনুসারে কবি অনেকসময় এক একটি গ্রন্থের কবিতা নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সব সময়ই তাহা করা হয় নাই। 'শিশু' কাব্যের কতকগুলি কবিতা রচিত হয় 'কড়ি ও কোমল' পর্ব্বে এবং অন্যান্যগুলি রচিত হয় 'খেয়া' পর্ব্বের সূচনার ঠিক পূর্ব্বে। এখানে শুধু একটা বিষয়গত ঐক্য আছে, কিন্তু ভাবগত ঐক্য নাই। কখন কখন ব্যবহারিক সুবিধা বিবেচনা করিয়া গ্রন্থের কবিতা নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। ভাবগত

ঐক্য আছে কি-না—"কবির এ সম্বন্ধে খেয়াল থাকে না"। হয়ত রচনার সময়ে বা প্রকাশের কালে এ বিষয়ে কিছু নির্দ্ধারণ করা সম্ভবও নয়, কারণ "সৃষ্টিবদলে"র "কাজ হ'তে থাকে অন্যমনে"। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি বেশ কয়েক বৎসর ধরিয়া এক একটি করিয়া রচিত হইয়াছিল, ইতিমধ্যে কবির মনে "হাওয়াবদল" এবং রচনায় 'সৃষ্টিবদল' হইয়াছিল, কিন্তু এইগুলিই হইবে তাঁহার শেষ রচনা এইরূপ বিবেচনা করিয়া সবগুলি একই গ্রন্থে প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তখন জানিতেন না যে 'পুনশ্চ' তাঁহাকে রচনা করিতে হইবে।

এতদ্ভিন্ন আরও একটা বিষয় মনে রাখিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থে যাহা স্থান পাইয়াছে সবই যে তাঁহার আত্মিক সাধনার প্রকাশ তাহা নহে। কতকগুলি কবিতা সাময়িক উপলক্ষ্যে রচিত, তাহাদের রচনায় শিল্পসৌন্দর্য্য থাকিলেও আত্মপরিচয় নাই। তাহা ছাড়া কখনও কখনও তাঁহার অবচেতন মনের অন্তঃসলিলা রসধারা সমস্ত বাস্তববোধ ও ধর্ম্মবোধ ভেদ করিয়া ফোয়ারার মতন প্রধানতঃ গানের আকারে উৎসারিত হয়; যখন ঝড়ের মুখে বোট (boat) টলমল, তখন লেখেন "যদি বারণ কর, তবে গাহিব না"; যখন লিখিতেছেন 'দামামা ঐ বাজে,

দিনবদলের পালা এল
ঝোড়ো যুগের মাঝে'

প্রায় সেই সময়েই লিখিলেন,

'সুবল দাদা আনল টেনে আদম দীঘির পাড়ে,
লাল বাঁদরের নাচন সেথায় রামছাগলের ঘাড়ে।'

তা'ছাড়া ধর্ম্মবোধের কবিতা রচনার কালেও তাঁহার শুদ্ধ যুক্তি-বাদী সত্তার ক্রিয়া শুধু গদ্যে নয় পদ্যেও অভিব্যক্ত হয়, 'গীতাঞ্জলি'তে আত্মনিবেদনের মধ্যেও 'দুর্ভাগা দেশে'র মূঢ়তা ও ভবিষ্যৎ সর্ব্বনাশের কথা চিন্তা করিয়া তিরস্কার করেন।

রবীন্দ্র-মানসের নানা ধারা তাঁহার কাব্যস্রোতে যুগপৎ প্রবাহিত হওয়াতে গতি অনেক সময় কুটিল ও ইহার প্রকৃতি জটিল হইয়াছে। সুতরাং সাবধানে এ বিষয়ে আলোচনা করিতে হয়। তবে গতি যে একটা আছে, এবং তাহা যে একটা আত্মিক প্রগতির অনুগামী তাহাতে সন্দেহ নাই। কবির জীবনে একটা "আবির্ভাব" কি ভাবে তাঁহাকে "অতীতের মধ্য হইতে অনাগতের মধ্যে প্রাণের উপর প্রেমের হাওয়া লাগাইয়া···কাল মহানদীর নূতন নূতন ঘাটে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছেন," তাহাই রবীন্দ্রকাব্যের বস্তু।

(২)

"নূতন নূতন ঘাট" ধরিয়া কবিচিত্তের "অবারণ চলা"র অর্থাৎ কাব্য-রচনার সূত্র অবলম্বন করিয়া কবির আত্মিক প্রগতির মহান্ ইতিহাস বা মহাভারত আলোচনা করিলে আঠারোটি পর্ব্বের বা কবিচিত্তের আঠারোটি বিভিন্ন প্রকাশের সন্ধান পাওয়া যায়। অবশ্য নদীস্রোত এক ঘাট হইতে অপর ঘাটে অবাধেই প্রবাহিত হয়, বাঁক ঘুরিলেও স্রোতে বাধার সৃষ্টি হয় না; কবিচিত্তের এক একটি প্রকাশও তেমনি পরবর্ত্তী প্রকাশ হইতে বিচ্ছিন্ন বা বিযুক্ত নহে। শীতের পর বসন্ত যেমন অলক্ষিত ভাবেই আসে, তেমনই অলক্ষিত ভাবে এক

পর্ব্বের পর আর এক পর্ব্বের সূচনা হয়। তবে পর্ব্বের পারম্পর্য্যের মধ্যে এই চক্রগতি বরাবরই দেখা যায়।

পারম্পরিক তিনটি পর্ব্বে রবীন্দ্রকাব্যের এক একটি যুগ—এইরূপ ধারণা করা যাইতে পারে। এক একটি যুগ প্রেরণার এক একটি তরঙ্গের পূর্ণ বিস্তার। ভাবাভাব, ভাব, মহাভাব—পর পর এই তিনটি অবস্থা অতিক্রান্ত হওয়ার পর এক একটি তরঙ্গের প্রশমন হয়, তাহার পর অপর একটি তরঙ্গ অনুরূপ ভাবে অগ্রসর হয়। এই লীলা-চাঞ্চল্য ও তাহার নিয়মিত আন্দোলন চিরকালই রবীন্দ্রকাব্যে চলিয়াছে।

(৩)

এই কয়েকটি পর্ব্ব ও যুগের পারম্পরিক সম্পর্ক নিম্নলিখিত নক্‌শা ধরিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এক একটি পর্ব্ব সমকালে রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম দিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তবে এই নির্দ্দেশ একেবারে নির্দ্ধারিত নহে; তাহার কারণ পূর্ব্ব পরিচ্ছেদেই ব্যক্ত করা হইয়াছে। তবে ইহার চেয়ে সূক্ষ্মভাবে নির্দ্দেশ করার আর কোন সহজ উপায় নাই।

এই পারম্পর্য্য লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে ভাবাভাবে ইহার সূত্রপাত ও মহাভাবে ইহার পরিশেষ। * আধ্যাত্মিক সাধনার ইতিহাসই এইরূপ। সৃষ্টিরও বোধ হয় এই ইতিহাস।

অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত

(তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।৭)

কিন্তু সৎ (অর্থাৎ অভিব্যক্ত জগৎ) প্রকট হইলেই হয় সৃষ্টি-কালের আরম্ভ। এই জন্যে এক একটি ভাব হইতেই রবীন্দ্রকাব্যের এক একটি যুগের আরম্ভ। এক একটি যুগ ধরিয়া এক এক প্রকার অনুভবের পূর্ণ বিকাশ হয়। কবিচিত্তে এক একটি **উল্লাস** বা এক একটি আবির্ভাবের আনুষঙ্গিক ক্রিয়া চলিতে থাকে এক একটি যুগ ধরিয়া।

* যেখানে একটা নিবন্তব চক্রগতি আছে সেখানে কোথায় আবম্ভ তাহা নির্ণয় কবা দুরূহ। প্রথমে বীজ ও পবে বৃক্ষ, না, প্রথমে বৃক্ষ ও পবে বীজ—এই প্রশ্নেব শেষ মীমাংসা বোধ হয় আজও হয় নাই। ববীন্দ্রকাব্যেব বিবর্ত্তন লক্ষ্য কবিয়া যেরূপ প্রতীতি হয়, তদনুসারেই এই পরিচয় দেওয়া হইল।

(৪)

রবীন্দ্রকাব্যের বিবর্ত্তনের নক্‌শাটি এইরূপ ঃ

ভাবাভাব

ভাব → মহাভাব

যুগসন্ধ্যা	১ম পর্ব্ব সন্ধ্যাসঙ্গীত
১ম যুগ	২য় পর্ব্ব প্রভাতসঙ্গীত ৩য় পর্ব্ব কড়ি-ও-কোমল ইঃ ৪র্থ পর্ব্ব মানসী
২য় যুগ	৫ম পর্ব্ব সোনার তরী ৬ষ্ঠ পর্ব্ব চিত্রা, চৈতালি ইঃ ৭ম পর্ব্ব কল্পনা, কথা-ও-কাহিনী ইঃ
৩য় যুগ	৮ম পর্ব্ব ক্ষণিকা ৯ম পর্ব্ব নৈবেদ্য ১০ম পর্ব্ব স্মরণ, শিশু, উৎসর্গ ইঃ
৪র্থ যুগ	১১শ পর্ব্ব খেয়া ১২শ পর্ব্ব গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি ১৩শ পর্ব্ব বলাকা, পলাতকা ইঃ
৫ম যুগ	১৪শ পর্ব্ব পূরবী ১৫শ পর্ব্ব মহুয়া→পরিশেষ ১৬শ পর্ব্ব পুনশ্চ→শ্যামলী
অন্তিম যুগ	১৭শ পর্ব্ব প্রান্তিক→সানাই ১৮শ পর্ব্ব রোগশয্যায়→শেষ লেখা

পরবর্ত্তী কয়েকটি অধ্যায়ে এই ক্রমবিকাশের সূত্র অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনার পরিচয় দেওয়া হইল।

(৫)

হেগেল (Hegel)-রচিত ন্যায়দর্শন (logic as metaphysics) অনুসারে বিবর্ত্তনের মূল সূত্র হইতেছে Thesis, Antithesis ও Synthesis এই ত্রি-তত্ত্বের পর্য্যায়। Thesis অংশ-সত্য; এই অংশ-সত্য অপূর্ণ, সুতবাং ইহা অংশতঃ মিথ্যা। স্বভাবতঃ ইহার অনুক্রমে উদ্ভূত হয় ইহার বিপরীত অংশ-সত্য বা Anti-thesis. Thesis ও Antithesis-র বিরোধের অবসান হয় যখন একটা বৃহত্তর সত্য বা Synthesis-র মধ্যে উভয়ই মিলিত হয়। কিন্তু প্রথম পর্য্যায়ের Synthesisও পূর্ণ-সত্য নহে, সুতরাং পুনশ্চ সেই চিরন্তন প্রক্রিয়ার পুনরারম্ভ হয় ও তাহার ফলে আরও বৃহত্তর একটা Synthesis-র উদ্ভব হয়। এইভাবে Absolute Idea বা 'পূর্ণে'র দিকে ক্রমশঃ প্রগতি চলিতে থাকে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে হেগেল যাহাকে Thesis, Antithesis ও Synthesis বলিয়াছেন তাহাই ভাব, ভাবাভাব ও মহাভাব, অর্থাৎ (রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে) জীবন, মৃত্যু ও অমৃত। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যের অনুসরণ করিলে দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথের সাধনার ইতিহাস হেগেল-কথিত পর্য্যায়ের অনুগামী নহে। এখানে ভাবের অনুক্রম ভাবাভাবে নহে, মহাভাবে। মহাভাবের পর ভাবাভাব দেখা দেয় বটে, কিন্তু এই বিরোধের অবসান ঘটে বৃহত্তর কোন ভাবের মধ্যে উভয়ের সম্মিলনে নহে, একটা নূতন অপ্রত্যাশিত (emergent) আবির্ভাবে। ভাবধর্ম্মী পর্ব্বের কাব্যগুলির (প্রভাতসঙ্গীত, সোনার তরী, ক্ষণিকা, খেয়া, পূরবী, প্রান্তিক) মৌলিক উপলব্ধি বিবেচনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

তবে মূলতঃ রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির বিকাশের মধ্যে যে এক প্রকাশের দ্বন্দ্বমূলক (dialectical) সূত্র আছে, তাহা কবির নিজের অনেক স্বীকৃতিতেই প্রকটিত হইয়াছে। "আমার মধ্যে সৃষ্টি-সাধনকারী একাগ্র লক্ষ্য নির্দ্দেশ করে চলেছেন একটি গূঢ় চৈতন্য বাধার মধ্যে দিয়ে **আত্মপ্রতিবাদের** মধ্যে দিয়ে"—এই স্বীকৃতিতে Hegel কথিত The Idea, the Spirit, dialectical process—সবই সমর্থিত হইয়াছে। Creative Evolution-র তত্ত্বও এখানে স্বীকৃত।

রবীন্দ্রকাব্যের ক্রমবিকাশ

অতি অল্প বয়সেই রবীন্দ্রনাথ কাব্য রচনা আরম্ভ করেন, 'কবি হয়ে জন্মেছি ধরায়' এ কথা বলিবার অধিকার তাঁহার ছিল। তাঁহার প্রথম কাব্য যখন প্রকাশিত হয় তখন তাঁহার বয়স মাত্র সতের, ইহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই তিনি উল্লেখযোগ্য কবিতা রচনা করিতেছিলেন। তবে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে রবীন্দ্রনাথের অল্প বয়সের যে কবিতা-গুলি আছে, লেখকের বয়স হিসাবে সেগুলির যতই সুখ্যাতি হউক, এই সমস্ত **Juvenalia** (বাল রচনা)-র মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের নিজস্ব সাধনার পরিচয় পাওয়া যায় না। তখন পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অনুকরণ-স্পৃহা এবং কবিপ্রসিদ্ধ মত ও ভাবের প্রতিধ্বনি ছাড়া বড় একটা কিছু নাই। রোম্যান্টিক ভাবালুতা ও আদর্শের সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটিয়াছিল, বিলাতী রোম্যান্টিক কাব্য ও বিহারী-লাল প্রভৃতি দেশী কবিদের রচনা তাঁহার উপর স্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অবশ্য এই জাতীয় রচনার প্রতি রবীন্দ্রনাথের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিশোর কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অল্পবয়সের এই সমস্ত রচনায় স্থানে স্থানে কুশলতা, এমন কি বাহাদুরি দেখাইয়াছেন, কিন্তু তদপেক্ষা আর বেশী কিছু তাহাতে নাই। এই জন্য রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁহার কাব্যের বিচারের সময় ঐ অপরিণত বয়সের রচনাগুলিকে বাদ দিতে বলিয়া-ছেন। "কবি কাহিনী", "বনফুল" "ভগ্নহৃদয়", "রুদ্রচণ্ড"—এই কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ এই পর্য্যায়ে পড়ে। 'ভানুসিংহের পদাবলী'কেও এই সঙ্গে ধরা যায়। যদিও এই পদাবলী প্রকাশিত হয় কয়েক বৎসর পরে, রচনাকাল এবং সাহিত্যিক গুণ বিবেচনা করিলে

এই গুলিকে বাল্যরচনার মধ্যেই ফেলা উচিত। এই সময়ে কবির বয়স ১৪ হইতে ১৮।১৯ বৎসর, কবি তখন পর্যন্ত নাবালকেরই সামিল। জীবনেও তেমন উল্লেখযোগ্য কোন অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ রবীন্দ্রনাথের তখনও হয় নাই। তবে চারিদিকে যে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক আন্দোলনের স্রোত বহিতেছিল, যে সকল আদর্শের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের জীবনে পড়িতেছিল, তাহা হইতে নানা উপাদান অবশ্য কবির অন্তঃকরণে সঞ্চিত হইতেছিল।

এই সময়টাকে আমরা সৃষ্টির প্রাক্কালের সহিত তুলনা করিতে পারি। "Darkness was upon the void and the spirit of God moved upon the waters"—এই কথাগুলিতে জগৎ সৃষ্টির ঠিক পূর্ব্বের যে অবস্থাটি বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই অবস্থাই তখন রবীন্দ্রনাথের চলিতেছিল। তখনও তাঁহার "কাব্য-ভূসংস্থানে ডাঙা জেগে উঠ্‌তে আরম্ভ" করে নাই, একটা অন্ধকারময়ী শূন্যতাই তরল কবিচিত্তকে চাপিয়া রাখিয়াছিল, যদিও তাহার অন্তরালে সৃষ্টির আদ্যাশক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল। কবির জীবনে এইটাই কল্প-সন্ধ্যা। তবে এই সময়ের কোন কোন রচনায় যে কবিত্ব নাই এমন নয়। 'ভানুসিংহের পদাবলী'র কথাই প্রথমে মনে হইবে। ইহার ভাষা ব্রজবুলির সফল অনুকরণ, ইহার পদলালিত্য ও ছন্দের ঝঙ্কার চমৎকার। কিন্তু যাঁহারই বৈষ্ণব কাব্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, তিনিই স্বীকার করিরেন যে ইহার ভাব, ছন্দ বা বাচন-ভঙ্গী কোনটাই বৈষ্ণব পদাবলীর অনুসারী নহে। "মরণ রে, তুহুঁ মম শ্যাম সমান" ইত্যাদি পদের মধ্যে একটা চটক আছে, কিন্তু তাহাতে পদাবলীর রস নাই। আসলে ভানুসিংহের পদাবলীর মধ্যে পরের সোনা কানে দিবার প্রয়াসই বেশী আছে,—খাঁটি অনুভূতি কম।

যুগসন্ধ্যা

প্রথম পর্ব্ব

সন্ধ্যাসঙ্গীত

(ভাবাভাব)

রচনা কাল ঃ ১৮৮১ খৃঃ

বয়স ঃ ২০

রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কাব্যজীবনেব সূত্রপাত হইল 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'। পূর্ব্বে তিনি যাহা রচনা কবিয়াছিলেন তাহাব মধ্যে অল্পবিস্তর কাব্য-মূল্য আছে, কিন্তু সে সমস্ত কাব্য তাঁহার নিজস্ব উপলব্ধি ও প্রতিভার স্বতঃপ্রকাশ নহে, সেগুলি ছিল "কপিবুকের কবিতা"। কবির ভাষায় বলা যায়, "সেই কপিবুক-যুগের চৌকাঠ পেরিয়েই প্রথম দেখা দিল সন্ধ্যাসঙ্গীত। তাকে আমের বোলের সঙ্গে তুলনা করব না, করব কচি আমের গুটির সঙ্গে, অর্থাৎ তাতে তার আপন চেহারাটা সবে দেখা দিয়েছে শ্যামল রঙে। রস ধরে নি, তাই তার দাম কম।"

উৎকৃষ্ট কাব্য না হইলেও 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব অনুভূতির পরিচয় আছে। বিশ বৎসর বয়সে তরুণ যৌবনের উন্মুখ আকাঙ্ক্ষার সহিত জীবনসত্যের প্রতিঘাত হইতে এই কবিতাগুলির উৎপত্তি। এই প্রতিঘাতের ফলেই হইল কবির আত্মবোধের সূত্রপাত, তাঁহার আধ্যাত্মিক সত্তার বোধন।

প্রতিঘাতের বেদন হইতে 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র উৎপত্তি বলিয়া এই কাব্যে ভাবাভাবের লক্ষণ সুস্পষ্ট। য়ুরোপে রোমান্টিক আন্দোলনের

ইতিহাসে sturm and drang (ঝড়-ঝাপট)-যুগে যে মনোভাবের প্রকাশ হইয়াছিল, Goethe-র Sorrows of Werther-এ যাহার প্রমাণ রহিয়াছে, সেই মনোভাবের পরিচয় এই কাব্যে পাওয়া যায়। এই মনোবৃত্তির কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে; যথা, অতিরিক্ত ভাবাতুরতা, স্ব-চেতনতা (self-consciousness), তীব্র ভোগতৃষ্ণা, অধীরতা, এমন কি আত্মমর্দন ইত্যাদি। তাহার সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকে অতৃপ্তি, বিষাদ ও চিন্তাজর্জ্জরতা। এই সমস্ত লক্ষণই অল্পাধিক পরিমাণে 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' বর্ত্তমান। নিদর্শনস্থানীয় কয়েকটি কবিতার শিরোনাম হইতেই এই সমস্ত লক্ষণের ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে। 'তারকার আত্মহত্যা', 'আশার নৈরাশ্য', 'সুখের বিলাপ', 'দুঃখ-আবাহন', 'অসহ্য ভালোবাসা', 'হলাহল' ইত্যাদি কবিতার নাম হইতেই বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়। Sturm and drang-র উচ্ছ্বাসময় কাঁচা রোম্যান্টিকতার লক্ষণ সন্ধ্যাসঙ্গীতের সব কবিতাতেই আছে। সমগ্র কাব্যটির মধ্যে রহিয়াছে সন্ধ্যার রঙ, একটা আলো-আঁধারি নৈরাশ্য। কবির মর্ম্মবাণী প্রকাশ পাইয়াছে সন্ধ্যার আবাহনে।

যেথায় পুরানো গান, যেথায় হারানো হাসি
যেথা আছে বিস্মৃত স্বপন
সেইখানে সযতনে রেখে দিস গানগুলি,
রচে দিস সমাধিশয়ন।

কেবল আত্মবিলাপ নহে. আত্মবিলোপের কামনা-ও এখানে ধ্বনিত হইয়াছে।

'সন্ধ্যাসঙ্গীতের' কবি উপলব্ধির কোনও উচ্চগ্রামে আরোহণ করিতে পারেন নাই। শব্দচয়নে দৈন্যের এবং শব্দবিন্যাসে ও প্রকাশ-ভঙ্গীতে দুর্ব্বলতার, জড়িমার ও অপটুতার পরিচয় রহিয়াছে। ভাবা-

বেগ মাঝে মাঝে ঈষৎ তীব্র হইলেও, অনুভবের মধ্যে একটা গোধূলির অস্পষ্টতা রহিয়া গিয়াছে।

কিন্তু নানা ত্রুটি থাকিলেও 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র মধ্যে যথার্থ কাব্যগুণ আছে, অনুভূতির সত্য আছে, কবির যথার্থ প্রাণের কথা ও মুখের ভাষা এখানে ধ্বনিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় তীক্ষ্ণধী সমালোচকের কাছে ইহার কাব্যগুণ তৎক্ষণাৎ প্রকট হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ যে মূলতঃ গীতিকাব্যের কবি, **lyricism** যে তাঁহার স্বধর্ম্ম তাহা এখানেই পরিস্ফুট হইল। কবি নিজেকে আবিষ্কার করিলেন, নিজের পথ খুঁজিয়া পাইলেন।

রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কবিপ্রতিভা যে এখানে স্ফুরিত হইয়াছে তাহার আর একটা পরিচয় পাওয়া যায় এই কাব্যের ছন্দে। প্রচলিত পরিপাটীতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া কবি নূতন নূতন পরিপাটীর সন্ধান করিতেছেন, নানাভাবে চরণ গঠনের ও বিন্যাসের চেষ্টা করিতেছেন, তবে কোনটাই যেন একটা স্থির বা ধ্রুব রূপ গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, বুদ্বুদের মত ফুটিতে ফুটিতে তখনই লয় পাইতেছে। কবির ভাবসাধনা ও ছন্দসাধনা উভয়ই একভাবে চলিতেছে, ভাবের ও ছন্দের এক একটি অপরিস্ফুট রূপ—

"সমুখেতে ভাসিয়া বেড়ায়
কভু ফোটে কভু বা মিলায়।"

প্রথম যুগ

['প্রভাত সঙ্গীত'—'মানসী']

(১৮৮৩—১৮৯০)

(বয়স ২২-২৯)

"প্রাণের বাসনা, প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি"

'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' যে কবিত্ব-শক্তির আভাস দেখা গিয়াছিল, তাহার উন্মেষ হইল 'প্রভাত-সঙ্গীতে'। এই সময় কবি আইনের চক্ষেও যেমন নাবালক হইতে সাবালক হইলেন, সাহিত্য-সমালোচকের চক্ষেও তেমনি "কবিযশঃপ্রার্থী" হইতে "কবি" হইলেন। তাঁহার কবিতা মক্স করার দিন শেষ হইল; এই সময় হইতে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব প্রতিভার, নিজস্ব উপলব্ধির বাণী প্রকাশ পাইল তাঁহার কবিতায়। সদর ষ্ট্রীটের বাড়িতে থাকিবার সময় যে দিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার "চোখের উপর হইতে একটা পর্দ্দা সরিয়া গেল", তিনি "একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ" করিলেন, সেই দিন হইতে তাঁহার যথার্থ কাব্যসাধনার সূত্রপাত। ইহার পর হইতেই তাঁহার কাব্য তাঁহার বৈশিষ্ট্যময় জীবনের সাধনার সহিত এক হইয়া গিয়াছে।

এই সময় হইতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার ইতিহাসে যে প্রথম যুগের আরম্ভ হইল, তাহাকে আমরা **আত্ম-সচেতনতার যুগ** বলিতে পারি। কবি তাঁহার প্রাণের একটা নিজস্ব গতি, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি

সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠিতেছেন, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হইয়াছে। নিজের "প্রাণের বাসনা, প্রাণের আবেগ" ছাড়া কবি আরও একটা জিনিষের উপলব্ধি এই সময়ে করিলেন। বহির্জগতের মধ্যে, ধরণীব্যাপী সমগ্র মানবের চাঞ্চল্যের মধ্যেও যে একটা বিশিষ্ট সত্তা রহিয়াছে, তাহার একটা আভাস এই সময়ে তিনি অনুভব করিলেন। তাঁহার প্রাণের সহিত এই জগৎসত্তার যে একটা নিবিড় যোগ আছে, এবং পরস্পরের জন্যই যে এই উভয় সত্তার সৃষ্টি হইয়াছে, অন্ততঃ ইহাদের মধ্যে যে একটা ভাবের আদান-প্রদান চলিতে পারে, তাহাও তিনি প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিলেন।

সাধনার প্রথম ধাপ হিসাবে এই উপলব্ধি খুব অকিঞ্চিৎকর বলিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন। কারণ, উপনিষদে * প্রাণ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, সে অর্থে প্রাণের উপলব্ধির পরিচয় এ সময়ে পাওয়া যায় না। এই সময়ে প্রাণ বলিতে মানব-সুলভ বৃত্তি, অনুভূতি ও বোধের কেন্দ্র-ই বুঝিতে হইবে। তবে এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে ঐ সমস্ত বৃত্তি ও অনুভূতি আমাদের সকলের মধ্যেই থাকা সত্ত্বেও তাহাদের মৌলিক ঐক্য, তাহাদের সুদূরপ্রসারী আবেদন ও তাৎপর্য্য সম্বন্ধে সাধারণ মানবের বোধের অত্যন্ত অভাবই পরিলক্ষিত হয়। এতদ্ভিন্ন এই বৃত্তির তীব্রতা, একমুখিতা ইত্যাদি-ও সাধারণ ব্যক্তির চরিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। যেমন, যে ভাবে Wordsworth-এর কথিত "a simple child feels its *life* in every limb", সে ভাবে life বা প্রাণশক্তির অফুরন্ত প্রাচুর্য্য অনুভব করা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। অথচ এই প্রাণশক্তির

* "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্" (কঠোপনিষৎ ২।৩।২) ইত্যাদি উক্তি দ্রষ্টব্য।

তীব্রতা ও প্রাচুর্য্য-ই সাধকগণের চরিত্রের অন্যতম লক্ষণ। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রথম জীবনে দুর্দ্দান্ত উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিতেন, এই উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁহাদের প্রাণশক্তিরই পরিচায়ক। কিন্তু ইহা তাঁহাদের সাধনার পরিপন্থী না হইয়া বরং তাঁহাদের সাধনার সোপানই হইয়াছিল। জীবনীশক্তির সম্যক্ উদ্বোধন না হইলে আধ্যাত্মিক জীবনের সূত্রপাত হয় না। সুতরাং মানবিক বৃত্তির প্রখরতা সাধনার একটা প্রাথমিক সোপান বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে। অপিচ, যদিও সংসারের নানা সৌন্দর্য্য অনেক সময় আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া থাকে, তত্রাচ জাগতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে একটা ঐক্য ও একটা বিরাট্ প্রাণের প্রবাহ রহিয়াছে এবংবিধ অনুভূতি সুলভ নহে। অথচ বিশ্বের বিরাট্ সত্যের উপলব্ধির পক্ষে এতাদৃশ অনুভূতি-ই সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক। এই জাতীয় অনুভূতি-ই রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম যুগে কবিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, এই জন্যই রবীন্দ্র-সাধনার ইতিহাসে প্রথম যুগের কাব্যের একটা বিশেষ মূল্য আছে।

শুধু কাব্যরসের দিক্ দিয়া আলোচনা করিলে এই যুগের অনেক কবিতাকে খুব উচ্চ স্থান দেওয়া যাইতে পারে। যে স্থূল মানবতা (humanism) অনেক কাব্যের, এমন কি অনেক শ্রেষ্ঠ কাব্যের উপাদান তাহা এই সময়ের রচনায় সুপ্রচুর। Keats-এর প্রথম বয়সের রচনায়, D. G. Rossetti-এর অনেক কবিতায় যে যৌবন-স্বপ্ন ও উচ্ছ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা নিপুণ শিল্পকলার সহিত সংযুক্ত হইয়া এই সময়ের অনেক কবিতাকেই রসরূপ দান করিয়াছে।

দ্বিতীয় পর্ব্ব (ভাব)

["প্রভাত-সঙ্গীত" ; "ছবি ও গান"]

(১৮৮২-১৮৮৩)

(বয়স—২১।২২)

"জাগিয়া উঠেছে প্রাণ"

রবীন্দ্রসাধনার প্রথম যুগের প্রথম পর্ব্বের রচনা—'প্রভাতসঙ্গীত'। একটা নবজীবনের আবেগ ইহাকে আকুল করিয়া রাখিয়াছে, রবীন্দ্র-কাব্যে প্রথম "ভাবের" প্রবাহ এই কাব্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' নামক বিখ্যাত কবিতাটিতে এই ভাবটি পরিস্ফুট হইয়াছে। এই ভাবের প্রথম কথা একটা আত্মসচেতনতা—'জাগিয়া উঠেছে প্রাণ'। সেই প্রাণের সহিত পারিপার্শ্বিকের দ্বন্দ্ব—ইহার দ্বিতীয় তথ্য। 'ওরে চারিদিকে মোর—এ কী কারাগার ঘোর' ইহাই তাহার নালিশ। এই পাষাণকারাকে ভাঙিয়া চুরিয়া সে আত্মপ্রকাশ করিবে—জড় বাধার সহিত সংগ্রাম করিয়া প্রাণের প্রতিষ্ঠা করিবে ইহাই তাহার প্রতিজ্ঞা। তৃতীয়তঃ, এই প্রতিষ্ঠার অর্থ হইতেছে জীবনে সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণ বিকাশ, "কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া, রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া, রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া" জীবনকে বিকশিত করাই ইহার "সাধ"। এই ভাবে রবীন্দ্রকাব্যের কয়েকটি মৌলিক তত্ত্ব 'প্রভাত-সঙ্গীতে'ই প্রকাশ পাইয়াছে।

কিন্তু এই প্রকাশ এখনও অস্ফুট, প্রভাতস্বপ্নের ন্যায় মধুর হইলেও অলীক, প্রত্যুষের কুহেলির ন্যায় রঙীন হইলেও ক্ষণিক। 'সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়', 'অনন্ত জীবন', 'অনন্ত মরণ', ইত্যাদি নানা কল্পনার

রঙীন ফানুষ এখন কবির মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তাঁহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। বিশ্বসৃষ্টির 'প্রতিধ্বনি' তাঁহার অন্তরেও একটা আবেগের সৃষ্টি করিতেছে। কোন রহস্যের তত্ত্ব এখনও তিনি স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু পূর্ণিমা নিশীথে সিন্ধুর মত তাঁহার প্রাণ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। "হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি, জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।" মনে হইতেছে কী যেন একটা রহস্যের "অরুণ-রথচূড়া আধেক যায় দেখা"। তাহাকে তিনি আলিঙ্গন করিতে চান, "আমারে লও তবে, আমারে লও তবে" ইহাই তাঁহার আহ্বান। জগৎস্রোতে ভাসিয়া চলিতেই এখন তাঁহার আগ্রহ। একটা অবোধ অনির্দ্দিষ্ট আকুতিই 'প্রভাত-সঙ্গীতের' মূল ভাব।

এই ভাব-ই "ছবি ও গানে" আমরা পাই। তবে 'প্রভাত-সঙ্গীতে'র উপজীব্য ভাবের সহিত ইহার সামান্য কিছু পার্থক্য আছে। 'প্রভাত-সঙ্গীতে' আমরা পাই শুধুই একটা আঁকু-পাঁকু ভাব, উদ্বাহু হইয়া শূন্যকে আঁকড়াইয়া ধরার প্রয়াস। 'ছবি ও গানে' তাহা কতক পরিমাণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিতে পারি। পরবর্ত্তী কাব্য 'কড়ি ও কোমলে' কবির ভাব যে পথের অনুসরণ করিয়াছে, তাহার দিক্‌রেখার একটা আভাস এখানে পাওয়া যায়।

'ছবি ও গানে'র অধিকাংশ কবিতাতেই দেখা যায় একটা জাগ্রত স্বপ্নাতুরতা—স্বপ্নসাধনার সহিত স্বপ্নাবেশ। স্বপ্নসুখ "বাতায়ন-বাসী" কবিকে যেন বাহ্যজ্ঞানহারা "মাতাল", এমন কি সময়ে সময়ে 'যোগী'তে পরিণত করিয়াছে বলা যায়। 'কী এক রহস্যময়/সমুদ্রে অরুণোদয়/ আভাসের মতো যায় দেখা'—এই বোধই অপরিস্ফুট ভাবে কবির অন্তঃকরণে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

এই স্বপ্নসাধনার আর একটা দিক্ "রাহুর প্রেম" কবিতাটিতে ব্যক্ত হইয়াছে। রাহুর বিরতিহীন অনুসরণ, সর্ব্বগ্রাসী সর্ব্বনাশা ক্ষুধা এই সময়কার ভাবাবেগের একটা উপযুক্ত প্রতীক। আন্তরিকতা ও তীব্রতাব হিসাবে 'রাহুব প্রেম'ই এই কাব্যের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য কবিতা।

তৃতীয় পর্ব্ব (মহাভাব)

['কড়ি ও কোমল']

(১৮৮৪-১৮৮৫)

(বয়স—২৩।২৪)

'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই'

প্রথম যুগের দ্বিতীয় পর্ব্বের রচনা—'কড়ি ও কোমল'। 'প্রভাত-সঙ্গীত' একটা ভাবের কাব্য, 'কড়ি ও কোমল' মহাভাবের কাব্য। প্রথম পর্ব্বে যে ভাব আকাশে মেঘের মতন বিচরণ করিতেছিল এবং সূর্য্যকিরণে উজ্জ্বল হইয়া আমাদের দৃষ্টিকে মুগ্ধ করিয়াছিল, তাহা এখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া ধরাকে সরস করিয়াছে এবং নানা ফুল ও ফলে রূপান্তরিত হইয়া বিচিত্র পার্থিব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে। অস্পষ্ট আবেগ ও উচ্ছ্বাস এখানে রূপ গ্রহণ করিয়াছে, ভাব একটা মহাভাবে পরিণত হইয়াছে। যে কোন যুগের মহাভাবের কাব্যেই আমরা দেখি যে সেই যুগে কবির অনুভূতি ও কল্পনা যেন একটা সুস্পষ্ট আদর্শের রূপ গ্রহণ করিয়াছে। 'কড়ি ও কোমলে' কবির ভাব জীবনের পরিধিকে আলিঙ্গন করিয়া এক নূতন সৃষ্টিরূপে প্রকট হইয়াছে, তাঁহার যৌবনস্বপ্নে বিশ্বের আকাশ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের নিজের মতে, এই সময় হইতেই তাঁহার সার্থক কাব্য-সৃষ্টির আরম্ভ হয়, তাঁহার "কাব্য-ভূসংস্থানে ডাঙা জেগে উঠতে আরম্ভ করে।" ইহার পূর্ব্বে তাঁহার শিল্পকর্ম্মে যে যে দুর্ব্বলতা ছিল, তাহা এখন আর নাই।

অনুভবের দিক্ দিয়াও কবি এখন প্রাপ্তবয়স্ক। তিনি এখন বিবাহিত ; আদি ব্রাহ্ম সমাজের সচিব হিসাবে সমকালীন শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত ও দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুতে জীবনের নিদারুণ সত্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটিয়াছে, তাঁহার অলস স্বপ্নাবেশের দিন চলিয়া গিয়াছে। রসানুভবের সহিত মননশীলতার সহযোগের সূত্রপাত হইয়াছে।

'কড়ি ও কোমলে'র মূল ভাবটি পাওয়া যায়—'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে' এই কবিতাটিতে। প্রকৃতির ও মানবজীবনের স্থূল সৌন্দর্য্যের উপভোগ ও বাস্তব জীবনে একটা অক্ষুণ্ণ সৌন্দর্য্যের প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া "প্রাণের আবেগ, প্রাণের বাসনা"র চরিতার্থতা লাভের বাণী কবি এইখানে দিয়াছেন। Keats-এর প্রথম জীবনের কবিতার সুরের সহিত ইহার বেশ মিল আছে। ইন্দ্রিয়জ ভোগের কল্পনাবিলাস, মানবসুলভ আকাঙ্ক্ষা ইহার প্রত্যেক কবিতাকে একটা সহজগ্রাহ্য অনুপম রূপ প্রদান করিয়াছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে, শৈশবের স্মৃতিতে, নারীর রূপে যেখানেই যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্য্য মানবের মনকে স্পর্শ করিতে পারে, তাহাকেই কবি কাব্যরসে প্রাণবান্ করিয়া তুলিয়াছেন। মৃত্যু সে প্রাণোচ্ছ্বাসের উপর ছায়াপাত করিলেও তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই।

কিন্তু এই ভোগাকাঙ্ক্ষার সহিত একটা অতৃপ্তিও যেন গোপনে লুকাইয়া আছে। ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধুর্য্য যে সমস্ত কাব্যের উপজীব্য তাহাতে এই অতৃপ্তির সুর সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। 'কড়ি ও কোমলে' দেখিতে পাই যে মাঝে মাঝে কবি "কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস, ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরাণ" বলিয়া হাঁপাইয়া উঠিতেছেন ; কখনও বা "এ মোহ ক'দিন থাকে, এ মায়া মিলায়"

বলিয়া কবি বিলাপ করিতেছেন। স্বদেশ ও সমাজের মধ্যে, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্যে যে একটা পরিপূর্ণ জীবনের প্রতিষ্ঠা তিনি কল্পনা করিতেছেন, তাহা নানাভাবে ব্যাহত হইতেছে বলিয়াও কবির অন্তঃকরণে একটা অতৃপ্তি ঘনাইয়া উঠিতেছে। যে অতৃপ্তির সুর এখানে বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহা রবীন্দ্রকাব্যের একটা সনাতন সুর; এই অতৃপ্তিই চিরদিন রবীন্দ্রনাথকে "সম্মুখপানে চালাতে চলিতে" শিক্ষা দিয়াছে। তাই 'কড়ি ও কোমলে'র শেষের কবিতায় দেখি যে কবি বর্ত্তমান জীবন ও তাহার আদর্শের অসম্পূর্ণতা বুঝিতে পারিয়া দূর আকাশের দিকে তাকাইয়া অস্বস্তির দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছেন।

মনে হয় কি একটি শেষ কথা আছে,
সেইটি হইলে বলা সব বলা হয়।
কল্পনা ফিরিছে সদা তারি পাছে পাছে,
তারি পানে চেয়ে আছে সমস্ত হৃদয়।

চতুর্থ পর্ব্ব (ভাবাভাব)

["মানসী"]

(১৮৮৭—১৮৯০)

(বয়স—২৬-২৯)

"বৃথা এ ক্রন্দন
বৃথা এ অনলভরা তুরন্ত বাসনা !"

প্রথম যুগের তৃতীয় পর্ব্বের রচনা—"মানসী"। 'মানসী' ভাবাভাবের কাব্য, অর্থাৎ পূর্ব্বে যে ভাব ছিল তাহা অতিক্রম করিয়া একটা নূতন অভাব-বোধ এখানে দেখা দিয়াছে, এবং নূতন একটা ভাবের আভাস-ও যেন ফুটিয়া উঠিতেছে। তবে অভাবের বোধটাই বেশী প্রবল।

'মানসী' কাব্যে একটা তীব্র আধ্যাত্মিক নৈরাশ্যের সুর ধ্বনিত হইতেছে। বাস্তব জগতের ভোগের দ্বারা আত্মার পরিতৃপ্তি হয় না, আমাদের গভীরতম আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তির সহিত পারিপার্শ্বিক জীবন ও অবস্থার কোন সঙ্গতি নাই ;—এই অসঙ্গতি ও তজ্জনিত ব্যর্থতা কবিকে নিরন্তর পীড়িত করিতেছে। এইখানেই 'মানসী' কাব্যের "অভাব"।

'মানসী'তে দেখিতে পাই যে ভোগলিপ্সু মনের অন্তরালে যে মহত্তর আত্মা রহিয়াছে, তাহা জাগ্রত হইয়াছে। 'প্রভাত-সঙ্গীতে' যে প্রাণের জাগরণের কথা বলা হইয়াছে, তাহার সহিত এই জাগরণের পার্থক্য আছে। এখন বরং কবির কাছে 'প্রভাত-সঙ্গীতের' উচ্ছ্বসিত কল্পনা "নিশার স্বপন" বলিয়াই প্রতিভাত হইবে। "আত্মার রহস্য-শিখার" তীক্ষ্ণ দ্যুতিতে কবির মন ঝলকিয়া উঠিতেছে, "প্রভাত-সঙ্গীতে'র

উষালোক "স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীমে" মিলিয়া গিয়াছে, "মহাকাশভরা এক নিবিড় আলো-অন্ধকারই" সত্য বলিয়া মনে হইতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পর্ব্বে যে উল্লসিত প্রাচুর্য্যের অনুভূতি ছিল, তাহার স্থলে এখন পাই "জীবনের অনন্ত অভাবের" বোধ।

এই অভাববোধের মূলে আছে একটা আধ্যাত্মিক অনুভূতি। আত্মার ক্ষুধা ও আকাঙ্ক্ষা মহত্তর, এই জন্য পার্থিব জীবনের লোভ বা মোহ তাহার পক্ষে যথেষ্ট নহে। বাস্তবের মোহ কবির এখন আর নাই। তিনি এই স্থূল ভোগের জগৎ ছাড়াইয়া অন্য একটা কিছুর সন্ধান করিতেছেন, কিন্তু তাহাকে ঠিক পাইতেছেন না, এই জন্যই "বৃথা এ ক্রন্দন"। মানব-প্রেম, স্বদেশ-প্রীতি, সমাজ-ব্যবস্থা, বিশ্ব-প্রকৃতির লীলা, মানবজীবনের তাৎপর্য্য ও লক্ষ্য ইত্যাদি যে বিষয়েই তিনি এখন আকৃষ্ট হইতেছেন, সর্ব্বত্রই তিনি একটা বৈষম্য ও মানবাত্মার ব্যর্থতা দেখিতে পাইতেছেন।

তবে অন্য একটা ভাবের আভাসও এখানে পাওয়া যায়। কবি-জীবনের সাধনার যাহা লক্ষ্য, যাহার প্রতি কবির মন-প্রাণ ধাবিত হইতেছে, তাহার স্থান বাস্তব জগতে নয়। সে "মানসী", ধ্যানলোকেই তাহার স্থান। স্থূল ভোগের জগতের সহিত আমাদের বন্ধন ছিন্ন হইলে আমরা বিরহী যক্ষ বা অন্ধ সুরদাসের ন্যায় তাহার সাক্ষাৎ পাই।

তবে এই 'মানসী' একেবারে কল্পনার সৃষ্টি নহে। ইহা বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতারই উচ্চতর রূপান্তর। সংসারের "বাসনা-মলিন" কলঙ্ক তাহাকে স্পর্শ করে না, দেশ ও কালের পরিবর্ত্তন তাহাকে বিকৃত করিতে পারে না। কবিকল্পনা বাস্তবকে রূপান্তরিত করিলে যাহা দাঁড়ায় তাহাই 'মানসী'। "মর্ম্মের কামনা" যখন গাঢ়তম ও গভীরতম

হয়, তখন আমরা বাস্তবকে যে বাস্তবাতীত অপরূপ মূর্ত্তিতে দেখি, তাহাই 'মানসী'।

ইহার চেয়ে বেশী দূর কবি এখন পর্য্যন্ত অগ্রসর হন নাই। কোনও লোকোত্তর প্রত্যক্ষ উপলব্ধির কথা 'মানসী' কাব্যে নাই। 'মানসী'র কবি পৃথিবীর-ই কবি, মানবিকতার-ই কবি, অধ্যাত্ম প্রেরণা এখনও তাঁহাকে কোনও অতীন্দ্রিয় জগতে লইয়া যায় নাই। এই কারণেই 'মানসী'র জনপ্রিয়তা আজ পর্য্যন্তও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। 'মানসী' সত্যই 'সকল-সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী'; মানব-সাধারণের হৃদয়ে যে স্থূল ও যে সূক্ষ্ম বাসনা চিরন্তন, তাহার এত সুন্দর ও সুনিপুণ রূপায়ণ খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়।

'মানসী'তেই কবিপ্রতিভা সর্ব্বপ্রথম পূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিল। 'মানসী'তে কবি আধুনিক মাত্রাচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন করেন; এক-তান সুরের বদলে ধ্বনি-হিল্লোলে তাঁহার ছন্দ স্পন্দিত হইয়া উঠিল। শুধু ছন্দে নহে, ভাষার প্রয়োগে, কবিকল্পনার সৃষ্টিশক্তিতে রবীন্দ্র-কাব্যের নিজস্ব ঐশ্বর্য্য ও গৌরব প্রকটিত হইল। রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য, তাঁহার অনুভূতি ও প্রকাশের মৌলিকতা, তাঁহার কাব্যসম্পদের ঐশ্বর্য্য 'মানসী' কাব্যেই পূর্ণবিকশিত রূপে প্রথম প্রস্ফুটিত হয় ও সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করে।

দ্বিতীয় যুগ

['সোনার তরী'—'কল্পনা']

(১৮৯২-১৯০০)

(বয়স ৩১-৩৯)

"স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত-সমান"

'মানসী' রচনার কাল রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের একটা সন্ধিক্ষণ। 'মানসী' পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ অনুভূতির একটা জগতে বিচরণ করিতে-ছিলেন, সে জগৎ আমাদের সুপরিচিত জগৎ। সেখানেও দেখি আমাদেরই "এই দিবা, এই নিশা—এই ক্ষুধা, এই তৃষা,—প্রাণপাখী কাঁদে এই বাসনার টানে।" সে পর্য্যন্ত অনেক সাহিত্যিক ও অনেক অসাহিত্যিক ব্যক্তিও পৌঁছিয়াছেন। বাস্তব জগৎ ও তাহার বিষয়ের সহিত আমাদের আত্মার গভীরতম ব্যাকুলতার বৈষম্য এবং তজ্জন্য একটা মর্ম্মভেদী ব্যর্থতা আমরা অনেকেই অনুভব করিয়া থাকি। 'কিন্তু ইহার পরে অগ্রসর হওয়াই শক্ত। উপলব্ধির অন্য একটা জগতে প্রয়াণ সকলেব পক্ষে সম্ভব হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে রুবায়েতের কবি ওমর খৈয়াম এই সাধারণ অনুভূতির জগৎ ছাড়িয়া আর বেশী দূর অগ্রসব হইতে পারেন নাই। অবশ্য তজ্জন্য তাঁহার কবিত্বের লাঘব হইয়াছে এ কথা বলা যায় না, বরং তাহাতে হয়ত রসসৃষ্টির বা প্রতীতি উৎপাদনের সুবিধা-ই হইয়াছিল। কবি **Keats** "ইহ" জগতের কথা দিয়াই তাঁহার অনবদ্য কাব্য রচনা করিয়াছেন, যদিও তাঁহার শেষের দিকের রচনা ও পত্রাবলী হইতে,

বুঝিতে পারা যায় যে অন্য এক জগতের সম্পর্কে তাঁহার উপলব্ধির সূত্রপাত হইয়াছিল। কবি Shelley কিন্তু লোকাতীত এক জগতের সন্ধান পাইয়াছিলেন, এবং Wordsworth লোকোত্তর অভিজ্ঞতার বাণীই তাঁহার অমর কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলিয়া রাখা দরকার। যে লোকোত্তর অনুভূতি বা লোকাতীত জগতের কথা বলা হইতেছে তাহা ভৌগোলিক একটা অঞ্চলের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট বা ব্যক্তিনিরপেক্ষ কিছু নহে। সাধারণ জগতের অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধপ্রয়াণ যাঁহারা করিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই যে একই উপলব্ধির জগতে উপনীত হইয়া থাকেন এমন নয়। এই উর্দ্ধলোক প্রত্যেকের বিশিষ্ট রুচি, প্রবৃত্তি, আধ্যাত্মিক শক্তি অনুসারে নিরূপিত হইয়া থাকে। এক কথায় ইহা আমাদের তপস্যারই সৃষ্টি—ইহা আমাদের নিজস্ব তপোলোক।

এই নিজস্ব একটা তপোলোকের সন্ধান রবীন্দ্রনাথের কাব্যে পাওয়া যায়—'মানসী'র পরবর্ত্তী যুগে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনেও এই সময়ে একটা নূতন যুগের আরম্ভ হইল। তাঁহার বয়স এখন ত্রিশের উর্দ্ধে; তিনি পুত্রকন্যার জনক, ঠাকুর-বংশের বিশাল জমিদারির পরিচালক। সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি এখন সুপ্রতিষ্ঠ লেখক ও সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদক। 'সাধনা' পত্রিকার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতার জন্য এই সময়টাকে 'সাধনা'র যুগও অনেক সময় বলা হয়।

এই সময়ে প্রকৃতির, বিশেষতঃ মধ্যবঙ্গের সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা পল্লী-অঞ্চলের ও পল্লীবাসীদের জীবনযাত্রার সহিত তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতির সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ইহার পরিচয় পাওয়া যায় সমসাময়িক "ছিন্নপত্রে" ও তাঁহার নূতন সৃষ্টি "গল্পগুচ্ছে"।

এই যুগে কবি যেন একটা নূতন অভিজ্ঞতার জগতে উপনীত

হইলেন, "বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবলোকের মধ্যে নিত্যসচল অভিজ্ঞতার প্রবর্ত্তনা" তাঁহার কল্পনাকে উন্মুখ করিয়া তুলিল। পূর্ব্ব পর্ব্বে বাস্তব জগতের তথ্য ও আধ্যাত্মিক আকুতির মধ্যে বৈষম্যের জন্য কবির মন-প্রাণ পীড়িত ও ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা হইতে কবি উদ্ধার পাইলেন এক স্বপ্নপ্রয়াণের মধ্যে। সেই স্বপ্ন চন্দ্রালোকের ন্যায় মানবজীবনের অভিজ্ঞতাকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে, ইহাই তাঁহার এই যুগের কেন্দ্রীয় উপলব্ধি। তিনি Browning-এর মত জীবনের বৈষম্যকে ব্যাখ্যা করিলেন না, তাহাকে অস্বীকার-ও করিলেন না; তিনি স্থূল জগতের প্রতিবেশে এক স্বপ্নসুন্দর কল্পলোকের সন্ধান পাইয়া 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' করিলেন। তাঁহার বাহন হইল 'সোনার তরী'। এই খানেই রবীন্দ্রকাব্যের ইতিহাসে দ্বিতীয় যুগের আরম্ভ হইল।

বাস্তবের নিষ্ঠুর পীড়ন হইতে মুক্তির যে একটা পথের ইঙ্গিত এই যুগের রবীন্দ্রকাব্যে পাওয়া যায়, সে পথ রবীন্দ্রনাথের একটা নিজস্ব পথ। ঠিক সেই রকম একটা পথের কথা অন্য কেহ বলিয়াছেন কি না সন্দেহ। এই সময়টায় বিশেষ করিয়া একটা বাস্তবাতিবর্ত্তী কল্পনার প্রাধান্য দেখা যায়। বাস্তবের কঠিন নিগড়ে কবির মন এখন আবদ্ধ নহে, বাস্তবকে ঘিরিয়া যে ধ্যান ও কল্পনার মণ্ডল রহিয়াছে সেইখানেই তাঁহার মন প্রাণ বিহার করিতেছে। এই সূক্ষ্ম পরিমণ্ডল হইতে এক অলৌকিক সুষমা সংসারে এখানে ওখানে বিকীর্ণ হইতেছে, তাহার সংস্পর্শে জগতের নানা বস্তু উজ্জ্বল আভায় ঝকমক করিয়া উঠিতেছে। কবি তাহা লক্ষ্য করিয়া সেই সুষমার উৎস খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন। 'সোনার শিকল' নহে, 'পরশপাথর'-ই এখন তাঁহার লক্ষ্য।

এই সময় হইতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে একটা অলৌকিক

অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। এখন হইতে তিনি মাত্র "বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঘেরা সুন্দর ধরাতলের" কবি নহেন। **এখন হইতে তাঁহাকে চালাইতেছে ও তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে অন্য এক অদৃশ্য মহৎ সত্তা।** কবি ক্রমে ক্রমে তাহারই প্রভাবে গিয়া পড়িতেছেন, তাহাকেই বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহারই নানা বিচিত্র রূপ তাঁহার চক্ষে প্রতিভাত হইতেছে। এই সত্তা নারীমূর্ত্তিকে আশ্রয় করিয়া প্রথম কবিকে দেখা দেয়, কখন কখন কবি তাহাকে প্রণয়িণী প্রেয়সীর সহিত অভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। কিন্তু এই অভেদারোপ কদাচ-ই কবি করিয়াছেন। ক্রমে সে মানসী মূর্ত্তিতে কবির কাছে দেখা দেয়; পরে কবি তাহাকে চিরবাঞ্ছিত মানস-সুন্দরী রূপে মনশ্চক্ষে দর্শন করেন। সেই সুন্দরীর মাধুর্য্যের পারাবারে অসীম আকাঙ্ক্ষার সহিত পরিপূর্ণ তৃপ্তি, বর্ত্তমানের সহিত অতীত ও ভবিষ্যৎ, স্থূল বাস্তবের সহিত সূক্ষ্ম কল্পনা এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। তাহার সৌন্দর্য্য চুম্বকের মত কবিকে আকর্ষণ করিয়াছে। প্রথমতঃ সে কবির ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে থাকিয়াও অপরূপ মানসসুন্দরী রূপে কবি-কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু ক্রমেই সে মায়াবিনীর মত কবিকে গ্রাস করিয়াছে এবং অতৃপ্তির অনলে তাহাকে দগ্ধ করিয়াছে। সে-ই সোনার তরীর কর্ণধার; চিত্রা রূপে সে জগতের সর্ব্বত্র সৌন্দর্য্য ও মোহ বিকিরণ করিতেছে; উর্ব্বশী রূপে সে "অখিল-মানস-স্বর্গে অনন্ত-রঙ্গিনী" হইয়া বিরাজ করিতেছে; আবার "মোহিনী, নিষ্ঠুরা, রক্তলোভাতুরা স্বামিনী" বা mistress-এর মত সে কবিকে আদেশ করিয়া নিরন্তর চালাইতেছে। সে-ই কবির "La Belle Dame Sans Merci"; আবার সে-ই 'জীবন দেবতা' রূপে কবি-হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য লইয়াছে এবং কবিকে শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক পুরস্কার

দিয়াছে। **এই যুগের রবীন্দ্রকাব্য এই "বিচিত্ররূপিনী", "কৌতুক-ময়ী-"র বিজয়-গাথা।**

কে সে?—এই "স্বপ্নসঙ্গিনী", "ভুবনমোহিনী" কে? সে ত শুধু কবিকল্পনার সৃষ্টি নয়। কবির জীবনের বাহিরে বিশ্বের বিরাট্ রহস্যের সিংহাসনে এই "মহারাণী, রাজরাজেশ্বরী"র আসন। এই কি মহামায়া? এই কি বিশ্বের আদ্যাশক্তি? যাঁহারা সাধক মহাপুরুষদের জীবনী আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে বিশ্বশক্তি নানা ভাবে নানা রূপে দেখা দিয়া থাকেন বা উপলব্ধির পরিধির মধ্যে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। সাধকের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির উপর এই রূপের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। এই ভাবেই দশমহাবিদ্যা ইত্যাদি লইয়া পৌরাণিক কাহিনীর উদ্ভব হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের জন্য সচ্চিদানন্দময়ী বিশ্বশক্তি এই এক অনভিজ্ঞাত-পূর্ব্ব রূপে তাঁহার কাছে প্রতিভাত হইয়াছিল। মীরাবাইয়ের "গিরিধারী গোপাল", শ্রীরামকৃষ্ণের "ভবতারিণী মা" যেমন তাঁহাদের সাধনলব্ধ নিজস্ব দেবতা ও পরমাত্মীয় ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতাও তাঁহার কাছে তাহাই ছিলেন।*

এই সময়টায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বাস্তব সত্যের স্থান সঙ্কীর্ণ। একটা "স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু" জাতীয় ভাব অর্থাৎ একটা অলৌকিক অনুভূতি এই দ্বিতীয় যুগের কাব্যে প্রবল ও পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। 'মানসী'র কবির দৃষ্টি ও 'সোনার তরী-চিত্রা'র কবির দৃষ্টি এক নহে। যে বাস্তব সমস্যা 'মানসী'র কবির সম্মুখে সমুপস্থিত হইয়াছিল, জীবনদেবতার ইঙ্গিতে তাহাকে পাশ কাটাইয়াই 'সোনার তরী'র কবি সহসা অন্য এক পথে অগ্রসর হইলেন।

* এই প্রসঙ্গে "আত্ম-পরিচয়ে"র ১ম প্রবন্ধ ও তাহার পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

পঞ্চম পর্ব (ভাব)

['সোনার তরী']

(১৮৯২-৯৩)

(বয়স—৩১।৩২)

—স্বপ্ন-প্রয়াণ—

'A fugitive and gracious light he seeks'

রবীন্দ্রকাব্যের দ্বিতীয় যুগের প্রথম রচনা 'সোনার তরী'; এই কাব্যেই এ যুগের মূল ভাবটি স্পষ্ট ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রথম কবিতা-ই একটা অভিনব উপলব্ধির নিদর্শন এবং স্বীকারোক্তি। কবি এখানে স্বীকার করিতেছেন যে এক মহামায়ার হাতে তিনি ধরা পড়িয়াছেন। মানবজীবনের বাহিরে ইহার সিংহাসন কিন্তু ইহার প্রভাব মানবের জীবনে পরিব্যাপ্ত। অলৌকিক একটা সৌন্দর্য্য ইহার পরিচয়; আমাদের যেন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া সে একটা অজানার দিকে আমাদের ইঙ্গিত করে। সাধারণতঃ নৈরাশ্যময় ও সঙ্কীর্ণ জীবনে আবদ্ধ থাকিয়া আমরা হা-হুতাশ করিয়া থাকি; বড় জোর, হৃদয়ের আশা আকাঙ্ক্ষার পুঁজি লইয়া তাহা হইতেই আমরা একটা মানসী প্রতিমা গড়িবার চেষ্টা করি এবং তাহাকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ মনে করি। এমন সময় সহসা অন্তরাল হইতে এক সৌন্দর্য্যময়ী শক্তি আসিয়া আমাদের জীবনে আবির্ভূত হয়; জীবনে যেন একটা বিপ্লব ঘটিয়া যায়, পুরাতন সব ধারণা বদলাইয়া যায়, সংসার ও জীবন একটা রহস্যাপ্লুত নূতন রূপে দেখা যায়। আমাদের পূর্ব্ব জীবনের যত কিছু

আধ্যাত্মিক সঞ্চয় এই প্লাবনে ভাসিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু ইহাকে আমরা ধরিতে পারি না, জীবনের অংশ করিয়া লইতে পারি না ; ইহা আমাদের মনে একটা অভূতপূর্ব্ব অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তৃপ্তি দেয় না, যেন বঞ্চনা করে ; মনে হয় আমরা "শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি, যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী"। তাহার হাতে আপনাকে সম্পূর্ণ ভাবে সঁপিয়া দিলেও তাহার করুণা পাওয়া যায় না, সেই রহস্যময়ী "বিদেশিনী" "শুধু মুখ পানে চেয়ে কথা না বলে" উপহাস করে ; তাহার "দেহসৌরভের" আমেজ, তাহার কেশরাশির ক্ষণিক স্পর্শ মাত্র আমরা পাইতে পারি, কিন্তু যতই আকুল ভাবে তাহাকে প্রার্থনা করি, তাহাকে কখনও আমরা ধরা-ছোঁওয়ার মধ্যে পাইব না। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতায় এই বিপ্রলব্ধির দীর্ঘ নিঃশ্বাস ধ্বনিত হইয়াছে।

'সোনার তরী'র অন্যান্য কবিতাতেও এই **অতিবাস্তব সৌন্দর্য্যের** কথাই বলা হইযাছে। 'নিদ্রিতা' কবিতায় ইহা রূপকের মাধ্যমে ব্যক্ত হইয়াছে ; "ঘুমের দেশে ঘুমায় রাজবালা, তাহারি গলে পরায়ে দিনু মালা" বলিয়া যে রাজপুত্র তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন, তিনি 'সোনার তরী'র কবির সহিত অভেদাত্মা। এই রূপকের অন্য একটা দিক্— অলৌকিকের ক্ষণিক স্পর্শ পাইলেও তাহাকে হাতে না পাওয়ার জন্য বিধুরতা—প্রকাশ পাইয়াছে 'সুপ্তোত্থিতা' ও 'পরশ পাথর' কবিতা দুইটিতে। স্বপ্নভঙ্গের পর রাজকন্যা উদাস অধীর চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন "কে পরালে মালা" ; সন্ন্যাসী ঠাকুর পরশপাথর হাতে পাইয়াও অনবধানতাবশতঃ হারাইয়া অতি দীন ও নিরাশ চিত্তে সেই পরশপাথরের ব্যর্থ সন্ধানে "বাকী অর্ধ ভগ্ন প্রাণ" দান করিলেন। 'গান-ভঙ্গে'র মধ্যেও সেই ইঙ্গিত রহিয়াছে ; "বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে

তবে সে মর্ম্মর ফুটে", মানুষের জীবনেও অলৌকিক একটা অনুভূতির শিহরণ আসিলে তবে যথার্থ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয়, কিন্তু সে সৌন্দর্য্য লোকোত্তর, তাহা কাশীনাথের গানের মত জনগণমনের তৃপ্তিবিধায়ক নহে। কবির মনে এখন যে উপলব্ধি প্রবল তাহাই, অর্থাৎ বাস্তবের মধ্যে একটা অতিবাস্তবের ইঙ্গিতের উপলব্ধি-ই এই কাব্যের 'দুই পাখি' 'যেতে নাহি দিব' প্রভৃতি কবিতার মর্ম্মবাণী। খাঁচার পাখি 'সোনার তরী'র কবিরই প্রতিনিধি; একদা কী করিয়া সে বনের পাখির প্রেমে পড়িল তাহা বিধাতাই জানেন, কিন্তু তদবধি সেই অর্দ্ধপরিচিত বনের পাখির সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষাই তাহার প্রধান প্রবৃত্তি হইয়াছে। "দু জনে কেহ কাবে বুঝিতে নাহি পারে, বুঝাতে নারে আপনায়", তবুও "একা একা ঝাপটি মাবে পাখা, কাতরে কহে কাছে আয়'। বসুন্ধরাও স্তব্ধ মর্ম্মাহত চারি বৎসরের কন্যার মত উদাসিনী, তরুর মর্ম্মরে একটা ব্যাকুলতার ধ্বনি, "মেঠো সুরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি বিশ্বের প্রান্তর-মাঝে"। 'সমুদ্রের প্রতি' ও 'বসুন্ধরা' কবিতা দুইটিতেও দেখি যে একটা বাস্তবাতীত রহস্যের ভাব অতি স্থূল রহস্যের ভিতর হইতেই যেন ইঙ্গিত করিতেছে।

প্রেমের কবিতাতেও এই সময়ে একটা পরিবর্ত্তন দেখা যায়। প্রেমের আকর্ষণ মূলতঃ অতিবাস্তবের আকর্ষণ এই উপলব্ধি এখন কবির মনে ফুটিয়া উঠিতেছে। তাই 'ঝুলন' ও 'হৃদয় যমুনা'য় দেখিতে পাই যে মৃত্যুর রহস্য যেন প্রেমের রহস্যের সহিত এক হইয়া গিয়াছে। 'মানস-সুন্দরী'তে যদিও বাস্তবজীবনে ও সাংসারিক সম্পর্কের মধ্যে প্রেমের বিজয়সিংহাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছে, তত্রাচ সেখানেও প্রেম একটা বহুজন্মব্যাপী রহস্য-লীলার সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে। 'দুর্ব্বোধ' কবিতায় কবি "অন্তহীন রহস্যনিলয়" প্রেমিক হৃদয়ের "নব

নব ব্যাকুলতা" ব্যাখ্যা করা যে অসম্ভব তাহাই বলিতে চাহিয়াছেন। মোটের উপর প্রেমের মধ্যেও একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্যের আভাস-ই 'সোনার তরী'তে ফুটিয়া উঠিয়াছে।*

* 'সোনার তরী'র কতকগুলি কবিতায় অবশ্য এই সমস্ত বিশিষ্ট লক্ষণগুলি নাই, সেই কবিতাগুলিতে প্রথম যুগোচিত লক্ষণাদিই দেখিতে পাওয়া যায়। এই অনুবৃত্তিতে অবশ্য বিস্মিত হইবার কিছু নাই। ('রবীন্দ্রকাব্যের পর্ব ও যুগ-বিভাগ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

ষষ্ঠ পর্ব্ব (মহাভাব)

[চিত্রা—চৈতালি]

(১৮৯৪-১৮৯৬)

(বয়স—৩৩-৩৫)

'স্বপ্নমঙ্গল'

"Spirit of Beauty, that dost consecrate
With thine own hues all thou dost shine upon"

'চিত্রা' দ্বিতীয় যুগেব দ্বিতীয় পর্ব্বেব রচনা। 'সোনার তরী'র অস্পষ্ট আকুলতা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কবি এইখানে একটা প্রগাঢ় উপলব্ধির জগতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, ভাব একটা মহাভাবে পরিণত হইয়াছে। যে অলৌকিক রহস্যময় সৌন্দর্য্য 'সোনার তরী'তে কবিকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিয়াছিল, তাহা "চিত্রা"য় একটা বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে। এক দিকে ইহা বিশ্বের প্রবাহের মধ্যে বিচিত্ররূপিণী 'চিত্রা' রূপে পরিস্ফুট হইয়াছে, অপর দিকে ইহা আমাদের অন্তরে অন্তরতম হইয়া 'জীবনদেবতা' রূপে বিরাজ করিতেছে। 'চিত্রা' ও 'জীবন-দেবতা'—এই নাম দুইটিই তাৎপর্য্যে পরিপূর্ণ।

রবীন্দ্রসাধনার মার্গে 'চিত্রা' একটা উল্লেখযোগ্য অবস্থান। এখানেই রবীন্দ্রনাথ **মানবহৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার সহিত জাগতিক সৌন্দর্য্যের একটা সামঞ্জস্য** উপলব্ধি করিলেন। এই জন্য কবির মন হইতে অধীর আকুলতার ও বাস্তববিমুখ স্বপ্নাতুরতার মেঘ কাটিয়া গিয়াছে; "আজি মেঘমুক্ত দিন", তাঁহার এখন মনে হইতেছে যে "সুখ অতি সহজ সরল"। "রাত্রে ও প্রভাতে" কবিতায় এই তত্ত্বই ব্যঞ্জিত

হইয়াছে। রহস্যময়ী নিশীথের উর্ব্বশী মূর্ত্তি এবং শান্ত ঊষার কল্যাণী মূর্ত্তি আসলে যে একই, একই জীবনসত্যের এ পিঠ আর ও পিঠ, তাহা এখন কবির কাছে সুস্পষ্ট হইয়াছে। 'সিন্ধুপারে' কবিতাটিতে ইহা আরও বিশদ ভাবে স্বপ্নকাহিনীর ছলে ব্যক্ত হইয়াছে। রহস্যময় আহ্বান; অবগুণ্ঠিতা রমণীমূর্ত্তি; অজ্ঞাত ভয় ও পুলকে মিশ্রিত কল্পনা-মধুর স্বপ্নরাজ্য; রহস্যময় উদ্বাহ; এবং পরে অপ্রত্যাশিতভাবে চিরপরিচিত জীবনদেবতারই সাক্ষাৎলাভ ও তাহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন। "খেলা করিয়াছে নিশিদিন মোর সব সুখে সব দুখে—এ অজানাপুরে দেখা দিল পুন সেই পরিচিত মুখে।" "সহজ, সরলে"র কাছে "রহস্যে"র পরাজয়, অথবা 'সহজ ও পরিচিতে'র মধ্যেই রহস্যের প্রকাশ, অস্তিত্ব ও পরিব্যাপ্তি—ইহাই এই কাব্যের প্রতিপাদ্য। এই তত্ত্বেরই ইঙ্গিত 'বিজয়িনী' কবিতায় পাওয়া যায়। রূপসীর নিরাবরণ অকুণ্ঠ সৌন্দর্য্যের কাছে রহস্যবিলাসী অনঙ্গদেবতা নতি স্বীকার করিলেন; প্রত্যক্ষ সরল সত্যের কাছে কল্পনাকৌতুক ও রঙ্গবিলাস পরাজিত হইল। এইবার কবির 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' যেন "দিনশেষে" সমাপ্ত হইল; তাঁহার "মাথা রাখিবার ঠাঁই" মিলিল উপবনসজ্জিত পল্লীনিকেতনের বকুল-ঝরা পথপ্রান্তে। 'পরশপাথরে'র কবি আজ সুর বদলাইয়া বলিতেছেন যে "ভালো নাহি লাগে আর—আসা যাওয়া বারবার—বহুদূর দুরাশার প্রবাসে"। কবি এইবার "রঙ্গময়ী কল্পনা"র "স্বর্গ হইতে বিদায়" গ্রহণ করিতে সমুৎসুক। "পলাতক বালক" এবার প্রতিদিবসের কর্ম্মে নিরলস থাকিয়া জীবনকণ্টকপথে চলিতে প্রস্তুত।

'জীবনদেবতা'র আবির্ভাব এই সময়ের অপর একটা লক্ষণীয় ব্যাপার। এই 'জীবনদেবতা' প্রত্যয় আর 'বিশ্বদেব' বা ঈশ্বর প্রত্যয়

এক নহে।* যদি জীবনদেবতা কেহ থাকেন, তিনি বাস্তবিক কে এবং তিনি আসলে স্বয়ং জগদীশ্বর কি না, ইত্যাকার তর্ক অনাবশ্যক ও অবান্তর। কবির উপলব্ধির দিক্ হইতেই বিষয়টি বিবেচনা করিতে হইবে। জীবনদেবতা ঐশ সত্তা হইলেও তাঁহার একটা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আছে। তিনিই কবির নিজস্ব আশা, আকাঙ্ক্ষার ধ্রুব নক্ষত্র, কিন্তু তিনি কেবলমাত্র আকাঙ্ক্ষারই বিকারসৃষ্ট একটা মূর্তি নহেন, কবির কল্পনাকে তিনিই নিরন্তর অনুপ্রাণিত করিয়া থাকেন। তাঁহার ধ্যানে, পূজায় ও তাঁহার সহিত মনোমিলনেই কবির চরম তৃপ্তি। তাঁহার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করাতেই, তাঁহার একান্ত সেবাতেই কবির জীবনের সার্থকতা। জীবনদেবতা-ও কবিহৃদয়ের প্রেমের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন, এবং মুগ্ধ ভক্তের প্রয়াস ও চেষ্টা নিয়ন্ত্রণ করিয়া চরিতার্থতার পথে লইয়া যান। মোটের উপর, এই জীবনদেবতাকে উচ্চতর লোক-বিহারী প্রেমাস্পদ বলা যাইতে পারে। প্রণয়ীকে হৃদয়দেবতা বা প্রণয়িনীকে হৃদয়েশ্বরী বলিতে যথার্থ যাহা বুঝায়, জীবনদেবতা-ও তাহাই।† তবে জীবনদেবতা সীমাবদ্ধ রক্তমাংসের জীব নহেন, এই মাত্র। তাঁহাকে সূক্ষ্ম অনুভূতির দ্বারাই পাওয়া যায়, তিনি ঐশী শক্তির সহিত একীভূত, এবং বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে তাঁহার লীলার প্রকাশ।

* * * *

---

* কবিব নিজেব মতে "বস্তুত চিত্রায জীবনবঙ্গভূমিতে যে মিলননাট্যেব উল্লেখ হযেছে তার কোনো নাযক-নাযিকা জীবেব সত্তাব বাইবে নেই, তাব মধ্যে কেউ ভগবানের স্থানাভিষিক্ত নয।"

† এই সম্পর্কে কবি বলিযাছেন, "চিত্রায · আমাব একটি যুগ্ম সত্তা আমি অনুভব করেছিলুম যেন যুগ্ম নক্ষত্রের মতো, সে আমারই ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত, তারই আকর্ষণ প্রবল। তারই সংকল্প পূর্ণ হচ্ছে আমার মধ্য দিযে, আমার সুখে দুঃখে, আমার ভালোয মন্দয।"

'চৈতালি'র কবিতাগুলি প্রায় এই সময়েই বা কিছু পরে লেখা হইয়াছিল, এবং তাহার মধ্যেও 'চিত্রা'র মনোভাব সুস্পষ্ট। এগুলি সদ্ভাবশতকের ন্যায় কেবল নিরপেক্ষ তত্ত্বময় রচনা নহে। সাধারণ মানবজীবনের নানা দিকের পরিচয়, নানা বাস্তব চিত্র এই কবিতাগুলির মধ্যে এবং 'চিত্রা'রও কয়েকটি কবিতায় আছে, এবং সর্ব্বত্রই কবি জাগতিক সত্যের মধ্যে তাঁহার অন্তরের মহাভাবের বাহ্য প্রকাশ দেখিতে পাইতেছেন।* প্রাচীন ভারতের জীবনের নানা চিত্র, পশ্চিমী মজুরের ছোট মেয়ের ভ্রাতৃস্নেহ, পদ্মার প্রবাহ, নারীর সৌন্দর্য্য সর্ব্বত্রই যেন অন্তরব্যাপিনী, বিচিত্র-প্রেমলীলা, চিররহস্যময়ী জীবনদেবতার পরিচয় রহিয়াছে। "দেবতার বিদায়ে"র নীতিকথা পুরাতন হইলেও ইহার মধ্যে জীবনদেবতার তত্ত্ব নিবিষ্ট আছে। জীবনদেবতা-ই জগতে দরিদ্র বা অন্য কোন অসুন্দর রূপে ফিরেন, এবং নানা ভাবে ভক্তকবিকে ছলনা করেন। বঙ্গমাতা, পদ্মা, প্রাচীন ভারত—যে রূপেই হউক না কেন, এই জীবনদেবতা একটা মোহমধুর স্নিগ্ধ স্বপ্ন রচনা করিয়া বাস্তবের উপর একটা রঙীন আভাস আনিয়া দেন।

* কবি বলিয়াছেন, "চৈতালি ...এক টুকরো কাব্য যা অপ্রত্যাশিত। স্রোত চলছিল যে রূপ নিয়ে অল্প-কিছু বাইরের জিনিসের সঞ্চয় জমে ক্ষণকালেব জন্যে তার মধ্যে আকস্মিকের আবির্ভাব হল।"

সপ্তম পর্ব্ব (ভাবাভাব)

[*'কল্পনা'—'কথা ও কাহিনী']

(১৮৯৭—১৮৯৯)

'স্বপ্নভঙ্গ'

"Not without hope we suffer and we mourn"

'চিত্রা'য় যে মহাভাবের পরিচয় আমরা পাই, তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি দেখিতে পাই 'কল্পনা'র অনেকগুলি কবিতায় এবং 'কথা ও কাহিনী'তে। এই সময়ে অর্থাৎ দ্বিতীয় যুগের শেষ পর্ব্বে পুনশ্চ একটা অভাবের বেদনা ও স্বপ্নবিহারী কল্পনার বিপক্ষে বিদ্রোহের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটা **'স্বপ্নভঙ্গে'র কথা ও কাহিনী** এই পর্ব্বের কাব্যে বিবৃত হইয়াছে।

এই বিদ্রোহের ভাব 'চৈতালি'র "বঙ্গমাতা" প্রভৃতি কবিতাতেও কিছু কিছু পাওয়া যায়। যে "মুগ্ধ জননী" সাত কোটি সন্তানেরে বাঙালি করিয়া রাখিয়াছেন, মানুষ করেন নাই, তিনি শুধু 'বঙ্গমাতা' নহেন, তিনি কবির স্বপ্নরাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী 'চিত্রা'-ও বটেন। মানুষ হইবার জন্য যে পুণ্য পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে জীবনের ভালো-মন্দের সহিত পরিচয় থাকা ও সংগ্রাম করা দরকার, সেই ভাব-ই

* 'কল্পনা' মিশ্র কাব্যগ্রন্থ ; অর্থাৎ ইহাতে 'চিত্রা'র মহাভাবের পাশাপাশি নূতন এক ভাবাভাবের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। জগতের মাঝে বিচিত্ররূপিনীর জয়গাথা কতকগুলি কবিতায় ধ্বনিত হইয়াছে, আবার কতকগুলিতে নিবিড়-তিমির-আঁকা মহনভ-অঙ্গনের মহা আশঙ্কা জপিত হইয়াছে। যে কয়েকটি গান ও শ্লেষাত্মক কবিতা ইহাতে স্থান পাইয়াছে, সেগুলির সহিত কবির সাধনার সংযোগ নাই। ('রবীন্দ্র-মানসের ত্রিধারা' দ্রষ্টব্য)

ক্রমে প্রবল হইয়া 'কল্পনা' এবং 'কথা ও কাহিনী'তে পূর্ণতর অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। এই সময়ে কবি অনুভব করিতেছেন যে একটা কঠোর, এমন কি নিষ্ঠুর অথচ বিরাট্ সত্য চারিদিক্ হইতে জীবনকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে এবং আমাদের কল্পনার গণ্ডী ভাঙিয়া জীবনকে পীড়িত করিতেছে। 'চিত্রা'য় যে স্বর্গ রচিত হইয়াছিল এবং পার্থিব জীবনে তাহার যে প্রতিচ্ছবি দেখা গিয়াছিল, তাহা ক্রমশঃ অলীক স্বপ্নের ন্যায় ক্ষীণ হইয়া উঠিতেছে। Keats-এর Ode to a Nightingale-এর শেষে স্বর্গ হইতে বিদায়ের জন্য যে বিলাপ ধ্বনিত হইয়াছে— "Fancy cannot cheat so well, deceiving elf"—সেই বিলাপের মূলে যে উপলব্ধি ছিল, এখানেও তাহাই বর্ত্তমান। "ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা"—ইহাই 'কল্পনা'র মৌলিক উপলব্ধি। সুতরাং 'কল্পনা'র মধ্যেও একটা অভাবের ছায়া পড়িয়াছে। কিন্তু 'মানসী'র সহিত ইহার পার্থক্য উল্লেখযোগ্য। 'মানসী'র ক্রন্দন স্থূল জগতের স্থূল ভোগের অসম্পূর্ণতা ও অসারতা বোধের জন্য; 'কল্পনা'র বিষাদ কল্পলোকের তিরোভাবের জন্য। 'মানসী'র কবি আর্ত্ত, দুর্ব্বল; 'কল্পনা'র কবি আধ্যাত্মিক উপলব্ধির শক্তিতে বলীয়ান্, আত্মপ্রত্যয়বান্; "ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,—এখনি, অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা"—ইহাই এখন তাঁহার বাণী।

'কল্পনা'তেই কবি সর্ব্বপ্রথম উপলব্ধি করিলেন যে **সংসারে ক্ষুদ্র বৃহৎ, ভাল মন্দ সর্ব্ববিধ ব্যাপারই এক বিরাট মহৎ সত্যের প্রকাশ।** সে সত্য দুর্জ্ঞেয়, তাহা হয়ত আমাদের বচনাতীত, এমন কি আমাদের বুদ্ধি ও বিচারের অতীত। তাহার হাত হইতে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়, বোধ হয় মুক্তির চেষ্টা করাই বিড়ম্বনা ও মূর্খতা। 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'য় যে কল্পলোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তাহা হইতে এই

জগদ্ব্যাপী ও জীবনব্যাপী সত্য বিভিন্ন। এই সত্য হইতে নিস্তার কোথাও নাই, ইহা আমাদের স্বপ্নসুন্দর চিরপোষিত কল্পনাকে বঞ্চিত করে। প্রতীক্ষমানা তরুণীর লগ্ন ভ্রষ্ট হয়; স্বপ্নলোকে প্রিয়ার সাক্ষাৎ পাইলেও তাহাকে চিনিতে পারা যায় না, রজনীর অন্ধকার সমস্ত অবলুপ্ত করিয়া দেয়।* শুধু তাহাই নয়। এই সত্যের পরিচয় নিষ্ঠুর কঠোরতায়, 'চিত্রা'-'চৈতালি'র প্রতীয়মান সুষমায় নহে। আকাশে বন্ধ্যা সন্ধ্যার আগমন ঘটে, কল্পনার কুন্দকুসুমরঞ্জিত কুঞ্জের স্থলে বিরাট্ নিষ্ঠুর সত্যের বারিধির ফেনহিল্লোল ফুটিয়া উঠে। কিন্তু কবির আত্মা নিজেকে নিরাশ্রয়, অসহায় বোধ করিলেও আপন অন্তরের শক্তির বলে আঘাতের বেদনা জয় করিয়া কঠোর সত্যকে অবলম্বন করিয়াই প্রলয়ের ওপারে অলক্ষ্য লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইল। এই ভাবে 'চিত্রা'-'চৈতালি' পর্ব্বের আধ্যাত্মিক সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্তি-ই 'কল্পনা' পর্ব্বের বিশেষত্ব। 'চিত্রা'র কবি

The light that never was on sea or land,
The consecration, and the **Poet's Dream**

-এর কথা বলিয়াছেন; 'কল্পনা'র কবি তাহা হইতে বিদায় লইয়া বলিতেছেন

Farewell, farewell the heart that lives alone,
Housed in a dream, at distance from the Kind !

ইহার মধ্যেও কিন্তু জীবনদেবতার লীলা ও ক্রিয়া আছে। জীবন-দেবতাই অদৃশ্য শক্তিরূপে জোর করিয়া কবিকে দিয়া কাজ করাইয়া লইতেছেন, যদিচ কবির মুগ্ধ হৃদয়কে প্রলুব্ধ করা, বঞ্চিত করা, ছলনা

* এই প্রসঙ্গে 'চিত্রা'র 'সিন্ধুপারে' কবিতাটি তুলনীয়

করা এবং সান্ত্বনা দেওয়াও তাহার কাজ। এই জন্য কবি তাহাকে "রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা—ওরে রক্তলোভাতুরা—কঠোর স্বামিনী" বলিয়া আবার তাহার কাছেই আবেদন করিতেছেন। স্বপ্নভঙ্গের পর কবি যে নৈরাশ্য ও অবসাদের অন্ধকারে আপনাকে বিলুপ্ত করিয়া দিবেন, তাহাও সে সহ্য করিবে না; কবিকে সে পুনশ্চ আহ্বান করে সংসারের কর্ম্মভার গ্রহণ করিবার জন্য। "এ তো খেলা নয়, এ তো খেলা নয়, এ যে হৃদয়-দাহন জ্বালা, সখি" বলিয়া কবি অনুযোগ করিলেও কবির নিস্তার নাই। জীবনদেবতার প্রাসাদে সুপ্তি বা তন্দ্রা নাই। *

এই ভাবে 'কল্পনা'য় একটা Vita Nuova বা নবজীবনের সূত্র-পাত হইল। এই নবজীবনের আদর্শ ও বাণী 'বর্ষশেষ' কবিতার উদাত্ত, তীব্র সুরে ধ্বনিত হইয়াছে। কালবৈশাখীর রূপে নূতনের আবির্ভাব হইল; পুরাতন বৎসরের ক্লান্তি জীর্ণপাতার ন্যায় উড়িয়া গেল। বসন্তের আবেশহিল্লোল বা মর্ম্মরিত কূজনগুঞ্জন ('চিত্রা'র ন্যায়) সে আনে না। ধ্বংসের ভিতর দিয়া সে নূতনের সৃষ্টির আয়োজন করে। তাহার আদর্শ কবির জীবনে ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া গিয়াছে,—ক্ষুদ্রতার পঙ্ক হইতে উদ্ধার পাইয়া তিনি "মহান মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি" হইতে চাহেন, "যুগযুগান্তরের বিরাট স্বরূপ"-কে দেখাই তাঁহার এক মাত্র লক্ষ্য। তাহার পরে তিনি ভগ্ন, চূর্ণ হইয়া লুপ্ত হইলেও তাহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই।

* এইরূপেই আদ্যাশক্তি সমস্ত জগৎকে চালাইতেছেন, নিজের উদ্দেশ্যকে সফল করিতেছেন, তাঁহার বিচিত্র লীলা সার্থক ও মূর্ত্ত হইতেছে; মানুষের মধ্যে যে পুরুষ শক্তি মহাদেবের মত, হয়, গুণাতীত ধ্যানযোগে, না হয়, তমোময় অবসাদের নেশায় সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে চায়, প্রকৃতি তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া সত্ত্বরজোময় সংসারকর্ম্মে নিয়োজিত করেন।

এই নবজীবনের নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি-কে কবি 'বর্ষশেষ' কবিতায় রণজয়ী কিশোরকুমার কার্ত্তিকেয় রূপে কল্পনা করিয়াছেন। পরে 'বৈশাখ' কবিতায় তাহাকে তিনি রুদ্রভৈরব রূপে দেখিয়াছেন। ললিত সৌন্দর্য্য তাহার নাই, বরং তাহার সাধনার অগ্নিশিখায় সমস্ত জড়তাময় পদার্থস্তূপ ধ্বংস হয়; কিন্তু সে-ই আমাদের শান্তি দেয়, দুঃখকে বিস্তারিত রূপে দেখাইয়া এবং "সুখ দুঃখ আশা ও নৈরাশে"র অবসান করিয়া "বিশাল বৈরাগ্যে" হৃদয় পূর্ণ করে ও স্বস্তি দেয়। এমন কি কবি মাঝে মাঝে অনুভব করেন যে বিশ্বের অন্তর অন্তঃপুরে একেশ্বরী রাণী হইলেন মহাকালী শর্ব্বরী, তাঁহারই নিখিললুপ্ত অন্ধকারে মহাযোগী বিশ্বের মুক্তিপথ দেখিতে পান।

আপাততঃ এই ভাবেই কবি **জীবনদেবতার মায়া হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া মহত্তর জীবনসত্যের দিকে অগ্রসর হইলেন।**

* * * *

এই কঠোর জীবনসত্যের বাস্তব পরিচয় কবি দিয়াছেন **"কথা ও কাহিনী"র আখ্যায়িকাগুলিতে।** এই সত্য আমাদের আশাকে চূর্ণ করে, আকাঙ্ক্ষা-কে ধ্বংস করে, আমাদের মনগড়া ন্যায় অন্যায়, উচিত অনুচিত, ধর্ম্মাধর্ম্ম-বোধকে বিদ্রূপ করে। আমরা অহরহ আপন অন্তর হইতে বাসনার দ্বারা, আমাদের বুদ্ধির দ্বারা, আমাদের কল্পনার দ্বারা জগৎ সম্বন্ধে যে ধারণা গড়িয়া তুলিয়াছি, তাহার মিথ্যা কি ভাবে জীবনসত্যের নিকষে ধরা পড়ে, তাহা এই কাহিনীগুলিতে উদাহৃত হইয়াছে। শ্রীমতীর ভক্তি, বাসবদত্তার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা, কেসর খাঁয়ের রঙ্গরসস্পৃহা প্রভৃতি উচ্চ ও নীচ প্রবৃত্তি এই জীবনসত্যের কাছে যেমন ব্যাহত হইয়াছে, তেমনই শ্যামার আত্মনিবেদন, বজ্রসেনের ধর্ম্মবোধ, মল্লিকার সুগভীর সন্তানস্নেহ ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা, মোক্ষদার অন্তরব্যথা,

মৈত্র মহাশয়ের অন্তিম বিবেকদংশন, নিরপরাধ অনাথ রাখালের নিরুপায় প্রাণভিক্ষা ইত্যাদি পবিত্র, মহৎ, করুণ অনুভূতিগুলিও ইহার কাছে উপহসিত হইয়াছে। এই জীবন-সত্যকে উদ্দেশ করিয়া বলা যায়—

দেবতার মতো তুমি নিশ্চল নিষ্ঠুর
অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান।

তত্রাচ মনুষ্যত্বের গৌরব এই যে এই নিষ্ঠুর দেবতার দণ্ড-কে সে অবিচল ভাবে মাথা পাতিয়া লইতে পারে এবং মানবিক আদর্শে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে।

In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeonings of chance
My head is bloody, but unbowed.

এই গৌরবই অর্জ্জন করিয়াছিলেন কর্ণ, যিনি "নিষ্ফলের, হতাশের দল" বরণ করিয়াছিলেন, "জয়লোভে যশোলোভে রাজ্যলোভে" বীরের সদ্‌গতি হইতে ভ্রষ্ট হন নাই; করিয়াছলেন মহারাজ সোমক, যিনি স্বেচ্ছায় স্বর্গসুখ ত্যাগ করিয়া পাপীর প্রতি সমবেদনায় নরকবাসী হইয়াছিলেন; করিয়াছিলেন গান্ধারী, যিনি পতিপুত্রপ্রীতির উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক মহাকালের শাস্তির প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন; করিয়াছিলেন বন্দা, যিনি "নিজহাতে অবহেলে" শিশুপুত্রকে বধ করার পর স্থিরভাবে দগ্ধ সাঁড়াশিতে ছিন্নদেহ হইয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। এই ভাবে "কথা ও কাহিনী"র আখ্যান-কাব্যগুলিতে "ঋজু শুভ্র মুক্ত জীবনের জয়ধ্বনি" সুকঠোর বেদনার ভাষায় ঘোষিত হইয়াছে।

তৃতীয় যুগ

[‘ক্ষণিকা’—‘উৎসর্গ’]

(খৃঃ অঃ ১৯০০-১৯০৪)

(বয়স ৩৯-৪৩)

“ভাল মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে”

কাব্যজীবনের দ্বিতীয় যুগের পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ কঠোর বাস্তবের মধ্যে একটা বিরাট্ সত্তার আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এবং “অতি উচ্চ বেদনার আগ্নেয় চূড়া”য় মানব আত্মার “অনির্ব্বাণ জ্যোতি”র উদ্ভাসন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠ ট্রাজেডির মধ্যে আমরা যে উপলব্ধির পরিচয় পাই, তাহাই যেন এই সময়ে তাঁহার কাব্যে রূপায়িত হইতেছিল। মনে হইতোছল যে কবি এইবার স্বপ্নলোকের প্রতি বিমুখ হইয়া কর্ম্মবৈচিত্র্যের মধ্যে আত্মদান করিবেন, “দেবতার দীপ হস্তে” আবির্ভূত “রুদ্রদূতের” ন্যায় “বন্ধন পীড়নদুঃখ অসম্মান মাঝে” “আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান” গাহিবেন, বিবেকানন্দ বা উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের আদর্শ তাঁহার জীবনে ও কাব্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে। ‘কথা ও কাহিনী’র অনেকগুলি কবিতা হইতে এই ধারণার পোষকতা পাওয়া যায়। কিন্তু ঠিক এই সময়ে আবার একটা গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিল, রবীন্দ্রকাব্য আর একবার মোড় ফিরিয়া নূতন পথে অগ্রসর হইল। ‘সোনার তরী’তে বোঝাই সাঙ্গ করিয়া এবার কবি তাহাকে বিদায় দিলেন।

"অনেক খেলা অনেক মেলা সকলি শেষ করে
চল্লিশেরই ঘাটের থেকে বিদায় দিনু তোরে।"

এই পরিবর্ত্তনের প্রমাণ প্রথম পাওয়া যায় 'ক্ষণিকা'য়।

এই জাতীয় দিক্‌পরিবর্ত্তন রবীন্দ্রকাব্যের ইতিহাসে অনেকবারই ঘটিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। 'মানসী'র পর 'সোনার তরী' রচনায়, 'বলাকা' ও 'শিশু ভোলানাথের' পর 'পূরবী' রচনায় এতাদৃশ বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রমানসের মূল প্রবৃত্তির সহিত এই পরিবর্ত্তনশীলতার একটা গূঢ় সম্পর্ক আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ছন্দোবিলাস রবীন্দ্রনাথের মজ্জাগত, ছন্দোময় সত্তার তরঙ্গিত স্পন্দন তাঁহার মৌলিক উপলব্ধির সহিত একীভূত। এই জন্যই তাঁহার সাধনার ইতিহাসেও আমরা দেখিতে পাই যে কোন একটা ভাব-কেই তিনি একান্তভাবে অনুসরণ করেন না, অভিজ্ঞতার তরঙ্গে তরঙ্গে নূতন ভাব আসিয়া তাঁহার সাধনাকে নূতন দিকে সঞ্চালিত করে। কোন কোন স্রোতস্বিনী যেমন কখনই ঋজু সরল গতিতে অগ্রসর হয় না, বারংবার করিয়া দিক্ পরিবর্ত্তন করে, যে কোন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বাধার সম্মুখীন হইলেই অবিলম্বে পাশ কাটাইয়া অন্য এক দিকে প্রবাহিত হয়, শিলাখণ্ডে ধারাস্রোত প্রতিহত হইলে নটীর ন্যায় কিঙ্কিনীর ধ্বনি সহকারে নৃত্যচ্ছন্দে আঁকা বাঁকা পথ কাটিয়া অগ্রসর হয়, রবীন্দ্রমানসও ঠিক সেই ভাবে বারে বারে অধ্যাত্মজীবনের নব নব বাধা ও সমস্যাকে পাশে রাখিয়া নব ভাবের পথে অগ্রসর হইয়াছে। জীবনস্রোতের ছন্দতরঙ্গের দোলায় তিনি একটা ভাবের তীরে আসিয়া আশ্রয় পাইলেন বলিয়া যখনই মনে হয়, পর মূহূর্ত্তেই সেই তরঙ্গের পশ্চাৎ প্রবাহ তাঁহাকে অন্য এক তীরে লইয়া যায়।

ইহা ছাড়া আরও একটা কারণ বোধ হয় আছে। রবীন্দ্রকাব্যে অনেক সময় সাংসারিক জীবনের আদর্শ হিসাব কর্ম্মসাধনার প্রশংসা থাকিলেও তাহার সহিত রবীন্দ্রকাব্যের মূল সুরের ঠিক সঙ্গতি নাই। জ্ঞানে বা কর্ম্মে নহে, রসানুভূতিতেই রবীন্দ্রনাথ মানব আত্মার সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছেন। মাঝে মাঝে বাস্তবের তীব্র অনুভূতির আবেগে তিনি "এবার ফিরাও মোরে" বলিয়া কর্ম্মবহুল জীবন যাপনের জন্য অধীর হইয়া থাকিলেও, এই অধীরতা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই; বরং ইহাকে তিনি "পরো ধর্ম্মঃ" বলিয়াই অনুভব করিয়াছেন ও অস্বস্তি বোধ করিয়াছেন। তাঁহার অন্তরদেবতা ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহাকে তিরস্কারই করিয়াছেন; "সুর ভুলে যেই ঘুরতে গেলাম কেবল কাজে, লাগল মুখে তোমার চোখের ভর্ৎসনা যে"—ইহাই তাঁহার অভিজ্ঞতা। এই জন্য বারেবারেই তিনি সংসারের সংগ্রাম ও জটিল কর্ম্মজালের বন্ধন এড়াইয়া নিজস্ব রসসাধনায় নিবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি অলস জীবন যাপন করেন নাই, কিন্তু তাঁহার নানা কাজ এক রকম "খেলা" অর্থাৎ রসোপলব্ধির উপায়-ই ছিল। তিনি খেলার ছলে কাজ করেন নাই, কাজের ছলে খেলা করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র তাঁহার ধর্ম্মক্ষেত্র ছিল না, সেখানে "সমাগতাঃ যুযুৎসবঃ"-র সঙ্গে জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হওয়াকে তিনি ধর্ম্ম বিবেচনা করেন নাই। তিনি বিবেকানন্দ-ও ছিলেন না, কিম্বা Robert Browning-ও ছিলেন না। 'I was ever a fighter" এরূপ কোন আত্মোপলব্ধি তাঁহার ছিল না। এই জন্য 'কথা ও কাহিনী'র বীরত্ব ও মহত্ত্বের আখ্যানে তাঁহার কবিচিত্ত চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে নাই।

যাহাই হউক, 'কল্পনা' ও 'কাহিনী'র পর রবীন্দ্রকাব্যে সহসা একটা নূতন সুরের পরিচয় পাওয়া যায়। এক দিক্ দিয়া অবশ্য এই

সময়কার ভাব পূর্ব্বতন পর্ব্বেরই অনুবৃত্তি—এ কথা বলা যায়, কারণ বাস্তব সত্যকে স্বীকার করার প্রবৃত্তিই এই সময়ে আরও প্রবল হইয়াছে। কিন্তু যাহাকে পূর্ব্বে ভীষণ ও রহস্যময় বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাহাকে এখন কবি অন্য চক্ষে দেখিতেছেন। কবির নিপীড়িত আত্মা এখন বাস্তবের মধ্যেই আনন্দোচ্ছল মুক্তির সন্ধান পাইয়াছে। "সত্যরে লও সহজে" ইহাই এখন তাঁহার বাণী, এবং এই বাণীই এখন তাঁহাকে দিতেছে আনন্দ, মুক্তি ও সার্থক জীবনের সন্ধান।

অষ্টম পৰ্ব্ব (ভাব)

[ক্ষণিকা]

(১৯০০)

“শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গা রে আজি প্রাণ, ক্ষণিক দিনের আলোকে।”

এই তৃতীয় যুগের প্রথম পর্ব্বের রচনা ‘ক্ষণিকা’, এবং এই কাব্যেই একটা বিস্ময়কর নূতন ভাবের প্রথম প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। জীবনসত্যের একটা নূতন তত্ত্বের সন্ধান এখন পাইয়াছেন বলিয়া কবির মনে হয়। ইহা এক প্রকারের **অভিনব ক্ষণবাদ।** ইহাতে জীবনের সত্যের সহিত হৃদয়ের ঈপ্সার সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। জীবন্মুক্তির ও আনন্দ-সাধনার একটা সহজ পন্থা ইহাতে পাওয়া যায়। ‘ক্ষণিকা’ কাব্যের সূচনায় ‘উদ্বোধন’ কবিতাটিতেই ইহার সারমর্ম্ম ব্যক্ত হইয়াছে। কবি এখন বলিতেছেন যে জগৎ-প্রবাহের বিরুদ্ধে আত্মার অনর্থক ও ব্যর্থ বিদ্রোহ-ই দুঃখের আসল কারণ। জগতের সহিত আত্মার এই চিরন্তন দ্বন্দ্বের মূলে রহিয়াছে একটা স্থূল আসক্তি, যাহার জন্য আমরা অতীতকে বা অতীয়মানকে আঁকড়াইয়া থাকিতে চাই, এবং ভবিষ্যৎকে বা বর্ত্তমানের নব রূপায়নকে ভয় করি। এই আসক্তি ও ভয়কে কাটাইয়া যখন আমরা পরিবর্ত্তমান ক্ষণকে আশ্রয় করিয়াই সংসার-স্রোতে ভাসিতে পারিব, তখনই দ্বন্দ্ব ও দুঃখের অবসান হইবে। তখন Faust-এর মতনই আমরা এই “passing moment” (পরিবর্ত্তমান ক্ষণ)-কে “too beautiful” (অতি সুন্দর) বলিয়া জানিতে পারিব ও স্থূল বস্তুবিশেষের মোহ হইতে,

আমরা মুক্তি লাভ করিব। প্রত্যেক বস্তুই বুদ্বুদের ন্যায় "ফুটে আর টুটে পলকে", তত্রাচ সব কয়টির পারম্পর্য্যে যে একটা উজ্জ্বল প্রবাহের সৃষ্টি হয় তাহা আমাদের অনাসক্ত হৃদয়ে অনন্ত আনন্দের সঞ্চার করিতে পারে। "ছুয়ে থেকে তুলে শিশির যেমন শিরীষ ফুলের অলকে" সেইভাবে "ধরণীর পরে শিথিল-বাঁধন" হইয়া "প্রাণ যাপন" করাতেই মুক্তি ও আনন্দ করতল-গত হয়। এই আনন্দ একটা 'অকারণ পুলক', বস্তু ও অবস্থা-নিরপেক্ষ, হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত লীলার রস হইতেই ইহা প্রাণশক্তি শিশুর মত আহরণ করে। এই আনন্দের সন্ধান পাইলে কল্পনার স্বপ্নলোকের সন্ধানে আমাদের ঘুরিয়া ঘুরিয়া অতৃপ্ত বা ব্যর্থ হইতে হইবে না; বাস্তব জগতের অপূর্ণতা ও ভঙ্গুরতা আমাদের পীড়িত করিবে না। 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'র স্বপ্ন এবং 'মানসী'র ক্রন্দন—উভয় হইতেই আমরা উদ্ধার পাইব। 'কল্পনা'য় যে রহস্যময় বিরাট্ বাস্তব ও কঠোর কর্ম্মসাধনার আভাস আছে, তাহাও এখন কবির চক্ষে সত্য বা সার্থক মনে হইতেছে না। Epicurean-দের মত কবিও এখন মনে করেন যে "নদীজলে পড়া আলোর মতন" ঝলকে ঝলকে ছুটিয়া চলাই একমাত্র করণীয়, কারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্ত্ত ও তখনকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপলব্ধি লইয়াই জীবন, ইহা ছাড়া বিরাট্ বা সনাতন কিছুর ধারণা একটা মিথ্যা কল্পনা মাত্র। তথাকথিত কর্ম্মসাধনা একটা নেশার মত আমাদের মনে সাময়িক একটা উৎসাহ আনিতে পারে, কিন্তু এই সাধনার ফলে কোন সিদ্ধি লাভ হয় না। আধ্যাত্মিক অশান্তিতেই ইহার উদ্ভব এবং তাহাতেই ইহার পরিণতি; কোন শান্তি, তৃপ্তি বা অপবর্গ ইহাতে পাওয়া যায় না; বস্তুজগৎ যাহা ছিল তাহাই থাকিয়া যায়, তাহার চঞ্চল প্রবাহ রোধ বা নিয়ন্ত্রণ করা অসাধ্য। সুতরাং কবি বলেন,

হাল ছেড়ে আজ বসে আছি আমি, ছুটিনে কাহারো পিছুতে,
মন নাহি মোর কিছুতেই, নাহি কিছুতে।

সাংসারিক রীতি, নীতি, আদর্শবাদ ইত্যাদির প্রতি এই উদাসীনতার প্রশস্ত প্রাঙ্গনে আসিয়া কবি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তাঁহার মন প্রাণ স্বাধীনভাবে খেলা করিবার ও আনন্দ আহরণ করিবার সুযোগ পাইল।

এতদিন পরে ছুটি, আজ ছুটি, মন ফেলে তাই ছুটেছি।
তাড়াতাড়ি করে খেলাঘরে এসে জুটেছি।

সংসারকে একটা খেলাঘর বলিয়া গ্রহণ করা ও খেলা খেলা করিয়াই জীবন যাপন করা—ইহাই হইল 'ক্ষণিকা'র অভিনব ধর্ম্ম। সুতরাং এইখানে আসিয়া কবির সাধনা এক **নূতন ধরণের সহজিয়া বাদে** পরিণত হইল। এই সহজিয়া বাদ-ই এক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট রুচি ও প্রকৃতির পরিচায়ক। এই সহজিয়া বাদের একটা সূত্র হইতেছে জীবনের তথাকথিত কর্ত্তব্য, উচ্চাশা ইত্যাদিকে একেবারে পরিহার করা। সাংসারিক মূল্য বা মানের ইহা একেবারেই কোন খেয়াল রাখে না; সুতরাং ভোগ, বিলাস, ঐশ্বর্য্য ইহার কাছে যেমন নিরর্থক, তেমন জ্ঞান, কর্ম্ম, এমন কি প্রেম-ও ইহার কাছে নিরর্থক, যদি তাহা একটা জটিল ও ব্যাপক প্রয়াস বা সাধনার মূর্ত্তি গ্রহণ করে। "কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখে"র ক্ষণিক দৃষ্টিতেই ইহা পরিতৃপ্ত, "মন নেওয়া দেওয়া"র সাধনায় ইহার রুচি নাই। মুহূর্ত্তের আনন্দই ইহার কাছে যথেষ্ট, এবং মুহূর্ত্ত অতীত হইলে তাহার জন্য কোন লোভ বা শোক ইহা পোষণ করে না। এই আনন্দের উৎস খুঁজিয়া পাওয়া যায় মানবহৃদয়ের মৌলিক বৃত্তির সরল ও সহজ অনুশীলন ও প্রকাশের মধ্যে। ঐহিক ও পারত্রিক কোন লাভ,

শাস্ত্রের "শ্রেয়ঃ" বা "প্রেয়ঃ"—কিছুই ইহার অভীপ্সিত নহে; একটু অভিনব অর্থে, ইহা "আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ"। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মগ্ন হইয়া ভাবনা-কামনাহীন জীবন যাপন করা, হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে অসম্ভবের অনুসরণ করা, "সোজাসুজি" প্রণয়ের চর্চ্চা করা এবং "ভালো মন্দ যাহাই আসুক" তাহার জন্য ভ্রূক্ষেপ না করিয়া হৃদয়ের অনিরুদ্ধ প্রকাশের উল্লাসেই ময়ূরের মত নৃত্য করা-ই ইহার ধর্ম্ম। কালিদাসের কাব্যে যে সহজ রসোচ্ছল নাগরিক জীবনের চিত্র আছে, তাহার জন্যই ইহা কবির কাছে মধুর মনে হইতেছে; অগ্নিমিত্র, দুষ্মন্ত, বিক্রম বা যক্ষের জীবনের আবেগচঞ্চল অ-নৈতিক দিক্‌টাই তাঁহার কাছে উপাদেয়, রঘুবংশের রাজর্ষিবৃন্দের পুরুষানুক্রমিক আদর্শনিষ্ঠা ও সাধনা তাঁহার কাছে নিরর্থক।

এই উচ্ছ্বসিত আবেগময় সংসারবিমুখ মুক্ত জীবনের হিল্লোল স্বভাবতঃই প্রকাশ পাইয়াছে এক প্রকারের অনন্যসাধারণ ভাষা ও অভিনব ছন্দের মাধ্যমে। বক্তব্য গুরুতর হইলেও আপাতচপল ভঙ্গীতে, লঘুগতি কথ্য ভাষায় এবং চটুল ছড়ার ছন্দেই তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। সহজ ধর্ম্মের ভাষা ও ভঙ্গী সহজ হওয়াই উচিত; সুতরাং "গভীর সুরে গভীর কথা শুনিয়ে দিতে" কবির কোন ইচ্ছা নাই, এমন কি "মনের কথা" সুগম্ভীর হইলেও তাহাকে "ঠাট্টা করে" উড়াইয়া দিতেই কবির প্রবৃত্তি। "চপলতা আজ যদি কিছু ঘটে করিয়ো ক্ষমা"।

যাহা হউক কবি এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করায় তাঁহার কাছে আনন্দ ও মুক্তি যে সবল ও সহজ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। যে কোন অবস্থাতেই তিনি পুলকের সন্ধান পান। ফলে এই লাভ দাঁড়াইয়াছে যে 'সোনার তরী' পর্ব্বের কল্পনা যে অলীক ও ব্যর্থ তাহা

হৃদয়ঙ্গম হইলেও এখন আর 'কল্পনা' পর্ব্বের বিষাদ ও অস্বস্তি নাই ; অভাব বোধের যুগ কাটিয়া গিয়া নূতন ভাবের উপলব্ধি আসিয়াছে, "অনেক দিকেই যায় যে পাওয়া অনেকটা সান্ত্বনা"। এই সান্ত্বনার মূলে আছে—সত্যকে সহজ ভাবে দেখিবার ও গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা ; যতদিন কবি "বকুলশয়নে নিলীন" ও "মধুকরসম সঞ্চয়-প্রয়াসী" ছিলেন, ততদিন এই সান্ত্বনা তাঁহার পক্ষে পাওয়া সম্ভব হয় নাই। এখন তিনি "সবলে কারেও বাসনা মুঠিতে" ধরিতে চাহেন না বলিয়াই "ত্রিভুবন ফিরিছে তাঁহারি পিছুতে"।

* * *

কিন্তু এই বাহ্য লীলাচাপল্যের অন্তরালে তাঁহার গভীরতর সত্তার ক্রিয়া অব্যাহত ছিল। সর্ব্বঋতু সর্বকালে যাঁহার সিংহাসন, যিনি অন্তরতম, তাঁহার জন্যই কবির প্রাণের ও গানের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদিত হইতেছিল, নানা ছলে কবি তাঁহাকেই ডাকিতেছিলেন।

যে দেবতারে গড়েছিলেম
দ্বারে যাঁদের পড়েছিলেম

তাঁহাদের মধ্যে "কে বা আছেন এবং কে নেই, কেই বা বাকি কেই বা ফাঁকি" এই সব জল্পনা আপাততঃ তিনি নিরর্থক মনে করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যখন পথচলার 'সমাপ্তি' ঘটিল তখন দেখিলেন

তোমার নীরব নিভৃত ভবনে
জানি না কখন পশিনু কেমনে।

পরিশেষে এক নূতন উপলব্ধি কবির অন্তঃকরণে ফুটিয়া উঠিল। "ক্ষণিকা মূরতি" তিরোহিত হইল, তাহার "চপল দরশন" মিলাইয়া গেল, ত্রিভুবন জুড়িয়া এক মহীয়সী শক্তি নীল গুণ্ঠনের আবরণে

থাকিয়া উত্তাল তুমুল ছন্দে আত্মপ্রকাশ করিলেন, তাহার আবির্ভাবে কবি চমকিত হইলেও তাহাকে তিনি সহজে গ্রহণ করিতে ও বুঝিতে পারিতেছেন, ক্ষণিকের পাতার কুটীরেই তাহাকে আহ্বান করিতেছেন। জলভরা বরষায় তাঁহার পরাণ ভরিয়া সেই আবির্ভাবের গান বাজিতেছে, তাঁহার হৃদয় শ্যাম-সমারোহে ভরিয়া গিয়াছে।

এ কাহার আবির্ভাব? এ কি জীবনদেবতার? তাহা নয়। জীবনদেবতা এবার বিশ্বদেবতার সহিত মিশিয়া গিয়াছেন। এখন যিনি আবির্ভূত হইলেন, তিনি প্রেয়সী বা প্রেমিক নহেন; তাহার স্তব-গান আপনিই ধ্বনিত হয়, "বাসর ঘরের দুয়ারে" তিনি "পূজা"র অর্ঘ্য বিরচন" করান, তাঁহাকে আমরা দিতে পারি শুধু আমাদের ঐকান্তিক আত্মনিবেদনের নৈবেদ্য। এই ভাবে 'ক্ষণিকা'র সহজ ধর্ম্ম নূতন এক ভাবে অনুপ্রাণিত হইল, তাহার প্রকাশ হইয়াছে পরবর্ত্তী কাব্য 'নৈবেদ্যে'। *

* 'ক্ষণিকা'র আপাতলঘু উল্লাস ও ক্ষণবাদ মূলতঃ অলৌকিক ভাবপরায়ণতা ও লৌকিক বাস্তবপরায়ণতা উভয়কেই অতিক্রম করিয়া আত্মার আশ্রয় সন্ধানের প্রয়াস হইতে উদ্ভূত। এই প্রয়াসের পরিণতি হয় অনেক পরে খেয়া-গীতাঞ্জলির যুগে।

নবম পর্ব্ব (মহাভাব)

'নৈবেদ্য'

(১৯০১)

(বয়স-৪০)

"যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।"

'ক্ষণিকা' পর্ব্বের শেষের দিকে যে একটা অনুভূতির আভাস আমরা ইতঃপূর্ব্বে লক্ষ্য করিয়াছি, তাহারই পরিণত ও পূর্ণতর প্রকাশ হইয়াছে 'নৈবেদ্যে'। 'নৈবেদ্য' মহাভাবের কাব্য ; ইহার মধ্যে একটা প্রগাঢ়, স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত, গৌরবোজ্জ্বল উপলব্ধি বিকশিত হইয়াছে, কবির আত্মা সাময়িক ভাবে একটা স্বর্গলোক রচনা করিয়াছে। 'নৈবেদ্য' রচনার সময় কবি যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের সীমারেখায় উপনীত। জীবনের যে ঋতুতে 'শত বরণের ভাব-উচ্ছ্বাস' প্রাণে বিকশিত হয় এবং যে ঋতুতে মেঘমুক্ত সকালে 'ভরা জলে···সুখে' ভাসিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়, সেই সব ঋতুর অবসান হইয়াছে। 'আজি হেমন্তের শান্তি ব্যাপ্ত চরাচরে'। এই শান্ত শুদ্ধতার মধ্যে কবি আত্মস্থ হইলেন। 'যুগযুগান্তের বিরাট্ স্পন্দন' ও নিজের 'প্রাণতরঙ্গমালা' উভয়ের মধ্যে ঐক্য প্রত্যক্ষ করিয়া কর্ম্মযোগের নির্দ্দেশ পাইলেন। 'ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন—কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন' ইহাই এখন তাঁহার প্রার্থনা। ইহার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠায়, 'বঙ্গদর্শন' পরিচালনায়, শান্তিনিকেতনে নিবাস স্থাপনায়।

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে 'ক্ষণিকা'র সহিত 'নৈবেদ্যে'র কোন

সঙ্গতি নাই, 'নৈবেদ্য' 'কল্পনা'রই অনুবৃত্তি, 'ক্ষণিকা' এই উভয় কাব্যের মধ্যে একটা আকস্মিক উজ্জ্বল ব্যবধান অনাবশ্যক ভাবেই রচনা করিয়া রাখিয়াছে, 'ক্ষণিকা' একটা প্রক্ষিপ্ত উচ্ছ্বাস-চাপল্য মাত্র। কিন্তু ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে বাস্তবিক পক্ষে 'ক্ষণিকা' ও 'নৈবেদ্যে'র মধ্যে একটা গূঢ়তর সম্বন্ধ আছে। উভয় কাব্যেই একটা সহজ ধর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে, এবং সাংসারিক লাভালাভের মানদণ্ডে বিচার না করিয়া কেবলমাত্র মানবহৃদয়ের আনন্দানুভূতির মানদণ্ডেই সমস্ত অভিজ্ঞতার বিচার করা হইয়াছে; উভয় কাব্যেই বাস্তব সত্য তথা ভাল ও মন্দকে সমভাবেই আনন্দানুভূতির উপাদান হিসাবে গ্রহণ করার কথা বলা হইয়াছে; উভয় কাব্যেই একটা প্রত্যয়বান্, স্বপ্রতিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, নির্ভীক মনোবৃত্তি প্রকট হইয়াছে। পার্থক্য এই যে, 'ক্ষণিকা'র আনন্দ জীবনের পলাতক ক্ষণগুলি হইতে মাধুকরী বৃত্তিতে আহৃত; 'নৈবেদ্যে'র আনন্দ জীবনব্যাপী সামগ্রিক অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। 'ক্ষণিকা' নিরীশ্বর, 'নৈবেদ্য' ঈশ্বরবাদী। 'ক্ষণিকা' চটুলভাষী, চপলমতি, লঘুগতি; 'নৈবেদ্য' "অমত্ত, গম্ভীর", সমাহিত, কর্ম্মযোগী। তবে একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে 'ক্ষণিকা'য় যে উপলব্ধি বিক্ষিপ্ত ও খণ্ড খণ্ড ছিল, তাহাই গ্রথিত ও ঘনীভূত হইয়া 'নৈবেদ্যে' প্রকাশ পাইয়াছে, এবং মানবজীবন সম্পর্কে যাহা একটা দৃষ্টিভঙ্গী মাত্র ছিল তাহা এখন একটা জীবনদর্শনে পরিণত হইয়াছে, যাহা বিদ্রোহ ছিল তাহাই এখন স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া আদর্শনিষ্ঠায় পরিণত হইয়াছে।

'নৈবেদ্যে'র মধ্যে মূল উপলব্ধি দুইটি। প্রথমটি 'ক্ষণিকা'র মধ্যেও পাওয়া যায়, ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে সুপরিচিত এই কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে :—

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

এই উপলব্ধি যাহার আছে তাহার কাছে প্রেম ও ভক্তি, মোহ ও মুক্তি একই হইয়া দাঁড়ায়। ইহা নব সহজিয়া বাদ বা সহজ ধর্ম্মেরই সূত্র।

দ্বিতীয় যে উপলব্ধিটি 'নৈবেদ্য' কাব্যকে একটা বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে, তাহা হইতেছে ইহার **ঈশ্বরবাদ**। ইহার পূর্ব্বে রবীন্দ্রকাব্যে জীবনদেবতার কথা বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু জীবনদেবতা Patron Saint, Guardian Angel, Daemon, the Heavenly Bride-groom ইত্যাদির স্বগোত্রীয়, তিনি ঈশ্বর বা God নহেন। 'ক্ষণিকা' কাব্যের পরিশেষে 'আবির্ভাব' কবিতায় যে উপলব্ধির আভাস পাওয়া যায়, তাহারই পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে 'নৈবেদ্যে'র ঈশ্বরানুভূতিতে। এই বিকাশের সূত্র আমরা দেখিতে পাই 'প্রাণ' কবিতাটিতে। যে অনন্ত প্রাণ বিশ্বের সমস্ত বস্তুতে সঞ্চারিত, তাহাই কবির নাড়ীতে নাড়ীতে স্পন্দিত হইতেছে। 'স্তব্ধতা' কবিতাটিতে কবি বলিতেছেন যে "এই অনুপরমাণুদের নৃত্যকলরোল" ঈশ্বরেরই "আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল।" 'দেহলীলা'য় বলিতেছেন যে "প্রত্যেক প্রাণীর মাঝে প্রকাণ্ড জগৎ" রহিয়াছে এবং, যতই ক্ষুদ্র হউক, প্রত্যেকের হৃদয়াসনই ঈশ্বরের মিলনশয্যা। কবির জীবনের অধিদেবতা এখন বিশ্বদেব, বা দর্শনশাস্ত্রের God বা ঈশ্বর। তিনি একাধারে প্রেম, শান্তি ও সৌন্দর্য্যের আধার, এবং বিরাট্ নির্গুণ সত্তা, একাধারে তিনিই আকাশ ও নীড়। একদিকে তিনি রুদ্র, তিনি ন্যায়ের বিধাতা, তিনি পিতার ন্যায় লালন ও শাসন উভয়ই করিয়া থাকেন। অপর দিকে তিনি-ই "অন্তরযামী", "জীবনস্বামী", "জীবননাথ"। তিনি হৃদয়ে হৃদয়ে

প্রবেশ করিয়া তাহাকে পবিত্র করেন। তাঁহার স্পর্শ কখনও রুক্ষ, কখনও কোমল। তাঁহার প্রভাবের মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ—ইহা অপেক্ষা চরম পুরুষার্থ বা অপবর্গ কিছু হইতে পারে না। বিশ্বের সমস্ত কাজে, মানবসমাজের উত্থান পতন ও নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে তাঁহারই অমোঘ শক্তি ও ইচ্ছার প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক মানুষের প্রতি তাঁহার আদেশ ও আহ্বান রহিয়াছে; সে আহ্বান কর্ম্মের জন্য, ন্যায়ের ও সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য, ব্যক্তির ও সমাজের জীবনে ঈশ্বরানুভূতির মুক্তানন্দ ফুটাইয়া তুলিবার জন্য। সেই আহ্বানে সাড়া দেওয়াই মানবের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগের সাধনার পথ একই। তাই কবির এখন প্রার্থনা—

ভকতিরে বীর্য্য দেহো
কর্ম্মে যাহে হয় সে সফল, প্রীতি স্নেহ
পুণ্যে উঠে ফুটি।

এই ভাবে 'নৈবেদ্য' কাব্যে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে একটা সুমহৎ প্রত্যয় প্রকাশ লাভ করিয়াছে, তাহাকে ভিক্টোরীয় যুগের ঈশ্বর-ধারণার শেষ কথা বলা যাইতে পারে। বাইবেলে God সম্বন্ধে যে ধারণা আছে তাহার সহিত কতক পরিমাণে ভারতীয় দর্শনের ঈশ্বরতত্ত্বের সংমিশ্রণ ইহাতে ঘটিয়াছে, এ কথা মনে হইতে পারে। এখানে ঈশ্বরকে জগতের ও মানবহৃদয়ের নৈতিক শক্তির সহিত একীভূত বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে। **Martineau** প্রভৃতি দার্শনিকের, বিশেষতঃ ভারতীয় ব্রাহ্ম সমাজের, প্রভাব এখানে প্রবল, এইরূপ সিদ্ধান্ত বোধ হয় অসঙ্গত নয়। কিন্তু ইহার চেয়েও বড় কথা এই যে এখানে রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের বহুবর্ষব্যাপী একটা সাধনারই পরিণতি ঘটিয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যে সমস্ত উপলব্ধি তাঁহার

হইয়াছিল তাহার প্রায় সমস্তই এখানে একটা সামগ্রিক অধ্যাত্ম উপলব্ধির মধ্যে স্থান পাইয়াছে। সেই উপলব্ধিতে তাঁহার প্রাণের আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা যেমন সত্য, ঈশ্বরের শাসন ও স্নেহ-ও তেমনই সত্য। এই জীবনদর্শন কবিরই অধ্যাত্ম দৃষ্টির ক্রমশঃ সম্প্রসারণের ফল। 'প্রভাত-সঙ্গীত' হইতে 'ক্ষণিকা' পর্য্যন্ত রচনার সময়ে তাঁহার কাব্যে যে সমস্ত মৌলিক অনুভূতি ও প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, সে সমস্তই এখন সমন্বিত হইয়া এক সামগ্রিক সুমহৎ উপলব্ধির অঙ্গীভূত হইয়াছে। এই সমন্বয়ের সূত্র হইতেছে প্রেম-ময় মঙ্গলময় সর্ব্বনিয়ন্তার জীবন্ত স্পর্শ সম্পর্কে একটা প্রত্যক্ষ অনুভূতি।

যে মহান্ আদর্শ এই সময়ে কবির চিত্তে প্রতিভাত হইয়াছে তাহার শ্রেষ্ঠ বিকাশ কবি দেখিতেছেন প্রাচীন ভারতের জীবন ও ধর্ম্মে। অবশ্য এই প্রাচীন ভারত ঐতিহাসিক বিচারে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া প্রমাণিত না হইতে পারে। কিন্তু প্রাচীন ভারতের মহাকাব্য, দর্শন, উপনিষদ্ হইতে যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে কবি মনে করেন যে অন্ততঃ এই আদর্শ সে সময়ে একটা জীবন্ত ভাব বা Idea রূপে বর্ত্তমান ছিল, এবং ইহাকে বাস্তবে রূপায়িত করার একটা প্রয়াস তখনকার জীবনের প্রধান নীতি ছিল। সেই আদর্শকেই কবি আধুনিক জীবনে ও সমাজে, বিশেষ করিয়া বর্ত্তমান ভারতে, প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহেন। জীবনে এই আদর্শের প্রতিষ্ঠা হইলে বিরোধী বৃত্তিনিচয়ের সঙ্গতি হয়; সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা ও ভীরুতার অবসান হয়; মানবত্বের স্বধর্ম্মে স্থিতি হয়।

'ক্ষণিকা'য় মুক্তানন্দের যে সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল, তাহা অনেক পরিমাণে নেতিবাচক। সাংসারিকতাকে অস্বীকার করিয়া মানবহৃদয়ের সহজ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করার কথাই সেখানে বলা হইয়াছে।

'ক্ষণিকা'য় সমাজ বা বৃহত্তর জীবনের কোন কথা নাই, জীবনের নানা উপাদানের সামঞ্জস্যের কোন কথা নাই, মুহূর্ত্তের আনন্দস্পন্দন ছাড়া দেশ-কালজয়ী কোন দৃষ্টি ও উপলব্ধির কথা নাই। 'ক্ষণিকা'য় মুক্তি ব্যক্তিগত হৃদয়ের, 'নৈবেদ্যে'র মুক্তি সমগ্র জীবনের, জাতির ও সমাজের। 'নৈবেদ্যে' এই জীবন্মুক্তির বিরাট্ ধারণা এবং তজ্জন্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সাধনার পরিকল্পনার মূলে আছে ইহার ঈশ্বরানুভূতি। রবীন্দ্রকাব্য এখন হইতে পূরাপূরি আস্তিক্যবাদী।

দশম পর্ব্ব (ভাবাভাব)

‘উৎসর্গ, স্মরণ, শিশু’

(১৯০২—১৯০৪)

“সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি—
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার, সে কথা যে যাই পাসরি ॥”

‘নৈবেদ্যে’র মধ্যে আমরা যে আধ্যাত্মিক শান্তি ও উদ্ভাসনের (illumination) পরিচয় পাই, তাহাতেও রবীন্দ্রকাব্যের শেষ কথা ব্যক্ত হয় নাই। মানব-সভ্যতার তথা বিধাতার সৃষ্টির ইতিহাস যেমন একটা চিরন্তন প্রগতির ইতিহাস, কোন খানেই যেমন তাহার দাঁড়ি টানা যায় না, রবীন্দ্রমানসের ও রবীন্দ্রকাব্যের ক্রমিক বিবর্ত্তনের ধারা অনুসরণ করিতে গেলেও আমরা দেখিতে পাই যে কোন একটা বিশেষ আদর্শের উপলব্ধিতেই তাহার শেষ হয় নাই, তাহার স্রোত এক কুণ্ড হইতে অপর কুণ্ডে, এক তীর্থ হইতে অপর তীর্থে পথ কাটিয়া চির-দিনই প্রবাহিত হইয়াছে। “সেথা এসে তার স্রোত নাহি আর, কল-কল ভাষ নীরব তাহার”—এমন কোন গঙ্গা-সাগরই রবীন্দ্রকাব্যে নাই, ইহাই রবীন্দ্রকাব্যের একটা মুখ্য লক্ষণ। ইহা তাহার গৌরবের না তাহার দুর্ব্বলতার পরিচায়ক, সে বিষয়ে কোন তর্ক এখানে অনাবশ্যক।

‘নৈবেদ্য’ রচনার পরেই দেখি যে কবির জীবনে নানা দিক্ হইতে অপ্রত্যাশিত আঘাত আসিতে থাকে। মহাজনারণ্য মাঝে যে উদার স্তব্ধতা কবি ‘নৈবেদ্যে’ লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহার শান্ত বেলাভূমি এখন অশ্রুসাগরের জোয়ারে প্লাবিত হইল। পত্নী ও কন্যার বিয়োগ ঘটিল, আশ্রমের পরিচালনায় বহু গুরুতর সমস্যা দেখা দিল, “সাথী যা ছিল

গেল ছাড়ি” ; দেশের বৃহত্তর জীবনে বঙ্গভঙ্গ পর্ব্বের সূচনা হইল, আস্থা ও আদর্শের ভিত্তিভূমি কবির পায়ের তলা হইতে সরিয়া যাইবার উপক্রম হইল। কবির আধ্যাত্মিক জীবনেও এইবার আর একটা পরিবর্ত্তন আসিল, তাহার প্রভাবে রবীন্দ্রকাব্যেও পরিবর্ত্তন ঘটিল। এই সময়ে রবীন্দ্রকাব্যে আবার ভাবাভাবের লক্ষণ দেখা দিল, পুনশ্চ একটা অজানা কিছুর অতি আকর্ষণ প্রবল হইয়া তাঁহার কাব্যজীবনে একটা আন্দোলন আনিল। * 'ক্ষণিকা' ও 'নৈবেদ্যে' দেখি যে একটা অস্তি-বাচক প্রত্যয়, “জানিয়াছি” বা “পাইয়াছি” এই জাতীয় একটা ভাবই প্রবল ; “ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তদ্বয়ং” (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৬।৪।১৪) এই সূত্রই যেন ঐ দুই কাব্যে মূর্ত্ত হইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী পর্ব্বে অন্য একপ্রকার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, সেই মনোভাব “নাহং মন্যে সুবেদেতি, নো ন বেদেতি বেদ চ” (কেনোপ-নিষৎ ২।২) এই সুপ্রসিদ্ধ সূত্রে যে ভাবটি রহিয়াছে তাহারই সমজাতীয়।

'উৎসর্গে'র অনেকগুলি কবিতায় এই মনোভাবটি ব্যক্ত হইয়াছে। 'নৈবেদ্যে' কবি “এই বসুধার মৃত্তিকার পাত্র খানি” বারংবার ভরিয়াই অবিরত ভাগবত অমৃত পান করিতে পারিবেন বলিয়া ভরসা করিয়া-ছিলেন, “প্রদীপের মতো সমস্ত সংসার⋯লক্ষ বর্ত্তিকায়” ঈশ্বরের শিখায় ঈশ্বরের মন্দির-মাঝে আলো জ্বালাইয়া তুলিবে, এই কথা জোর করিয়া বলিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী পর্ব্বে দেখি যে বাস্তবের অভিজ্ঞতা পুনশ্চ তাঁহার কাছে অসম্পূর্ণ মনে হইতেছে, ইহার মধ্যে তাঁহার বাঞ্ছিত ও চির-উপাস্যের সম্যক্ পরিচয় নাই। কিছু পরিমাণে

* এই সময়ে কবিচিত্তে যে “ফেনতবঙ্গের খেলা” আরম্ভ হয়, তাহাব পরিচয় পাওয়া যায় সমসাময়িক যুগান্তকাবী উপন্যাস 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি'তে।

তিনি সংসারে ব্যক্ত, কিন্তু সবটা নহেন। তাঁহার সহিত মিলন সুতরাং কেবল সংসারের সত্যে হইবে না, হইবে বাস্তবাতীত "নিভৃত স্বপনে"। "মোর কিছু ধন আছে সংসারে,—বাকি সব ধন স্বপনে"।

সমপর্য্যায়ের অন্যান্য কাব্যের সহিত তুলনা করিলে এই নূতন ভাবাভাবের প্রকৃতি আরও বিশদ ভাবে বুঝিতে পারা যাইবে। 'কল্পনা'য় আছে মানবহৃদয়ের ইপ্সিত সৌন্দর্য্যমধুর কল্পনাবিলাসের বিরুদ্ধে বিরাট্ জীবনসত্যের অভিমুখে প্রতিক্রিয়া; এখানে আছে বাস্তবের আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে অতিকল্পনার বিপক্ষে প্রতিক্রিয়া; 'নৈবেদ্যে'র কবি Pantheist, 'উৎসর্গে'র কবি Panentheist ও Transcendentalist. আবার, 'মানসী'র সহিত যদি 'উৎসর্গে'র তুলনা করা যায়, তবে এক হিসাবে একটা সাদৃশ্য পাওয়া যাইবে, কারণ 'মানসী'তেও বাস্তবের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আছে। কিন্তু সেখানে বাস্তবের শুধু স্থূল আবেদনের কথাই আছে, বাস্তবের যে দিকটা 'নৈবেদ্যে' প্রকাশ পাইয়াছে তাহার বিষয় কিছু নাই। 'মানসী'-তে প্রতিক্রিয়ার প্রেরণা আসিয়াছে "মর্ম্মের কামনা" হইতে, সে কামনা এক প্রকারের মানবসুলভ রোমান্টিক আকাঙ্ক্ষা মাত্র, তাহা 'উৎসর্গে'র উন্মনা ব্যাকুলতা নহে। 'মানসী'র কামনা পরে 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'র স্বপ্নসাধনায় আশ্রয় লাভ করিয়াছে, 'উৎসর্গে'র ব্যাকুলতা 'খেয়া'র গূঢ়াত্মবাদে পরিণত হইয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে 'উৎসর্গ' পর্ব্বের প্রধান কথা এই যে বাস্তবের মধ্যে যে সত্যটুকু ফুটিয়া ওঠে তাহা আংশিক, তাহা পরম সত্যের পূর্ণ প্রকাশ নহে। আসল কথা এই যে সেই সত্যে এখন কবি-হৃদয়ও তৃপ্ত নহে, তাহা বাস্তবাতীত আরও কিছুর সন্ধান করিতেছে। এই যে নূতন ধরণের একটা আত্মবোধ, "তরুণ-গরুড়-সম কী মহৎ

ক্ষুধা"র উদ্রেক—ইহা এই সময়ের কাব্যের দ্বিতীয় লক্ষণ। এই জন্য তিনি "চঞ্চল" ও "সুদূরের পিয়াসী", "কস্তুরী-মৃগসম" পাগল। এই জন্যই তিনি পার্থিব জীবনের অভিজ্ঞতার রুদ্ধ-দুয়ার কক্ষে হাঁপাইয়া উঠিতেছেন। "কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ আপন মনে।" কিন্তু এ ক্রন্দন কিসের জন্য ? ইহা ত "মানসী"র "ক্রন্দন" নয়। এ ক্রন্দন নিজের সীমাবদ্ধতার জন্য। এ আকাঙ্ক্ষা কোন বস্তুর জন্য নহে, কোন সৌন্দর্য্যের জন্য নহে ; আপন সীমাকে অতিক্রম করিয়া অসীমের সহিত মিলিত হইবার জন্যই এই ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা। এইজন্য ধূপ দগ্ধ হইয়া নিজের সীমা অতিক্রমপূর্ব্বক সীমান্তপারের গন্ধে মিলাইতে চায়। "সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা"—এই আকাঙ্ক্ষা 'উৎসর্গ' পর্ব্বের কাব্যে বিশেষ ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

অসীমের জন্য এই আকুলতা কবিহৃদয়ে প্রবল হওয়ার জন্য স্বভাবতঃই এখন কবির পক্ষে মৃত্যু ও মৃত্যুর তাৎপর্য্য সম্বন্ধে কবিতা রচনার একটা প্রবৃত্তি হইয়াছিল। তদুপরি কবির স্ত্রীবিয়োগ হওয়াতে 'স্মরণ' নাম দিয়া যে কাব্যটি প্রায় এই সময়ে তিনি রচনা করেন তাহাতে যে মৃত্যুরহস্য সম্পর্কে অনেকগুলি কবিতা স্থান পাইয়াছে তাহা খুবই স্বাভাবিক হইয়াছে। এই কবিতাগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে মৃত্যু কবির কাছে এক বরণীয় অতিথি বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে, কারণ মৃত্যু আমাদিগকে পৃথিবীর সীমা হইতে উদ্ধার করিয়া গ্রহ-তারকার অসীম পথে তুলিয়া লইয়া যায়, অনন্ত লোকের উপলব্ধি আনিয়া দেয়, মরজীবনের প্রেমকে পরশমণির স্পর্শে অমর করিয়া তুলে এবং তাহাকে সম্পূর্ণ করে। 'উৎসর্গ' কাব্যেও মরণ সম্বন্ধে যে কবিতাটি আছে তাহাতেও কবি বলিতেছেন যে মৃত্যুঞ্জয় শিবের মতই মৃত্যু আমাদিগকে সুখশয়ন ও অবসাদ হইতে আহ্বান করিয়া ব্যাপকতর

জীবনের অকূল সাগরে লইয়া যায়। নিস্তব্ধ গিরিরাজ-ও এখন কবির চক্ষে এই অসীমের সাধনা ও অসীমের মাঝে আত্মসমর্পণের প্রতীক বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। এইরূপে নানাপ্রকারে এই সময়ের কাব্যে অসীম ও "অজানারে কবে করিব আপন" এই ব্যাকুলতা-ই ধ্বনিত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন আরও একটা উপলব্ধির পরিচয় এই সময়ের কাব্যে মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। কেবল যে সীমাই অসীমকে খুঁজিয়া থাকে তাহা নয়, "অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ"। Hegel-এর মত কবিও অনুভব করিতেছেন যে Idea বা the Absolute (নির্গুণ, নিরুপাধি পরম সত্তা) সীমাবদ্ধ object-এর (সগুণ, সোপাধিক প্রপঞ্চ সত্তার) মাধ্যমেই রূপায়িত এবং আমাদের গোচরীভূত হয়। এতদ্ভিন্ন তাহার আত্মপ্রকাশের আর কোন পন্থা নাই। পরম সত্তা যে স্বভাবতঃই এই ভাবে প্রকট হয়, তাহা নহে; এ জন্য তাহার দিক্ হইতে একটা রীতিমত প্রয়াস আছে। এই উপলব্ধি বৈষ্ণবদর্শন-সম্মত; শ্রীরাধিকা বা মানবাত্মার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বা অক্ষরাত্মার একটা ব্যাকুলতা আছে, The Hound of Heaven সর্ব্বদাই আমাদের অনুসরণ করিতেছে। এই জন্য "লীলার ছলে" অসীম আপনাকে প্রকাশ করে। হিমাদ্রির শিলালিপিতেও "নিরাসক্ত নিরাকাঙ্ক্ষ ধ্যানাতীত মহাযোগীশ্বরের" প্রেমের লীলারহস্যের ইঙ্গিত রহিয়াছে। কালস্রোতের "অনন্ত কলরোলের" মধ্যে "অশ্রুত কোন গানের ছন্দে অদ্ভুত দোল" তুলিয়া চিরকাল এই লীলা চলিতেছে।

'শিশু'র যে কবিতাগুলি প্রায় এই সময়ে লিখিত, তাহাদের মধ্যেও এতাদৃশ একটা উপলব্ধি আছে। কবির চক্ষে শিশু মানবক মাত্র নহে, তাহার জীবনেই অসীম সীমার নিবিড় সঙ্গ পাইয়াছে।

জননীহৃদয়ের অসীম আকুতি শিশুকে পাইয়া সার্থক হইয়াছে ; বিশ্বের সকল মাধুর্য্য, বিশ্বাতীত সৌন্দর্য্য শিশুর দেহে মনে জীবনে উছলিয়া উঠিতেছে। এই ভাবে শিশু আমাদের হৃদয়ে অসীমের রহস্যের ও মাধুর্য্যের অনুভূতি আনিয়া দেয়। সে নিজে ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল হইয়াও অসীমের বিভূতিতে পরিপূর্ণ ; সংসার তাহাকে আকৃষ্ট বা বিচলিত করে না ; তাহার শিশু-সুলভ কল্পনাতে বুদ্ধির অগম্য, সংসারাতীত সত্য রূপকথা বা স্বপ্নের আকারে প্রতিভাত হইতেছে, মৃত্যুও তাহার কাছে লুকোচুরি খেলা মাত্র। কবির মনে এই সময়ে যে উপলব্ধির আভাস আসিয়াছিল, তাহাই যেন শিশুর সত্তায় মূর্ত্ত হইয়াছে। শিশুই কবির আদর্শ, সিদ্ধ মানবাত্মার চরম বিকাশ শিশুর জীবনেই কবি লক্ষ্য করিতেছেন।

এইরূপে কবির হৃদয়ে বাস্তবাতিরিক্ত, সাধারণ অভিজ্ঞতার অতীত একটা গূঢ়াত্মার প্রতীতি জাগিয়া উঠিতেছে। কিন্তু মাত্র তাহার সূচনা হইয়াছে, তাহাকে এখনও জীবনসত্যের উপলব্ধির মধ্যে পাওয়া যায় নাই। শিশু কবির আদর্শ বটে, কিন্তু কবি নিজে শিশু নহেন ; শিশুর জীবন ও অনুভূতির মাহাত্ম্য তিনি দূর হইতে অনুধাবন করিতে পারেন, কিন্তু তাহার অন্দরে কবির প্রবেশের অধিকার নাই। এখনও রাজপুরীর বাহিরে দাঁড়াইয়াই তাঁহাকে ভিতর বাড়ীর ঐশ্বর্য্য ও আনন্দের ধারণা করিতে হয়।

চতুর্থ যুগ

['খেয়া'—'শিশু ভোলানাথ']

(১৯০৫—১৯২১)

(বয়স ৪৪—৬০)

"তন্দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি।"
(কঠোপনিষৎ)

রবীন্দ্রকাব্যেব ইতিহাসে আর একটা নূতন যুগের প্রারম্ভ হইল 'খেয়া' রচনার সময় হইতে। অনেক দিক্ দিয়া এই যুগই রবীন্দ্র-কাব্যের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ, রবীন্দ্রনাথের যে সমস্ত কবিতার জন্য তাঁহার জগৎ-জোড়া খ্যাতি তাহাদের অনেকগুলিই এই সময়ে রচিত হইয়াছিল। এই সময়েই তাঁহার কবিপ্রতিভার চরম বিকাশ ঘটিয়াছিল এবং তাঁহার সাধনার উচ্চতম লোকে তিনি অধিরোহণ করিয়াছিলেন। দেহ ও মনের সম্পূর্ণ পরিণত অবস্থায় জরা-বার্দ্ধক্যের আক্রমণের পূর্ব্বে এই যুগের কাব্য রচিত হয়, রবীন্দ্রকাব্য বলিতে সাধারণতঃ আমরা যাহা বুঝি তাহার লক্ষণাদি এই যুগের কাব্যের সহিত-ই বিশেষ ভাবে জড়িত।

রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতার প্রকৃষ্ট প্রকাশ হইয়াছে এই সময়ে। রবীন্দ্রনাথ এখন আর "খোল খোল দ্বার—রাখিওনা আর—বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে" বলিয়া শুধু কাতর আবেদন করেন না, কিংবা "আমি উন্মনা হে, আমি সুদূরের পিয়াসী" বলিয়া কেবল ব্যাকুলতা

প্রকাশ করেন না। কবি এখন রহস্যপুরীর ভিতর মহলের সন্ধান পাইয়াছেন, সেখানকার ঐশ্বর্য্য তাঁহার দৃষ্টি গোচর হইয়াছে, সেই ক্বচিৎ দর্শনের কথাই তাঁহার কাব্যে স্থান পাইয়াছে। লোকোত্তর উপলব্ধিই এখন তাঁহার কাব্যের উপজীব্য। উপনিষদে "তন্দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্" বলিয়া যাহার উল্লেখ করা হইয়াছে এবং তাহার যে যে লক্ষণের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহাই এই যুগের রবীন্দ্রকাব্যের বিষয়বস্তু। 'সোনার তরী'র যুগে রবীন্দ্রনাথ একবার অবাস্তবের দিকে ধাবিত হইয়াছিলেন, সে সময়ে তাঁহার কাব্য দুর্ব্বোধ ও ধোঁয়াটে বলিয়া অনেকের কাছে প্রতীত হইয়াছিল। কিন্তু সে অবাস্তব ছিল একটা মায়িক ব্যাপার, মানবিক আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনার সৃষ্টি।* সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কবি বিরাট্ বাস্তবের মধ্যে মহাসত্যের সন্ধান করিয়াছিলেন বা পাইয়াছিলেন। এবার যে বাস্তবাতীতের কথা তাঁহার কাব্যে স্থান পাইয়াছে, তাহা একটা গূঢ় আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ব্যাপার। যে জগতের সন্ধান এখন কবি দিতেছেন, তাহা কল্পনার জগৎ বা চির-পোষিত কোন আকাঙ্ক্ষার জগৎ নহে। তাহা দুর্দর্শ হইলেও একান্ত ভাবে সত্য; তাহা মায়া নহে, তাহা আমাদের "আপন মনের মাধুরী মিশায়ে" রচিত নহে।

*কবি বলেন,—তখন

"তোমায় সৃষ্টি করব আমি
এই ছিল মোর পণ।
দিনে দিনে করেছিলেম
তারি আয়োজন।
তাই সাজালেম আমার ধুলো,
আমার ক্ষুধাতৃষ্ণাগুলো,
আমার যত রঙিন আবেশ,
আমার দুঃস্বপন।"

ইহার পথ "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং"। সেই দুর্গম পথে অভিসারের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির কথাই এই যুগের কাব্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

এই যুগের কাব্য সম্বন্ধে একটা অভিযোগ আছে। ইহা-ও দুর্ব্বোধ, এবং ইহাতে মানবিকতার অভাব আছে, এরূপ অনেকে বলিয়াছেন। এই অভিযোগের যে কোন কারণ নাই এমন নহে। জীবনেব স্থূল অভিজ্ঞতার কথা এ সময়ের কাব্যে কম-ই আছে; যে "Soul's adventure, brave and new"—মানবাত্মার যে অভিনব অভিসারের কাহিনী কবি এখন বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সাধারণ জীবনের অভিজ্ঞতা ও সাংসারিক জ্ঞানের সহায়তায় অনুধাবন করা সম্ভব নহে। "নামিয়ে মুখ চুকিয়ে সুখ যাবার মুখে যায় যারা" অর্থাৎ যাহাদের জীবনে লোকোত্তর অনুভূতির আকর্ষণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের পক্ষেই এই সমস্ত কাব্যের মর্ম্মগ্রহণ করা সম্ভব। অন্যান্য পাঠকের পক্ষে এই যুগের কাব্যের ভাবাবেগ একপ্রকার shadow-fighting কিংবা হাওয়ার সহিত লড়াইয়ের উন্মাদনা মাত্র বলিয়া মনে হইতে পারে। সেই হিসাবে ইহা দুর্ব্বোধ। নহিলে এ যুগের কাব্যের ভাষা প্রাঞ্জল, কল্পনা সহজ, ভাব স্বচ্ছ। অনেক পরমার্থিক রচনাতেই, যেমন রামপ্রসাদের কাব্যে ও বাউল-সঙ্গীতে, এই সমস্ত গুণ এবং তথাকথিত দোষও দেখা যায়।* কিন্তু এই সমস্ত কবিতার স্বচ্ছ মুকুরে যে অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা সাধারণের অজানা বলিয়াই তাহার রূপরেখা এত অস্পষ্ট বলিয়া মনে হয়।

* রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি' প্রভৃতি কাব্য রচনার সময়ে বাউল-সঙ্গীতের শিল্পপদ্ধতির দ্বারা অনেক সময় প্রভাবিত হইয়াছিলেন। কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি এই সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং ঐ জাতীয় গীতও রচনা করেন।

গূঢ়াত্মবোধের কাব্য আমাদের দেশে আগেও লেখা হইয়াছে। কিন্তু সেই সমস্ত রচনার সহিত রবীন্দ্রনাথের রচনার পার্থক্য আছে। পূর্ব্বকালে এই জাতীয় কাব্যে সম্প্রদায়গত বা শাস্ত্রগত কতকগুলি বিশেষ প্রতীক, প্রত্যয় ও ভাবের ব্যবহার করা হইত, সুতরাং দীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে ঐ সকল রচনার মর্ম্মগ্রহণ করা সহজ ছিল। অদীক্ষিত সাধারণ লোকের পক্ষেও ঐ সকল পারিভাষিক শব্দের অর্থ ও অভিধা একবার বুঝিয়া লইলে কাব্যের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ হইত না। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্য সাম্প্রদায়িকতা-বর্জ্জিত ; দার্শনিক পরিভাষার তিরস্করণী সর্ব্বতোভাবেই রবীন্দ্রনাথ পরিহার করিয়া চলিতেন। কাব্যকে তিনি সকল-সহৃদয়-হৃদয়সংবাদী করিবার প্রয়াস-ই করিতেন, সহজ কল্পনা ও পার্থিব রূপের মাধ্যমেই তিনি তাঁহার উপলব্ধিকে প্রকট করিবার চেষ্টা করিতেন। ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে অসাধারণ অনির্দ্দিষ্ট ভাবকে তিনি সাধারণ সুনির্দ্দিষ্ট প্রতিরূপ দিবার চেষ্টা করিয়া তাঁহার রচনা-কে এক হিসাবে অস্পষ্ট করিয়াই ফেলিয়াছেন। গূঢ়-কে স্ফুট, জটিলকে সরল করিতে গিয়াই রবীন্দ্রনাথ তাহাকে আরও যেন দুর্ব্বোধ করিয়াছেন। যে সমস্ত কল্পনা ও প্রতিরূপ তাঁহার গূঢ়াত্ম-বোধক কাব্যে স্থান পাইয়াছে, তাহাদের সাধারণ ভাবানুষঙ্গের সহিত রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্মানুভূতির তেমন কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই ; কবি যেন অনর্থক সেই সমস্ত কল্পনা ও প্রতিরূপ লইয়া খেলা করিতেছেন, বা বিনা সূতার মালা গাঁথিতেছেন বলিয়া মনে হয়। ইহাই এই সকল কবিতার অস্পষ্টতার অন্যতম কারণ। তাহার ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে রবীন্দ্রনাথের গূঢ়াত্মবোধক কবিতার খুব সুলভ অনুকরণ যথেষ্ট চলিতেছে, এবং সাধারণ পাঠকের পক্ষে খাঁটি ও মেকির পার্থক্য ধরা খুব দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। কয়েকটা সুলভ ভাব, কল্পনা ও এক

জাতীয় আধ্যাত্মিক ভান সংমিশ্রণ করিলেই 'গীতাঞ্জলি'র সমতুল্য কবিতার সৃষ্টি হইতে পারে, এইরূপ একটা ধারণা অনেকেরই মনে মনে আছে, এবং এই জন্যই 'গীতাঞ্জলি'-মার্কা কবিতা ও গান হাটে বাটে সকলেই রচনা করিতেছে, লোকেও অশ্বত্থমার ন্যায় পিটুলির জলকে দুগ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতেছে।

আনুষঙ্গিক কারণেই এই যুগের রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে মানবিকতার অভাবের অভিযোগ আসিয়াছে। মানবিকতার বাস্তবিক কোন অভাব এখানে নাই, এ সমস্ত কবিতাই "red to the heart's deep core", "হৃদয়-রক্ত-রঞ্জনে" রঙীন। কিন্তু এখনকার মানবিকতার পরিধি ব্যাপকতর ; কেবল সাংসারিক সুখ দুঃখ, কামনা বাসনা লইয়া ইহার কারবার নয়, স্বপ্ন বা কল্পনাবিলাসে-ও ইহা সীমাবদ্ধ নয়, তাহাদের ছাড়াইয়াও যে বিশাল ছায়াচ্ছন্ন অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার জগতে মানব চিত্ত পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, যেখানে মানুষের চূড়ান্ত আত্মোপলব্ধি ও চরিতার্থতা সম্ভব, সেই জগতে প্রয়াণের অভিজ্ঞতা-ই প্রধানতঃ এই যুগের কাব্যে স্থান পাইয়াছে। অভিজ্ঞতা অ-লোকসাধারণ হইতে পারে, কিন্তু মানবিকতার সত্য হইতে বিচ্যুত নহে। মানব হৃদয়ের স্পন্দন-ই এই সকল কাব্যের প্রাণ, এখানে কেবল তত্ত্বের গ্রন্থন হয় নাই।

এই যুগের কাব্যে আর একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার আছে। এখন তাঁহার কাব্যসাধনা যে দেবতাকে ধ্রুববিন্দু রূপে গ্রহণ করিয়াছে, তিনি ঠিক পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের "জীবন দেবতা"-ও নহেন, "বিশ্বদেব"-ও নহেন, যদিও জীবনদেবতা ও বিশ্বদেবের অনেক লক্ষণ ইহার মধ্যেও আছে। রবীন্দ্রকাব্যে তাঁহার হৃদয়দেবতার স্বরূপের ক্রমবিকাশ একটা চিত্তাকর্ষক আলোচ্য বিষয়। এই দেবতাকে তিনি বরাবরই "তুমি"

বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, ইঁহাকে প্রণয়াস্পদ ও প্রেমাকাঙ্ক্ষী বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, তাঁহার সাধনার অর্ঘ্য ইঁহার উদ্দেশেই বরাবর উৎসৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাধনার প্রকৃতি ও পদ্ধতি যেমন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাঁহার উপলব্ধির ও আধ্যাত্মিক প্রয়াসের যেমন ভাবান্তর ঘটিয়াছে, তেমনই তাঁহার হৃদয়দেবতা-ও নব নব রূপে নব নব গুণ ও উপাধিতে ভূষিত হইয়া তাঁহার কাছে প্রকট হইয়াছেন। পৌরাণিক কাহিনীতে যেমন ভগবানের বারংবার নব কলেবর ধারণের ও নূতন নূতন অবতার রূপে আবির্ভূত হওয়ার কথা আছে, রবীন্দ্র-কাব্যেও তদ্রূপ তাঁহার দেবতার বারবার করিয়া নব ভাবে প্রকট হইবার ইতিহাস আছে। এই ইতিহাসের অতি প্রয়োজনীয় উপাদান রহিয়াছে এই যুগের কাব্যে। রবীন্দ্রনাথের ঐশী উপলব্ধি ও আস্তিক্য-বাদের প্রকৃষ্ট পরিচয়, তাঁহার দেবতার প্রকটতম অভিব্যক্তি 'গীতাঞ্জলি' যুগের রচনাতেই পাওয়া যায়।

একাদশ পর্ব্ব (ভাব)

['খেয়া']

(১৯০৫-৮)

"ওরে আয়,
আমায় নিয়ে যাব কে রে
বেলাশেষের শেষ খেয়ায়।"

যে গূঢ়োপলব্ধির ইতিহাস এই যুগের কাব্যে পাওয়া যায়, তাহার প্রথম অধ্যায় লিখিত হইয়াছে 'খেয়া' কাব্যে। বাস্তবের তথা জাগতিক সত্যের তীর ছাড়িয়া দিয়া কবি অবাস্তবের তথা গূঢ়াত্মবোধের দিকে খেয়ার পাড়ি দিলেন। 'উৎসর্গ' পর্ব্বে কবির প্রাণে যে উন্মনা ভাব ও সুদূরের পিয়াসা জাগ্রত হইয়াছিল, তাহারই পরিণতি দেখিতে পাওয়া যায় 'খেয়া' পর্ব্বে। কবি বুঝিতেছেন যে তিনি জানা ও অজানার সীমারেখায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহার "দিনের আলো" ফুরাইয়াছে, ছায়াচ্ছন্ন "ঘুমের দেশ" তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। এখন তিনি "ঘরেও নহে, পারেও নহে"—উভয়ের মাঝখানে রহিয়াছেন, কিন্তু ঘরে আর ফিরিতে পারেন না, ওপারের মায়া "কাজ-ভাঙানো গান" গাহিয়া তাঁহাকে সাংসারিক জ্ঞান ও লাভালাভের আশ্রয়তট হইতে অন্যত্র লইয়া যাইতেছে। * তাঁহার কাছে এই আহ্বান এত প্রবল ছিল যে স্বদেশী যুগের অন্যতম নায়ক হইয়াও রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের প্রবল আবর্ত্ত হইতে

* এই সময়ে প্রথমে তাঁহার পিতৃবিয়োগ এবং পরে তাঁহার প্রিয়তম সন্তান কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রের মৃত্যুতে তাঁহার উপলব্ধি প্রভাবিত হইয়াছিল, এরূপ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক।

অবসর গ্রহণ করিলেন। যে খাতে এখন রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের ধারা অগ্রসর হইল তাহা কবির কাছে সঙ্কীর্ণ ও পঙ্কিল বলিয়া মনে হইল। তিনি দেখিলেন যে মানবতার মহত্তর আদর্শের সহিত তাহার সংযোগ নাই। রবীন্দ্রনাথ দেশের সম্মুখে কথায়, কাজে, গানে, বক্তৃতায় যে মহৎ রাষ্ট্রীয় আদর্শ উপস্থাপিত করিলেন, তাহা প্রশংসা পাইল, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাহার অনুসরণ কেহ করিল না। যে উন্মাদনায় দেশ মাতিয়া উঠিল, তাহার সহিত কবির আত্মা যোগ দিতে পারিল না। "অকূল-ভাসা তরীর আমি মাঝি—বেড়াই ঘুরে অকারণের ঘোরে—তোমরা সবে বিদায় দেহ মোরে", এই বলিয়া কবি স্বদেশবাসীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। * কবি বঙ্গদর্শনের সম্পাদনা ছাড়িয়া দিলেন, পারিবারিক নানা সমস্যার একটা ব্যবস্থা করিয়া সাহিত্যকর্ম্মে নিবিষ্ট হইলেন, সাময়িক কোলাহলের উর্দ্ধে যে সত্যলোক রহিয়াছে তাহার "জ্যোতীরসমমৃতম্"-এর স্পর্শলাভ ও তাহার প্রচারই তাঁহার জীবনের ব্রত হইল। এখন হইতে রাজধানী কলিকাতার স্থলে বোলপুরের শান্তিনিকেতন-ই তাঁহার জীবনের কেন্দ্র হইল।

কবির এই যে নূতন জীবন আরম্ভ হইল তাহাতে ঐশী সত্তার সহিত কবির আত্মার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক-ই প্রধান ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল, "সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলরব"—এ কথা তাঁহার কাছে প্রত্যক্ষ সত্য হইয়া উঠিল। ঐশী সত্তার সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধ গূঢ়বাদী সাহিত্যের সুপরিচিত রূপকের সাহায্যেই "খেয়ায়" বর্ণিত হইয়াছে। কবি নিজে তরুণী, "বালিকা বধূ", এবং ঈশ্বর হইতেছেন প্রেমাস্পদ বর, এবং তাহার উপর তিনি রাজাধিরাজ।

* তবে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে স্বদেশের মুক্তি সাধনার প্রতি তিনি কখনও উদাসীন হন নাই; লেখায়, গানে, বক্তৃতায় তিনি চিরজীবনই এই সাধনায় প্রেরণা দান করিয়াছেন।

এই খেয়া-গীতাঞ্জলির যুগেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রূপকনাট্য 'রাজা' রচনা করেন, তাহাতেও মানবাত্মার সহিত ঈশ্বরের এই জাতীয় সম্পর্কই কল্পিত হইয়াছে। 'খেয়া'য় মানবাত্মার সহিত ঈশ্বরের যে সম্পর্ক কল্পিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে। এই সম্পর্কের মধ্যে মিলনের পূর্ণতা নাই; ঈশ্বরকেই একমাত্র প্রভু ও আশ্রয় জানিয়া তাহার কাছে আত্মসমর্পণ কবি করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে তিনি পূরাপুরি ভাবে পান নাই বা জানেন নাই, তাহার সম্বন্ধে একটা ভীত ভীত সঙ্কোচের ও রহস্যের ভাব রহিয়াছে। দূর হইতে তাঁহার বিভূতি ও মহিমা কথঞ্চিৎ দেখিয়া কবি অভিভূত হ'ন, সহসা কখন অজ্ঞাতে তাঁর "পরশমধু" পাইয়া তিনি চমকিত ও ধন্য হ'ন। কিন্তু এই স্পর্শ তিনি পাইয়া থাকেন নিশীথের অন্ধকারে, দুর্যোগ ও ঝঞ্ঝার মুহূর্ত্তে। ঈশ্বরের ক্ষমতা অসীম, তাঁহার লীলা-ও বিচিত্র; আমাদের সাংসারিক বুদ্ধি ও বিচারের তিনি অতীত, তাঁহাকে আমরা হিসাবের মধ্যে কখনও পাই না; আমাদের আঘাত করিয়া রিক্ত করিয়া তিনি তাঁহার আবির্ভাব আমাদের কাছে প্রতিপন্ন করেন, কারণ কেবল আঘাতের বেদনাই আমাদিগকে আধ্যাত্মিক জড়তা হইতে উদ্ধার করিতে, আমাদের সাংসারিক মোহের তন্দ্রা ভাঙিয়া আমাদের প্রবুদ্ধ করিতে পারে। তাঁহাকে আমরা সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে পারি, আমাদের অর্ঘ্য তিনি কি ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন এবং আদৌ গ্রহণ করেন কিনা তাহা বুঝা যায় না। আমাদের হারছেঁড়া মণি রথের চাকায় গুঁড়া হইয়া যায়। তবুও তাঁহার উদ্দেশ্যে বক্ষের মণি ধূলায় বিসর্জ্জন দেওয়াতেই আত্মার তৃপ্তি ও সার্থকতা।

এই জন্য 'খেয়া' কাব্যে ত্যাগের মূল্য বিশেষ ভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। আগেকার যুগে রবীন্দ্র-কাব্যে ত্যাগ অপেক্ষা ভোগের

মাহাত্ম্যই বরং প্রচারিত হইয়াছে। কেবল 'কড়ি ও কোমল' ইত্যাদি প্রথম যুগের কাব্যে নহে, পরিণত বয়সের 'নৈবেদ্য' প্রভৃতি কাব্যেও ভোগের গৌরব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়" ইহাই রবীন্দ্র-কাব্যের বাণী। 'খেয়া'তে কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন। যাহার কাছে অজানার আকর্ষণ প্রবল হইয়াছে, স্বেচ্ছায় যে "ঘাটের কিনারায়" আসিয়া বসিয়াছে, তাহার কাছে "রত্ন খোঁজা, রাজ্য ভাঙা-গড়া" হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্ববিধ ভোগ ও ভোগবাসনা মিথ্যা হইয়া যায়। 'খেয়া'র কবি সংসারবিমুখ, বৈরাগ্যসাধক। "তোমায় কেন দিই নি আমার সকল শূন্য ক'রে"—ইহাই তাহার দুঃখ ও পরিতাপ। "তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে" এই ভাবই তাহার হৃদয়ে প্রবল। শুধু তাহাই নহে। 'খেয়া'র কবি উপলব্ধি করিয়াছেন যে জীবনে সার্থকতার সন্ধান যেমন ত্যাগের মধ্যেই পাওয়া যায়, বিশ্বের বিপুল কর্ম্মপ্রবাহের সার্থকতার রহস্য-ও তেমনই আপাতপ্রতিম "অনাবশ্যক" অপচয়ের মধ্যেই সুনিহিত রহিয়াছে। আমাদের অভাব পূরণের জন্য বিশ্বস্রোত প্রবাহিত হয় না, আমাদের লাভ ক্ষতির হিসাব অনুসারে বিশ্ব-কর্ত্তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরিমাপ করা যায় না।

সঙ্গে সঙ্গে কবি এই সময়ে উপলব্ধি করিতেছেন যে মানব আত্মার চরম সার্থকতার দিক্ হইতে দুঃখের একটা বিশিষ্ট মূল্য আছে। এই যুগে "দুঃখ" নাম দিয়া রবীন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধটি রচনা করেন, তাহাতেও এই কথা বলা হইয়াছে। দুঃখের প্রভাবেই আমরা ঈশ্বরের সম্বন্ধে সচেতন হই, তাঁহার বিভূতির সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে। দুঃখ হঠাৎ একটা ঝড়ের মত আমাদের জীবনে আবির্ভূত হইয়া একটা প্রলয় বাধাইয়া দেয়। যখন আমরা মোহে মগ্ন সেই সময়ে রুদ্র মূর্ত্তিতে ঈশ্বর আমাদের কাছে দেখা দেন, তাঁহার সেই রৌদ্র রূপ

দেখিলে আর ভ্রান্তির বা মোহের সম্ভাবনা থাকে না। "ঝড়ের রাতে হঠাৎ এল দুঃখরাতের রাজা",—ইহাই ঈশ্বরের পরিচয়। তাঁহার দান "মালা নয়", বজ্রের ন্যায় ভয়াল "তরবারি'।

এই ভাবে দুঃখ ও ত্যাগের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তন করিতে করিতে কবির মনে এই সময়ে যে জীবনাদর্শ প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় "সব পেয়েছির দেশ" কবিতাটিতে। এই "সব পেয়েছির দেশ" আসলে সব-ছেড়েছি-র দেশ। সেখানে সাংসারিক ঐশ্বর্য্য-ও নাই, সাংসারিক বাসনাও নাই; কৃত্রিমতা সেখানে বিলুপ্ত, নিসর্গের শুচি শান্তিতে সে দেশ অভিষিক্ত। ভোগতৃষ্ণা একেবারেই নাই বলিয়াই সে দেশে সুগভীর তৃপ্তি বিরাজিত। সেখানকার লোকে "সাঁজে ফেরে বিনা-বেতন", তবুও তাহারা প্রত্যূষে হাস্যমুখে কাজ করিতে যায়, গান গাহিতে গাহিতে পথ চলিয়া থাকে। দূরের পান্থ হঠাৎ এক রজনীর জন্য এখানে আসিয়া ইহার স্বরূপ ঠিক বুঝিতে পারে না। কবি জীবনের বিচিত্র আশা নৈরাশ্য অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ "সারাদিনের শেষে" ত্যাগের খেয়া নৌকায় সাংসারিকতা ও গূঢ় সাধনার মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান পার হইয়া এই দেশে পৌঁছিলেন, এবং "তারায় ভরা আকাশতলে" পা ছড়াইয়া বসিয়া তৃপ্ত ও ধন্য হইলেন।

দ্বাদশ পর্ব্ব (মহাভাব)

['গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি']

(১৯০৮-১৯১৩)

"কোলাহল তো বারণ হল
এবার কথা কানে কানে।
এখন হবে প্রাণের আলাপ
কেবল মাত্র গানে গানে।"

রবীন্দ্রকাব্যের কোন কোন পর্ব্বের ভাববৈশিষ্ট্য নির্দ্দেশ করিবার জন্য 'মহাভাব' কথাটি এই গ্রন্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। 'গীতাঞ্জলি' পর্ব্বের কাব্য সম্বন্ধে এই কথাটির প্রয়োগ সর্ব্বথা সুষ্ঠু বলা যাইতে পারে। মহাভাব বলিতে মহাজনেরা উপলব্ধির যে মৌলিক গুণ ও লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেন, তাহা এই পর্ব্বের রবীন্দ্রকাব্যে পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। যে উপলব্ধি মানব চিত্তকে একান্ত ভাবে অভিভূত করে, সাংসারিক মনোবিকার হইতে চিত্তকে একেবারে মুক্ত করে, একটা স্বয়ং-সম্পূর্ণ রসলোক সৃষ্টি করিয়া তাহাতে আত্মার আশ্রয় রচনা করে, যাহার তীব্র মাধুর্য্য শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়া একটা অলৌকিক উন্মাদনার উৎপাদন করে, নশ্বর দেহ ও পার্থিব জীবনের পরিসরের মধ্যেই একটা স্বর্লোক সৃষ্টি করে এবং সর্ব্বাপবর্গের ফল প্রদান করে, যাহা ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার শুধু সংযোগ নহে, পূর্ণ মিলন সংঘটন করে, তাহাকেই মহাভাব বলা যায়। গীতাঞ্জলি পর্ব্বেই এই সমস্ত গুণ রবীন্দ্রকাব্যে সমধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। যদি সাধকো-চিত অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের কখনও হইয়া থাকে, তাহা এই সময়েই

ঘটিয়াছিল। তাহার অন্যতম প্রমাণ এই যে এখন রবীন্দ্রনাথ যত কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহার প্রায় সমস্তই গান। সিদ্ধ পুরুষের স্পর্শে যেমন ধুলিমুষ্টিও স্বর্ণে পরিণত হয়, তেমনই এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যে কোন ভাবকে স্পর্শ করিলেই তাহা গীতে রূপায়িত হইত! "সুরগুলি মোর পায় যে চরণ, আমি পাই নে তোমারে"—এই সময়েই যেন রবীন্দ্রনাথ সুরের ডানা মেলিয়া অবাধে অন্তরীক্ষের পরপারে প্রেমময়ের চরণ স্পর্শ করিতে পারিয়াছিলেন। যে স্বর্গীয় সুষমা, মাধুর্য্য ও শান্তি এই সময়েব গানে পাওয়া যায়, তাহা রবীন্দ্রসাহিত্যেও দুর্লভ।

রবীন্দ্রজীবনে এই সময়ে যে একটা মহৎ সৃষ্টিকর্ম্ম চলিতেছিল, তাহার পরিচয় নানা রূপে প্রকট হয়। তাঁহার জাতীয়তা ও ভারতীয়তার আদর্শ এখন ক্রমেই একটা বিশ্বজনীন ও বিশ্বকালীন আদর্শের সহিত একীভূত হইতে থাকে। তাঁহার মহত্তম উপন্যাস 'গোরা'য়, তাঁহার 'ধর্ম্ম, 'শান্তিনিকেতন' শীর্ষক প্রবন্ধে, 'শারদোৎসব' 'প্রায়শ্চিত্ত' 'রাজা' 'ডাকঘর' 'অচলায়তন' 'ফাল্গুনী' নাটকে এই "বিশ্ববোধের" পরিচয় পাওয়া যায়। যে গভীরতা, উদারতা, মহত্ত্ব ও শিল্পসৌন্দর্য্য এখন রবীন্দ্ররচনায় ভাস্বর মহিমায় দীপ্ত হইয়া ফুটিয়া উঠে, তাহা দেশে বিদেশে স্বীকৃতি লাভ করে। এই যুগেই রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

'খেয়া' পর্ব্বে কবিহৃদয়ের সহিত ঈশ্বরের পূর্ণ মিলন ঘটে নাই, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সে সময়ে কবি যেন কতকটা দূর হইতে অর্দ্ধপরিচয়ের অন্তরাল হইতে ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাঁহাকে "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্" রূপেই প্রায়শঃ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এখন কিন্তু কবি তাঁহাকে যেন ঘনিষ্ঠ ভাবে প্রেমলীলারস-সমুৎসুক প্রণয়ী

রূপে পাইতেছেন। পূর্ব্বের ব্যবধান আর নাই, ঈশ্বর এখন কবির কাছে "নাথ" ও "বন্ধু"। তাঁহাকে লইয়া অভিসার, মিলন ও বিরহের পালা সর্ব্বদাই চলিতেছে। এই পালাগানের প্রত্যেকটি সুর হইতে অমৃত রস ঝরিয়া পড়িতেছে, কোন পার্থিব আবেগের জ্বালা তাহাতে নাই।*

বৈষ্ণব কবিদের প্রেমের কবিতার সহিত এই প্রেমগীতি-সমূহের একটা তুলনা করার প্রবৃত্তি স্বভাবতঃই হইতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই মানবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্পর্ক একপ্রকারের প্রণয়লীলা বলিয়া পরিকল্পিত হইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দেবতা বৈষ্ণব কবিদের "শ্যাম" নহেন। বৈষ্ণব কাব্যের শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা রক্ত-মাংসের জীব, তাঁহাদের ব্যক্তিত্বে ও প্রণয়লীলার মধ্যে বাস্তবতা প্রগাঢ়। শ্রীরাধিকা "ব্রজরমণীগণ-মুকুটমণি", রমণীর দেহ ও মনের চরম মাধুর্য্য শ্রীরাধিকার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ "রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি"; যেমন তাঁহার অপরূপ রূপমাধুরী তেমনিই তাঁহার সুনাগরোচিত গুণাবলী। রূপক ছাড়িয়া দিলে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা পরিশুদ্ধ মানবতার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি, যদিও সেই মানবতা মাত্র একটি রসের অর্থাৎ মধুর রসের অভিব্যক্তি। মানব প্রণয়ের নানা ভাব ও অবস্থার বর্ণনাই বৈষ্ণব প্রেমকবিতার বিষয়বস্তু, তবে তাহাতে একটা দৈবী ভাবের ব্যঞ্জনা অতি সুকৌশলে আরোপ করা হইয়াছে। 'গীতাঞ্জলি' প্রভৃতি কাব্যে কিন্তু কোন রক্তমাংসের চরিত্র অথবা পার্থিব প্রণয়ের চিত্র নাই। একটা সূক্ষ্ম উপলব্ধি তদুচিত প্রতীক ইত্যাদির মাধ্যমে

* অথচ কোন কোন মানবতাভিমানী সমালোচক 'গীতাঞ্জলি' পর্ব্বের কাব্যকে সমাদর করিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন, কারণ তাহাতে নাকি যথেষ্ট মানবিকতা নাই। এরূপ ধারণা একপ্রকার মনোবিকারের লক্ষণ।

প্রকাশিত হইয়াছে, কোনও কাহিনী বা ইতিহাস বা রূপক রচনার প্রয়াস করা হয় নাই। উন্মুখ মানব-হৃদয়ে ঈশ্বরানুভূতির বিভিন্ন অনুভবগুলি কয়েকটি লঘু রেখার সমাবেশে ব্যঞ্জিত হইয়াছে, কোন রঙীন চিত্র অঙ্কিত হয় নাই। সেই হিসাবে গীতাঞ্জলির গানগুলি কবি Shelley ব বচনাব অনুরূপ, এখানে ব্যঞ্জনার উৎকর্ষ আছে কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট রূপ ফুটিয়া উঠে নাই। অপর পক্ষে বৈষ্ণব প্রেমের কবিতাগুলি Keats-র কবিতার অনুরূপ ; এখানে তীব্র ইন্দ্রিয়ানুভূতিব পরিচয় আছে এবং সেই অনুভূতি-ই একটা অসীমের আভাস আনিয়া দিয়াছে। Shelley ও Keats-র কাব্যের মধ্যে যেমন শিল্পপদ্ধতির পার্থক্য আছে, বৈষ্ণব কবি ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও তেমনই আছে। কিন্তু এই রীতি বা পদ্ধতির পার্থক্য হইতেই গুণাগুণ বা কৃতিত্বের পরিমাপ করা যায় না। সুতবাং 'গীতাঞ্জলি'তে বৈষ্ণব কবিতার বাস্তবতা বা স্থূল মানবিকতা নাই বলিয়াই যে তাহার উৎকর্ষের লাঘব হইবে এমন কোন কথা নাই। তদ্ভিন্ন এ কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে যাহা সুলভ, সুপ্রসিদ্ধ বা সর্ব্বজনবিদিত নহে তাহাই যে মানবিকতার দিক্ দিয়া অকিঞ্চিৎকর হইবে, এরূপ সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক। Shelley বা Browning-র ভাব সর্ব্বসাধারণের পক্ষে গ্রহণ করা কঠিন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের কাব্যে মানবিকতার অভাব আছে, এ কথা বলা সঙ্গত হইবে না। 'গীতাঞ্জলি' প্রভৃতি কাব্যের ভাব যতই সূক্ষ্ম হউক, তাহাতে মানব সত্যের কোন অপ্রতুলতা নাই।

কান্তাভাবে ঈশ্বরকে এখন উপলব্ধি করিলেও রবীন্দ্রনাথ মানবপ্রেমের মাত্র কয়েকটি ভাব এই উপলব্ধিতে আরোপ করিতে পারিয়াছেন। প্রণয়ীর (ঈশ্বরের) প্রেম লাভ করিবার সৌভাগ্য হইলেও

প্রণয়িনীর (কবি) সহিত তাঁহার একটা ব্যবধান যেন থাকিয়াই যাইতেছে; তিনি সুমহান্ ও উচ্চস্থ. তাঁহার চরণতলে স্থান পাওয়া বা পাদস্পর্শ করাই প্রণয়িনীর যেন চরম লক্ষ্য। বহুদূরে তাঁহার আসন। তবে তিনি-ও মানব-প্রণয়িনীর সহিত মিলন খুঁজিতেছেন, এই লীলাতে তাঁহারও আনন্দ। ঝড়ের রাতে তিনি প্রণয়িনীর উদ্দেশ্যে অভিসারে বাহির হন, বেদনা-দূতী তাঁহার সংবাদ দিয়া যায়, দুঃখের বরষায় তাঁহার রথ দরজায় আসিয়া থামে। তখন হয়ত বিরহ-বিধুরা হতভাগিনী প্রণয়িনী বহু প্রতীক্ষার পর আশাহত হইয়া মানব-সুলভ দুর্ব্বলতাবশতঃ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, প্রণয়ী কাছে আসিয়া শুধু কানের কাছে বীণা বাজাইয়া চলিয়া যান, তাঁহার মালার পরশ প্রণয়িনীর ভাগ্যে কদাচই মিলে। আবার কখনও বা প্রণয়িনীই অজানা পথ ধরিয়া অভিসারে বাহির হয়।*

এইভাবে বিবেচনা করিলে বলিতে হইবে যে রবীন্দ্রনাথের ভগবৎ-প্রেমের মধ্যে রসের গাঢ়তা নাই, মিলনের পূর্ণতা নাই; রবীন্দ্রনাথ মণিকোঠার ভিতরে কখনও প্রবেশ করিতে পারেন নাই। তবে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে 'গীতাঞ্জলি'র ভগবৎ-প্রেমের মধ্যে অন্ততঃ আন্তরিকতার ও যথার্থ অনুভূতির সত্য আছে; এখানে রবীন্দ্রনাথ তর্কযুক্তিকে বা চমৎকার কল্পনাকে উপলব্ধি বলিয়া ভ্রম করেন নাই, পার্থিব অনুভূতিকে কৃষ্ণপ্রেমের ছাপ দিয়া চালাইতে চেষ্টা করেন নাই।

'গীতাঞ্জলি' পর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরের আবির্ভাব "নব নব রূপের" মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। কখন কখন ঈশ্বর অলক্ষ্য সঞ্চারে

*এই যুগে রচিত 'ডাকঘর' ও 'রাজা' নাটক দুইটিতেও এই জাতীয় উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে আবির্ভূত হন এবং কবির হৃদয়ে তাঁহার স্পর্শ দিয়া যান। মানুষের মধ্যে যে কর্ম্মশক্তির ক্রিয়া অবিরত চলিতেছে, যে শক্তির প্রভাবে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রগতি সম্ভব হইতেছে, তাহাতেও তিনি প্রকট হইয়া থাকেন, এবং এই কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিলেও তাঁহার সহিত মিলিত হওয়া যায়। 'বিশ্বসাথে যোগে' তিনি 'যথায় বিহার' করেন, সেইখানে তাঁহার সহিত আমাদের প্রাণের যোগ হয়; যখন তাঁহার "অভ্রভেদী রথের" রশি ধরিয়া আমরা আকর্ষণ করি, তখনই আমাদের আত্মনিবেদন সার্থক হয়। কিন্তু ঈশ্বরকে বিশেষ-ভাবে উপলব্ধি করা যায় মানবহৃদয়ের সূক্ষ্মতর সুকুমার বৃত্তির উর্দ্ধায়নের সাহায্যে। প্রধানতঃ সঙ্গীতের লোকাতিক্রমী ব্যঞ্জনার মধ্যেই কবি তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এই জন্য গান-ই তাঁহার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য, গানেই তাঁহার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, এবং কবিহৃদয়ের-ও পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি গানে। সকলভোলা আত্মহারা গভীর নিবেদন ও আত্ম-বিসর্জ্জনের প্রেমে-ও সেই উপলব্ধি হয়। কিন্তু এ প্রেম পার্থিব নহে, ইহার সহিত কোন সাংসারিক অনুরাগের সম্পর্ক নাই। ইহা দময়ন্তী-র প্রেম নহে, যে প্রেম প্রণয়াকাঙ্ক্ষী দেবতাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া সাংসারিক জীবনের প্রণয়ীকেই প্রার্থনা করে সেই জাতীয় প্রেম নহে; ইহা মীরাবাঈয়ের প্রেম, যে প্রেম সামাজিক সম্পর্কের স্বামী-কে না চাহিয়া জগৎ-স্বামীর স্বপ্নে বিভোর হয় ইহা সেই প্রেম। একটা অপার্থিব আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা এই প্রেমের লক্ষণ। ঈশ্বরানুভূতি-ই এই ব্যাকুলতার কারণ, এবং এই ব্যাকুলতাই তাঁহাকে মনে প্রাণে পাইবার পথ। এই অনুভূতি জাগ্রত হইলে আমরা বুঝিতে পারি কি ভাবে সীমার মাঝে অসীম অহোরাত্র আপন সুর বাজাইতেছেন। আমাদের সীমাবদ্ধ জীবনেও অসীমের স্পর্শ পাওয়া যায় নানা ভাবে

নানা সময়ে অলৌকিকের ব্যঞ্জনাময় বিচিত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। আকস্মিকরূপে অপ্রত্যাশিতভাবে দেবতা আমাদের অভিজ্ঞতার জগতে আবির্ভূত হন ; কখনও বা স্বপ্নে, কখনও বা কঠোর বাস্তবের বেদনায় আমরা তাঁহার হস্তের স্পর্শ পাই। সেই স্পর্শ পাওয়াতেই মানব জীবনের চরম সার্থকতা। যখন সেই সার্থকতা সত্যই সম্ভব হয় তখন সংসারের ভয় ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা মিথ্যা স্বপ্নের মত অন্তর্হিত হয়, অনির্ব্বচনীয় আনন্দে দেহ-মন ভরিয়া উঠে, দেবতা ও ভক্তের মিলন-মাধুর্য্যই একমাত্র সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়।

'নৈবেদ্যে'র সহিত 'গীতাঞ্জলি' ইত্যাদির তুলনা করার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। উভয় ক্ষেত্রেই দেখিতে পাই যে কবির হৃদয়ে একটা মহাভাব বিরাজ করিতেছে এবং ঈশ্বরের একটা সামগ্রিক উপলব্ধি তাঁহার হৃদয় পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু 'নৈবেদ্যে' ভগবান্ বিশ্বের নিয়ামক, ধর্ম্মের অধিষ্ঠাতা ও প্রয়োজক। তিনি তৎসবিতা, বরেণ্য ; "ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ" বলিয়া কবি তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিতেছেন। 'নৈবেদ্যে'র আদর্শ ভক্তিমিশ্র কর্ম্মযোগ।

'গীতাঞ্জলি' ইত্যাদিতে কিন্তু ঈশ্বরকে অন্যভাবে দেখা হইয়াছে। তিনি কেবল বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্ত, দর্শনের চূড়ান্ত প্রতিপাদ্য, বাস্তবের অধিষ্ঠাতা নহেন। তিনি প্রেমিক, কবি, গুণী ; তিনি মানুষকে চাহেন, তাহার প্রেমার্ঘ্য গ্রহণ করেন। যাহার তদুপযুক্ত বোধ আছে, সে তাঁহাকে প্রিয়তম রূপেই পায়। মানবাত্মার সহিত তাঁহার লীলা-খেলা ও আদান-প্রদান সর্ব্বদাই চলিয়া থাকে। তাঁহার পূর্ণ অভিব্যক্তি বাস্তব সত্যের মধ্যে নহে, যদিও জীবনের অনেক ব্যাপারেই কোন না কোন একটা ইঙ্গিত তাঁহার দিকে আমাদের মনকে পরিচালিত করে। 'গীতাঞ্জলি'র আদর্শ কর্ম্মযোগ নহে, এক প্রকার অপার্থিব রহস্য ও

মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ প্রেমযোগ। ইহার দেবতা পার্থ-সারথি নহেন, তিনি গোপীজনবল্লভ ; ইহার ক্ষেত্র "ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র" নহে, ইহার স্থান নিত্য বৃন্দাবন।

ত্রয়োদশ পর্ব্ব (ভাবাভাব)

['বলাকা', 'পলাতকা', 'শিশু ভোলানাথ']

(১৯১৪-১৯২১)

"ওরে যাত্রী,
ধূসর পথের ধূলা সেই তোর ধাত্রী ;
চলার অঞ্চলে তোরে ঘূর্ণাপাকে বক্ষেতে আবরি'
ধরার বন্ধন হ'তে নিয়ে যাক হরি'
দিগন্তের পারে দিগন্তরে ।"

গীতাঞ্জলি পর্ব্বেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাধনার মোক্ষধামে উপনীত হইয়াছিলেন, এইরূপ একটা ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। সেই সময়ে যেন তিনি "অমিয়-সায়রে সিনান" করিয়া পরমার্থ লাভ করিয়াছিলেন, এবং সিদ্ধ পুরুষের ন্যায় বলিতে পারিয়াছিলেন,

শুনব কি আর বুঝব কিবা, এই তো দেখি রাত্রিদিবা
ঘরেই তোমার আনাগোনা, পথে কি আর তোমায় খুঁজি।

কিন্তু যতই আমরা "মনে করি এই খানে শেষ, কোথা বা হয় শেষ" ! রবীন্দ্রনাথের সাধনার শেষ এখানেও হয় নাই, চিরকালই তাহা "নব নব পূর্ব্বাচলে"র সন্ধানে অগ্রসর হইয়াছে। ইহার পর 'বলাকা' রচনার সময় হইতে তাঁহার কাব্য-জীবনে আর এক পর্ব্বের সূচনা হইল, 'গীতাঞ্জলি' ও 'গীতিমাল্যে'র মহাভাব কাটিয়া গেল, পুনশ্চ চক্রগতির ধারা অনুসরণ করিয়া একটা ভাবাভাব আসিয়া দেখা দিল। যে অলৌকিক মাধুর্য্য, সঙ্গীতি ও আনন্দের ঝঙ্কারে তাঁহার জীবন

ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাহা মিলাইয়া গেল ; তাহার স্থলে ধ্বনিয়া উঠিল বাস্তবের ও বিশ্বের ভীম কল্লোল, ক্রন্দনের কলরোল, বিষশ্বাস ঝটিকার গর্জ্জন ; “জীবন এবার মাত্‌ল মরণ-বিহারে ।” কোথায় উড়িয়া গেল সেই গানের সুরের আসন, কোথায় মিলাইয়া গেল সেই আনন্দময় সুন্দরের আবির্ভাব ? সহসা যেন একটা প্রবল বন্যার স্রোতে দেবতার মন্দিরপ্রাঙ্গণ হইতে সযত্ন-রচিত পুষ্পাঞ্জলি ভাসিয়া গেল, ভূতল গগন একাকার হইয়া গেল, রহিল শুধু ঘন অন্ধকার, তীব্র স্রোত, তরঙ্গের বেগ আর নিখিলের হাহাকার। ইহারই মাঝখানে “তরঙ্গের সাথে লড়ি' বাহিয়া চলিতে হবে তরী” এই কথা সার জানিয়া মানব আত্মা প্রাণপণে জীর্ণ তরীর পাল টানিয়া রাখিয়াছে, হাল আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। কবি ভাবিয়াছিলেন “যোঝাযুঝি—মিটিয়ে পাব বিরাম খুঁজি,—চুকিয়ে দিয়ে ঋণের পুঁজি—লব তোমার অঙ্ক”, এমন সময়ে এই বিপ্লব ঘটিয়া গেল। “আবার তোমার সভা হতে আসে যে আদেশ” ; সে আদেশ আসিল নূতনতর সাধনার জন্য, “নূতম সমুদ্র-তীরে তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি”—ইহাই তাহার বাণী। এই বাণী-ই নিরুক্ত হইয়াছে ‘বলাকা’ কাব্যে।

এই ভাবে আরও কয়েকবার রবীন্দ্রকাব্যে ‘স্বর্গ হইতে বিদায়ে’র পালা অভিনীত হইয়াছে, কবি অন্তরলোকের মাধুর্য্যের প্রতি পরাঙ্মুখ হইয়া বাস্তবের কঠোর সত্যের সম্মুখীন হইয়াছেন। বিশেষ করিয়া ‘কল্পনা’ পর্ব্বে এই জাতীয় মনোভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ‘কল্পনা’য় কবি স্বপ্নলোকের নন্দন হইতে অপসরণ করিয়া ছিলেন ; আর ‘বলাকা’য় কবি ধ্যানলোকের শান্তিস্বর্গ হইতে, ভক্তের ও দেবতার নিভৃত মিলন-মন্দির হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন।*

*রবীন্দ্র জীবনের এই পর্ব্ব অনেক সময়ে ‘সবুজ পত্রের যুগ’ বলিয়া উল্লিখিত হয়। ‘সবুজ-

কল্পনায় স্বপ্নভঙ্গের পর তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন একটা দুর্জ্ঞেয় কঠোর বাস্তব সত্য। তাহা আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে বঞ্চিত এবং দুর্ব্বলতাকে নিপীড়িত করে এবং আশা নৈরাশ্যের উর্দ্ধে একটা বৈরাগ্যময় বিশালতায় উন্নীত করে। 'বলাকা'য় বাস্তব সত্যের সহিত আত্মার প্রেরণার কোন বিরোধ নাই; 'no weakness, no contempt' ইহাই 'বলাকা'র উপলব্ধি। উর্দ্ধে গগনচারী গরুড়ের ন্যায় 'বলাকা'র কবির দৃষ্টি যেমন অন্তর্ভেদী, সুদূরগামী ও সীমাহীন, তাঁহার প্রাণশক্তি-ও তেমনই অফুরন্ত। তিনি বিশ্বের ভাঙাগড়া, দুঃখ ক্লেশ, গ্লানি তাপ, অন্যায় অশান্তি, মৃত্যু ধ্বংস যেমন স্পষ্টচক্ষে দেখিয়াছেন, তেমনই নিজের জীবনেও জরা শোক, নিন্দা ক্ষতি, অপমান আবর্জ্জনা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে এবার তাঁহার উদ্বেগ, আকুলতা, অধীরতা, বেদনা-বোধ কিছুই হইতেছে না। কারণ তিনি এমন একটা মুক্তির বাণীর সন্ধান এই সময়ে পাইয়াছেন যাহার ফলে অন্তর ও বাহির, আদর্শ ও বাস্তব, আকাঙ্ক্ষা ও অভিজ্ঞতার মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপিত হইয়াছে, শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক উপলব্ধি বাস্তব জীবনের দুঃখ, পাপ ও মৃত্যুর সত্যের দ্বারা ব্যাহত না হইয়া তাহার দ্বারাই পরিপুষ্ট হইয়াছে। "সকল দ্বন্দ্ব বিরোধের" এখন অবসান ঘটিয়াছে; গীতাঞ্জলি পর্ব্বেও বাস্তবের কঠোর ও কুৎসিত স্পর্শ সম্পর্কে যে একটা কম্প্রতা, সঙ্কোচ ও কাতরতা ছিল সেটুকুও এখন নাই;

পত্রে' রবীন্দ্রনাথের যে সমস্ত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয় তাহাতে এবং এই সময়কার 'ঘরে বাইরে' 'চতুরঙ্গ' 'স্ত্রীর পত্র' 'পয়লা নম্বর' ইত্যাদি উপন্যাস ও গল্পে এই পর্ব্বের বিশিষ্ট দৃষ্টি ও অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার বিশ্ববোধও ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করে, তাহারই ফল Nationalism (জাতীয়তাবাদ) সম্বন্ধে তাঁহার নবতর ধারণা। বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা এই বিশ্ববোধের অন্যতম ব্যবহারিক পরিচয়।

জগৎ-রহস্য এখন কবির কাছে একটা সহজ সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সত্য সত্যই যেন এখন

দুর্ব্বোধ যা কিছু ছিল হয়ে গেল জল,
মুক্ত আকাশের মত অত্যন্ত নির্ম্মল।)

এখন আর মনে প্রাণে কোন অভাবের বোধ, কোন সুপ্ত ব্যর্থকামতার দংশন, কোন আকুলতার ক্রন্দন নাই। এখন কবির প্রাণে আসক্তির রক্তরাগ-ও নাই, বৈরাগ্যের ধূসরতা-ও নাই; একটা মহত্তর উপলব্ধির তীব্র দ্যুতিতে সমস্ত রং মিশাইয়া গিয়াছে, তাহার জ্যোতি-তে জল, স্থল, অন্তরীক্ষ আলোয় কালোয় একাকার হইয়া গিয়াছে, ভূর্ভুবঃস্বঃ উদ্ভাসিত হইয়াছে। 'বলাকা'র কবি অধ্যাত্মবোধে যথার্থই ঋষিতুল্য।

এই জীবন্মুক্তির সন্ধান রবীন্দ্রনাথ পাইয়াছেন "অকারণ অবারণ চলার" মধ্যে। প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক Bergson-এর প্রভাব কবির উপর পড়িয়া থাকিতে পারে, কিন্তু বোধ হয় শাস্ত্রোক্ত "চরৈবেতি" এই বাণীর মধ্যেই কবি তাঁহার এই উপলব্ধির সূত্র খুঁজিয়া পাইয়াছেন। এই উপলব্ধির প্রেরণা কবিকে সকল বাধা বিপদ্ তুচ্ছ করিয়া বিরাট্ ও অসীমের আহ্বানে জয়যাত্রার নির্দ্দেশ দিয়াছে। মানব আত্মার চরম সার্থকতা কোন বিশিষ্ট সুতরাং সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ মাধুর্য্যের মধ্যে, কোন বিশেষ উপভোগের মধ্যে নহে; এমন কি জরা-মৃত্যু-ভয়-শোক-ক্ষুৎ-পিপাসা-বর্জ্জিত যে স্বর্লোক* মানুষের পরম লক্ষ্য বলিয়া চিরকাল স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে, সেই আদি-অন্ত-হীন দেশকালাতীত "তমসঃ পরস্তাৎ" অবস্থিত স্বর্গ-ও মানবাত্মার মোক্ষ প্রদান করিতে পারে না। সেই স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা আমাদের কেবল বঞ্চনাই করিতে পারে; "ফিরেছি সেই স্বর্গে শূন্যে শূন্যে ফাঁকির ফাঁকা ফানুষ।" মানুষের

*কঠোপনিষৎ ১। ১। ১২

যে "শ্রেষ্ঠধন সে ত শুধু চমকে ঝলকে, দেখা দেয় মিলায় পলকে"; "পথের বাঁকেই হঠাৎ" তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তাহাকে লইয়া ঘর-বাঁধা যায় না। এই জন্য "চলাচলের পথে" "রক্ত পায়ে রৌদ্র ছায়ে" ছুটিয়া অগ্রসর হওয়াতেই আত্মার চরম সম্পদ্ লাভ হয়। সমগ্র বিশ্বও এই চলার প্রশাসনেই বিধৃত এবং গগনচারী বিমানের ন্যায় অস্খলিত ও সাম্যস্থ রহিয়াছে; "হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোন খানে" যাইবার জন্য একটা অদম্য প্রবৃত্তি বিশ্বের প্রাণ-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে, বীজাঙ্কুর হইতে তরুশ্রেণী, পর্ব্বত হইতে মেঘ—সকলের মধ্যেই এই প্রবৃত্তি রহিয়াছে। সেই জন্যই এত পরিবর্ত্তন ও ভাঙাগড়ার স্রোত পৃথিবীময় চলিতেছে; এবং তাহাতেই বিশ্বের সৌন্দর্য্য, শুচিতা ও স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। যদি মুহূর্ত্তের তরে এই চিরন্তন স্রোতের প্রবাহ নিরুদ্ধ হয়, তখনই "উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্ব্বতে", "অণুতম পরমাণু আপনার ভারে—সঞ্চয়ের অচল বিকারে—বিদ্ধ হবে আকাশের মর্ম্মমূলে—কলুষের বেদনার শূলে।" মানুষের অমর আত্মাও কোনও আকর্ষণে বা লোভে এক স্থানে, এক চিন্তায়, এক আদর্শ বা অনুভূতিতে আবদ্ধ থাকিবার নহে। "দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়" তাহার গতি, এমন কি পার্থিব প্রেম-ও তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। যতক্ষণ এই সনাতন গতির ছন্দে আমাদের জীবন চলিতে থাকে, ততক্ষণই "নাই শোক, নাই ভয়"। "যতক্ষণ স্থির হয়ে থাকি,—ততক্ষণ জমাইয়া রাখি—যত কিছু বস্তুভার", "ততক্ষণ দুঃখের বোঝাই শুধু বেড়ে যায় নূতন নূতন"; আর "যখন চলিয়া যাই সে চলার বেগে—বিশ্বের আঘাত লাগে—আবরণ আপনি যে ছিন্ন হয়,—বেদনার বিচিত্র সঞ্চয়—হতে থাকে ক্ষয়"। সেই সময়েই "তেন ত্যক্তেন

ভূঞ্জীথাঃ” বোধে আমাদের জীবন পূর্ণ ও পবিত্র ; কারণ, বিশ্ব-প্রবাহের অন্তর্ভুক্ত চির-পরিবর্ত্তায়মান বস্তু-বিশেষের প্রতি আসক্তি ও অক্ষম মুষ্টিতে তাহাকে ধরিয়া রাখার প্রয়াস হইতেই পাপের সূচনা, তাহা হইতেই অভাব-বোধের সমুৎপাদ, তাহার জন্যই মৃত্যুভয়। কিন্তু বিষয়াসক্তির গুপ্ত প্রেমের পরবশ না হইয়া ঘরের কোণ ছাড়িয়া যে চলার স্রোতে আত্মসমর্পণ করিতে পারে, তাহার কাছে “মৃত্যু ওঠে প্রাণ হ'য়ে ঝলকে ঝলকে।” মৃত্যু যে সেই চির-চঞ্চল স্রোতের প্রচণ্ডতম তরঙ্গ, তাহাতেই ঢেউ খাওয়া ও ডুব দেওয়াতেই যে অমর আত্মার তীব্রতম পুলক ; “মৃত্যু যে তার পাত্রে বহন করে—অমৃতরস নিত্য তাহার তরে”। “অমৃতের অধিকারের” জন্য আমরা উৎসুক, কিন্তু তাহার স্বরূপ বুঝিতে আমরা ভুল করি।

সে ত নহে সুখ, ওরে, সে নহে বিশ্রাম,
নহে শান্তি, নহে সে আরাম।

মঙ্গলশঙ্খ, দীপালোক ও প্রেয়সীর প্রেমে অমরত্বের প্রকাশ নাই। ত্যাগ হইতে ত্যাগে এবং অবস্থার এক বিপর্য্যয় হইতে অন্য বিপর্য্যয়ে অবাধ ধাওয়া করিয়াই, এবং জীবনকে তুচ্ছ করিয়া মৃত্যুর গহন অন্ধকারে পাড়ি দিয়াই চিরযাত্রী মানব আত্মা * নিজেকে সার্থক করিতে ও অমৃতের আস্বাদ পাইতে পারে, এবং এইভাবেই গতি-তরঙ্গের প্রঘাতে প্রঘাতে চির-রহস্যময়ের প্রত্যক্ষ অনুভব লাভ করিতে পারে।

‘বলাকা’ তীব্র বলিষ্ঠ উদ্যত উচ্ছল প্রাণশক্তির বিজয়-গাথা। এই প্রাণশক্তিকেই কবি যৌবন বলিয়াছেন এবং তাহাকে রাজটীকা দিয়াছেন। তাহারই সবুজ নেশায় সমগ্র ধরণী বিভোর, ঝড়ের মেঘে তাহারই তড়িৎ বিচ্ছুরিত। সে দুরন্ত, প্রচণ্ড, প্রমত্ত ; কিন্তু সে-ই

*এইখানে Browning-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট মিল আছে।

জীবন্ত, প্রমুক্ত, অমর। সে-ই মুক্তির একনিষ্ঠ সাধক ; সুখ, আয়ু ইত্যাদি সে তুচ্ছ জ্ঞান করে ; জীর্ণতার ও মোহের মায়াজাল অক্লেশে সে ছিন্ন ভিন্ন করে। অগ্নি তাহার কবি, সূর্য্য তাহার মিত্র, সে সাগর পারের অক্লান্ত পান্থ, তাহার বাণী ঢেউয়ের পরে বিজয়ডঙ্কা বাজাইয়া মুক্তির সন্ধান ঘোষণা করে।

গীতাঞ্জলি পর্ব্বের দেবতা প্রেমের ঠাকুর,—মাধুর্য্যের, সৌন্দর্য্যের, সঙ্গীতের লীলারসে তাঁহার পরিচয়। 'বলাকা'র দেবতা রুদ্র বিধাতা,—সর্ব্বনাশের মধ্যে তাঁহার পরিচয় মেলে, আরামের শয্যাতল হইতে আমাদের আহ্বান করিয়া তিনি গভীর নিশার ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সাগর-তরঙ্গে তরী ভাসাইবার আদেশ দেন, তাঁহার বিষাণ মধ্যদিনের তপ্ত রৌদ্রে বিক্ষত চরণে পাষাণ পথে অগ্রসর হইতে আহ্বান করে, আমাদের হৃতসর্ব্বস্ব করিয়া এবং আমাদের কোমল বৃত্তি ও সুকুমার আকাঙ্ক্ষা-নিচয় দলিত মথিত করিয়া তিনি নবজীবনের দীক্ষা দেন। কিন্তু বাহ্যতঃ কঠোর হইলেও তিনি অন্তরে স্নেহপরায়ণ, আমাদের দুর্ব্বলতার উপরে তিনি স্নেহ-অশ্রু মোচন করেন, আমার উচ্ছৃঙ্খলতার উপর তিনি সৌন্দর্য্যের স্পর্শ দান করেন। তিনি অনন্ত কাল ধরিয়া অপেক্ষা করিয়া আছেন, মানুষ যখন "নিজের জোরে" "নিজ মর্ত্ত্যসীমা" চূর্ণ করিবে তখনই তাহার অমর মহিমা মানুষকে ধন্য করিবে।

'বলাকা'র এই অপূর্ব্ব উপলব্ধি প্রকাশ পাইয়াছে অভিনব এক ছন্দোবন্ধে। কবি অনুভব করিয়াছেন যে "পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা—আর চলিবে না", পুরানো ছন্দের বাঁধা ছাঁচ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাঁহার এই অভিনব মুক্তিমন্ত্রের রূপায়ণ করা যাইবে না। 'বলাকা'য় তাঁহার কবি-প্রতিভা আবার একটা নূতন ছন্দের সৃষ্টি করিল ; তাহার গতি গরুড়ের ন্যায় উধাও, অবাধ,

অক্লান্ত ; তাহা তানলয়বদ্ধ বীণালাপ নহে, তাহা ঝটিকার ঝঙ্কার। অমিতাক্ষর অসম ছন্দে মিত্রাক্ষর সমাবেশ করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা'য় যে অপরূপ ছন্দোহিল্লোল সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার তুলনা পাওয়া কঠিন। এই জন্য শুধু 'বলাকা'র ছন্দ বলিয়াই তাহাকে নির্দ্দেশ করিয়া ক্ষান্ত হইতে হয়। কর্ম্ম ও সন্ন্যাসের যে অপূর্ব্ব সমন্বয় 'বলাকা'র জীবন-দর্শনে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারই প্রতিফলন হইয়াছে 'বলাকা'র ছন্দে পদ্য ও গদ্য রীতির অপরূপ সম্মিলনে।

অনেক হিসাবেই 'বলাকা' রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্য। ছন্দের অপূর্ব্ব মুক্ত গতি, ভাষার তীক্ষ্ণ দ্যুতি ও সাবলীল প্রবাহ, ভাবের প্রগাঢ়তা—সমস্তই ইহাকে রবীন্দ্র-কাব্য-প্রবাহের শীর্ষে স্থান দিয়াছে। উপলব্ধির দিক্ দিয়াও দেখিতে পাই যে তাঁহার সাধনার কয়েকটি ধারা এইখানে মিলিত হইয়া এক মহাসঙ্গম সৃষ্টি করিয়াছে। জীবনে দুঃখের ও ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা, বিচিত্র অভিজ্ঞতার মূল্য, প্রেমের মাহাত্ম্য, মুক্তির আবশ্যকতা, ঐকান্তিক আদর্শনিষ্ঠা, ভৈরব বৈরাগ্যের গৌরব, এক অলৌকিক গূঢ় সত্তার সহিত নিজের আত্মার সংযোগের উপলব্ধি—ইত্যাদি যত কিছু আদর্শ তিনি জীবনে নানা সময়ে অনুভব করিয়াছেন, তাহা সমস্তই এখানে পূর্ণ প্রকাশ লাভ করিয়া পরস্পরের সমন্বয়ে ঐকতান সৃষ্টি করিয়াছে। 'বলাকা'য় দার্শনিকের গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সহিত কবির নিবিড় হৃদয়াবেগের একত্র মিলন ঘটিয়াছে ; ভাব ও সত্য, কল্পনা ও আবেগ এক হইয়া গিয়াছে।

———

'বলাকা'র মূল ভাবই 'পলাতকা'র কবিতাগুলিতে উদাহৃত হইয়াছে। এই কাহিনীগুলি বাস্তব জীবনের টুকরা লইয়া রচিত হইলেও তাহাতে বাস্তবাতীত অজানার বোধ ও তাহাকে পাওয়ার জন্য মানব চিত্তের একটা অস্ফুট আকাঙ্ক্ষা ঘটনা-পারম্পর্য্যের ফাঁকে ফাঁকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কি ভাবে আমাদের জীবনে এই অজানা "চমকে ঝলকে, দেখা দেয়, মিলায় পলকে" তাহারই দৃষ্টান্ত কবি 'পলাতকা'য় দিয়াছেন। যাহারা মানব সমাজের কৃত্রিম বন্ধন ও প্রবৃত্তির বহিঃস্থ তাহাদের জীবনেই এই অজানার আকর্ষণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল; এই জন্য কবির পোষা হরিণ অবলীলাক্রমেই তাহার প্রিয় সাথী কুকুর ছানার মায়া কাটাইয়া নিরুদ্দেশের আশে উন্মত্ত আবেগে ছুটিয়া বাহির হইল, আঁধারের ডাকে সে আলোক-কে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিল। মানুষের সমাজে, বিশেষতঃ বাঙ্গালী জীবনে, নানাবিধ কৃত্রিম আদর্শ ও বৃত্তির প্রভাব এত বেশী যে তাহাদের মোহ কাটাইয়া মুক্তির সন্ধান করা সাধারণতঃ অত্যন্ত দুরূহ, বাঙ্গালী মেয়ের পক্ষে ত প্রায় অসম্ভব। তবুও কদাচ ইহা সম্ভব হয়। এক ভূয়া আদর্শের প্রতি নিরর্থক নিষ্ঠা ও আত্মবলিদানের মোহ হইতে উদ্ধার পাইল মঞ্জুলিকা যখন তাহার পিতা নির্লজ্জ হৃদয়হীনতা সহকারে বৃদ্ধ বয়সে দার-পরিগ্রহ করিলেন; সমাজনীতি ও আদর্শের প্রতি একান্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়াই সে অজানার উদ্দেশে ঝাঁপ দিল, গৃহত্যাগ করিয়া পুলিনের সহিত সুদূর ফরাক্কাবাদে ঘর পাতিতে গেল। বাঙ্গালীর ঘরে "লক্ষ্মী সতী ভালো মানুষ অতি" বলিয়া যে বধূর সুখ্যাতি ছিল, বাস্তবিক পক্ষে সে ছিল সংসাররূপিনী চামুণ্ডার বলির পশু; সংসার-যন্ত্রে দেহ, মন ও আত্মা নিরন্তর পিষ্ট হওয়ার পর সে মৃত্যুর দ্বারে আসিয়া মুক্তির স্বাদ পাইল; জীবনের ওপারের "বিরাট্ মোহানা"য় "ভাঁড়ার ঘরের দেয়াল যত

একটু ফেনার মত” মিলাইয়া গেল। (কিন্তু কেবল সামাজিক রীতি-নীতি নহে, আমাদের জীবনে বাস্তব সত্য সম্পর্কে যত কিছু ধারণা ও সংস্কার আছে, তাহাও অজ্ঞানতিমিরে আমাদের আত্মাকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে ; তবুও মাঝে মাঝে মনে হয় যে মানব হৃদয়ের গভীরতম অন্তস্তল এবং বিশ্বের অন্তরাত্মার ভিতর হইতে একটা অসহায় ক্রন্দন বাজিয়া উঠিতেছে,) মনে হয় যে অন্ধকাব সোপানপথে ভয়চকিতা বামি-র “হারিয়ে গেছি আমি” এই ত্রস্ত কাতর ভাষা আমাদেরই মর্ম্মের বাণী। এইরূপে নানাভাবে বিরাট্ অজানা আমাদের স্থূল অভিজ্ঞতাব মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে এবং তাহাব সন্ধানই কবি ‘পলাতকা’য় দিয়াছেন।)

‘পলাতকা’ রচনার পর তিন বৎসব গত হইলে ‘শিশু ভোলানাথের” কবিতা কয়েকটি লেখা হয়। ইতোমধ্যে দেশে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের প্রবল বন্যা বহিয়া চলিয়াছে, কবি পুনশ্চ নানা দেশে বিদেশে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার জীবনে ও সংসারে উত্তেজনা ও আন্দোলনের অবধি নাই। কর্মের বন্ধন ও তর্কের জাল হইতে কবিচিত্ত সাময়িক ভাবে মুক্তির স্বাদ পাইল “শিশু ভোলানাথে”র প্রত্যয়ে। আপাতদৃষ্টিতে এই কবিতাগুলিকে রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন শান্ত সায়র বলিয়া মনে হইলেও, আসলে “শিশু ভোলানাথে”র মধ্যেও ‘বলাকা’র আদর্শেরই প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ‘বলাকা’র

যে প্রাণোচ্ছল অনাসক্ত চঞ্চলতার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত সাধারণ মানুষের জীবনে বড় একটা পাওয়া না গেলেও শিশুর জীবনে পাওয়া যায়। সে ভোলানাথের মতই নিরাসক্ত, ভোগের বন্ধনে সে আবদ্ধ নহে। যে খেলনা লইয়া তাহার খেলা, তাহাকেই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সে আনন্দে নৃত্য করে। দারিদ্র্য তাহাকে দীন করে না, ধূলি তাহাকে অশুচি করে না, তাহার অন্তরে সর্ব্বদাই অমৃত ঐশ্বর্য্য বিরাজ করিতেছে। এইরূপে 'বলাকা'র জীবনাদর্শ শিশু ভোলানাথের মধ্যে প্রকট হইয়াছে।

কিন্তু শিশুর জীবনেও একটা রহস্যময় অজানার ডাক আসিয়া মাঝে মাঝে তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে; ভোলানাথেরও নৃত্যচ্ছন্দে তাল কাটিয়া যায়, তপস্যায় বিঘ্ন ঘটে। কখন কখন তাহার মা-কে অবলম্বন করিয়া স্নেহের যে বিরাট রহস্যলোকের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাই অনুধাবন করিতে গিয়া তাহার চমক লাগে; তাহার মা অন্য কাহারও মা হইলেও যে এই স্নেহের প্রভাব হইতে মা ও শিশু কেহই মুক্ত থাকিত না তাহা সে অনুভব করে; বুদ্ধি দিয়া ব্যাখ্যা করিতে না পারিলেও একটা গভীরতর অনুভূতির বলে সে বুঝিতে পারে যে তাহার সহিত তাহার মায়ের সম্বন্ধ একটা চিরন্তন ব্যাপার, "বহুশত জনমের চোখে-চোখে কানে-কানে কথা" কিছুতেই কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। এমন কি তাহার মা পরলোকগমন করিলেও মায়ের সত্তা সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ হইয়া আছে সে অনুভব করিয়া থাকে, এবং এই অনুভূতিই তাহাকে উদাস করিয়া একটা অতি-বাস্তব রহস্যে নিমগ্ন করে। অন্যান্য অভিজ্ঞতার মধ্যেও শিশু এই রহস্যের আভাস কখনও কখনও পায়; ইচ্ছামতী নদীর প্রবাহে, শীতের স্তব্ধ মধ্যাহ্নে এই আভাস সে অনুভব করে। এমন কি মাঝে মাঝে তাহার মা-কেই-

যেন বহুদূরের রহস্যময়ী বলিয়া মনে হয়, শিশুহৃদয় দিয়া কিছুতেই যেন সে মায়ের সীমা পায় না।*

এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায় যে 'শিশু ভোলানাথে'র মধ্যেও 'বলাকা'র বাণী ধ্বনিত হইতেছে; এখানেও কবি পরিবর্ত্তনের চঞ্চল প্রবাহে আত্মসমর্পণ করিতেছেন এবং এক রহস্যলোকের আভাসের মধ্যে মুক্তির সন্ধান পাইতেছেন।

*বাস্তবিক কোন শিশুর মনে এইরূপ ধারণা উদিত হয় কি না, দার্শনিক কবি নিজের সূক্ষ্ম অনুভূতি শিশুর বেনামি-তে চালাইতেছেন কি না,—ইত্যাদি প্রশ্নের আলোচনা এই প্রবন্ধে নিষ্প্রয়োজন।

পঞ্চম যুগ

['পূরবী—শ্যামলী']

(খৃঃ অঃ ১৯২৩-১৯৩৬)

(বয়স ৬২-৭৫)

"মাটির ডাক"

"এই ভালো আজ এ সঙ্গমে কান্নাহাসির গঙ্গা যমুনায়
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।
এই ভালো রে প্রাণের রঙ্গে এই আসঙ্গ সকল অঙ্গে মনে
পুণ্য ধরার ধুলো মাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর সনে।"

'পুরবী' রচনার কাল হইতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনে আর একটা নূতন যুগের আরম্ভ হইল। ইহাই তাঁহার কবিজীবনের পঞ্চম ও উপান্ত যুগ। তাঁহার জীবননাট্যে এই পঞ্চমাঙ্ক আবেদনের দিক্ দিয়া যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনই চমকপ্রদ। এই যুগের সূচনার পূর্ব্বে কয়েক বছর ধরিয়া মনে হইতেছিল যেন রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনের ইতি হইয়াছে, 'পলাতকা' প্রকাশের পর তাঁহার কাব্য-সরস্বতীও অন্তর্ধান করিয়াছেন। কয়েক বছর ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ 'শিশু ভোলানাথে'র কয়েকটি কবিতা ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন কবিতা রচনা করেন নাই; "এখন শুধু গদ্য লিখি, তাও আবার কদাচিৎ",—এই সময়ে তিনি কথিকা, গল্প, প্রবন্ধ কিছু কিছু রচনা করিতেছিলেন, অথবা পুরাতন কয়েকটি রচনাকে নূতন করিয়া নাট্যরূপ দিতেছিলেন।

মনে হইতেছিল যে তাঁহার শেষ কথাটি বলা হইয়া গিয়াছে, 'বলাকা'তেই তাঁহার কবি-প্রতিভার শেষ ও মহত্তম বাণী তিনি জগৎকে শুনাইয়াছেন।

এমন সময়ে একটা অভাবনীয় ব্যাপার তাঁহার কাব্যজীবনে ঘটিল, একটা Indian Summer বা অকাল-বসন্ত দেখা দিল। কোন কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে শোনা যায় যে বার্দ্ধক্যের চরম সীমায় পঁহুছিয়া তাঁহারা পুনরায় যৌবনোচিত কোন কোন লক্ষণ ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। তাহার কারণ কি তাহা নির্ণীত হয় নাই; মোটামুটি বলা যায় যে তাঁহাদের স্বাস্থ্য বরাবরই অক্ষুণ্ণ ছিল, প্রাণশক্তির সম্পদ্ অজস্র লাভ করিয়াও তাহা তাঁহারা অপচয় করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের দেহ ও মন সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায়; অসাধারণ প্রাণশক্তি তাঁহাকে বিধাতা দিয়াছিলেন, এবং তিনি তাঁহার অপব্যয় করেন নাই, উপযুক্ত অনুশীলনে তাহা উপচিত হইয়াছিল। কারণ যাহাই হউক, রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনে যে একটা "শেষ বসন্ত" এই সময় আসিয়াছিল, মনে তারুণ্য ফিরিয়া আসিয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাহা বলিয়াছেন। "তাঁহার যৌবন-বেদনারসে উচ্ছল দিনগুলি" আবার নূতন রূপে দেখা দিল; যে কবি এত দিন ধরিয়া "রুদ্রের ভৈরব গান" গাহিয়া আসিয়াছেন তাঁহার রচনায় দগ্ধ পঞ্চশর পুনর্জীবন লাভ করিল; "এ ধরারে—জীবন-উৎসব-শেষে দুই পায়ে ঠেলে—মৃৎপাত্রের মতো যাও ফেলে" ইহাই যাঁহার আদর্শ ছিল, তাঁহার রচনাতেই "বিপুলা এ পৃথিবীর" "মহা-একতান" প্রধান সত্য হইয়া উঠিল; "অজানার" কবি আজ নিজেকে "পৃথিবীর কবি" বলিয়া পরিচয় দিলেন। কবি এখন আর "শ্মশানের বৈরাগ্য-বিলাসী" নহেন; তিনি "মহেন্দ্রের তপোভঙ্গ-দূত"। "বসন্তের

বন্যাস্রোতে সন্ন্যাসের অবসান" হইল, "সুন্দরের জয়ধ্বনিগানে কবির পরাণে বাঁশি" বাজিয়া উঠিল।

এই যুগের রবীন্দ্রকাব্যে নূতন একটা জীবনাদর্শের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ "মানুষের ধর্ম্ম" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, এবং বিলাতে ও এদেশে দার্শনিক বক্তৃতামালায় তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'সোনাব তবী' রচনার সময় হইতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছিল, তাহা এই সময়ে নূতন একটা জীবনধর্ম্মের মধ্যে বিলীন হইয়াছে। 'সোনার তবী' রচনার সময় হইতে রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ কল্পলোক ও ধ্যানলোকের কবি। মানবজীবন ও পার্থিব জগতের নানা অনুভূতি অবশ্য তাঁহার মধ্য জীবনের কাব্যের সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত হইয়া আছে, কিন্তু তাহা-ই সেই সময়েব রবীন্দ্রকাব্যের মুখ্য প্রতিপাদ্য নহে। "অন্তর মাঝে" ও "জগতের মাঝে" যে দ্যুতি "অযুত আলোকে" কত রূপে ঝলসিয়া উঠিতেছে তাহাব কথাই তিনি এতদিন প্রধানতঃ বলিয়া আসিয়াছেন ; মাতা, কন্যা, বধূ নহে, "নন্দনবাসিনী উর্ব্বশী"ই তাঁহার কবিচিত্তকে প্রবুদ্ধ করিয়াছে ; রমণীকে রমণী হিসাবে তিনি কাব্যে স্থান দেন নাই, যখন সে কবির পাশে ক্ষণকাল আসিয়া তাঁহার চিত্ত "সেই রহস্য আভাসে" ভরিয়া দিয়াছে, তখনই সে রবীন্দ্রকাব্যে আসন পাইয়াছে, "অর্দ্ধেক কল্পনা"য় গঠিত বলিয়াই কবির কাছে তাহার মূল্য। মানবজীবনের যে সমস্ত কথা ও কাহিনী তাঁহার কাব্যে স্থান পাইয়াছে, সেগুলি-ও বাস্তবের চিত্র হিসাবে নহে, এক রহস্যময় সত্তার প্রকটন হিসাবেই কবিকে আকৃষ্ট করিয়াছে। মাঝে মাঝে বাস্তব জগৎ তাঁহার কাছে তাৎপর্য্যময় বলিয়া মনে হইয়াছে, কখন কখন "কিছু কিছু মর্ম্ম তার" যেন বুঝিয়াছেন বলিয়া কবির মনে

হইয়াছে, "আমারে লইয়া যাও—রাখিও না দূরে" বলিয়া তিনি আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সাময়িক উচ্ছ্বাস ও ব্যাকুলতা মাত্র। আসলে রবীন্দ্রনাথ অমৃত-সমান স্বপ্ন-মঙ্গলেরই কবি। জীবন-দেবতা, চিত্রা, বিশ্বদেব, অন্তরযামী, নটরাজ, রুদ্র, ভোলানাথ প্রভৃতি নানা আখ্যায় কবি বিভিন্ন সময়ে যে মহত্তর সত্তার পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার প্রকাশ, তাঁহার আভাস, তাঁহার সন্ধান-ই রবীন্দ্রকাব্যের এতাবৎ বিষয়বস্তু। বাস্তবাতীত একটা অতীন্দ্রিয় সত্তার মহিমা-ই তিনি কীর্ত্তন করিয়া আসিয়াছেন, যদিও বাস্তব জগৎ ও ইন্দ্রিয়কে সেই মহত্তর সত্তার উপলব্ধির সোপান বলিয়াই কবি বিবেচনা করিয়াছেন। সংসারের নানা অভিজ্ঞতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে একটা কল্পলোকের প্রতিধ্বনি তিনি বাজিতে শুনিয়াছেন, তাহাই তিনি কাব্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা হইতে তিনি ফিরিয়া বাস্তব সত্যের অনুসরণ করার ইচ্ছা মাঝে মাঝে প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা করিতে পারেন নাই। চিরদিনই তাঁহার দেবতার পায়েই তিনি অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া আসিয়াছেন, এবং সে-ই দেবতা তাঁহার অন্তর ব্যাপিয়া "জীবন-মরণ হরণ" করিয়া বিরাজ করিয়াছেন। 'বলাকা' পর্ব্বে অবশ্য একটা পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়, কবি তখন দুঃখ মৃত্যু ধ্বংস প্রভৃতি বাস্তব সত্যের সহিত তাঁহার অলৌকিক আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সামঞ্জস্য করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। কিন্তু তখনও কবি সাধারণ মানবের স্তর হইতে বহু ঊর্দ্ধে বিহার করিতেছেন, বাস্তবের ভীম কল্লোল দূর হইতে শ্রবণ করিতেছেন এবং আকাশচারী গরুড়ের ন্যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও অনন্ত আবেগ লইয়া জীবন ও সত্যের পরিক্রমা করিতেছেন। 'বলাকা'তেও কবির "এখনও বিহার কল্প-জগতে।"

কিন্তু এই যুগের কাব্যে দেখিতে পাই যে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর

একটা মৌলিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন আর তিনি বলাকার মত আকাশচারী অজানার সন্ধানী নহেন। মাটির ডাকে আজ তাঁহার উদাসীন আত্মা ঘরের দিকে ফিরিয়াছে "কাছেকে আজ পেলাম কাছে" এই তৃপ্তি তিনি লাভ করিয়াছেন, এতদিন 'নিকট' তাঁহার কাছে সুদূর হইয়াছিল তজ্জন্য ভ্রম স্বীকার করিতেছেন। এখন তিনি সোজাসুজি বুঝিতে পারিয়াছেন যে তিনি "বৈশাখী মেঘ বাঁধন-ছাড়া'র সমজাতীয় নহেন, তিনি মাটির মানুষ, "পথহীন সাগর-পারের পান্থ" বলিলে তাঁহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় না। মানবজীবনের ও মানবহৃদয়ের সহজ সত্যই তাঁহার আশ্রয়। মানবসুলভ অনুভূতির মধ্যেই যে পরম সত্য বিধৃত রহিয়াছে, ইহাই এ যুগে কবির অভিনব উপলব্ধি। 'বলাকা'য় কবি বলিয়াছিলেন "আমার যে শ্রেষ্ঠ ধন সে ত শুধু চমকে ঝলকে, দেখা দেয় মিলায় পুলকে" ; আর এখন কবি বলিতেছেন যে "ধরণীর এক কোণে" "একটুকু বাসা-তে" "কিছু ভালোবাসা" দিয়া যদি জীবনের "ক-দিনের কাঁদা আর হাসা" ভরিয়া তুলিতে পারেন তাহাতেই তাঁহার চরম পরিতৃপ্তি লাভ হইবে। ইহাকেই তিনি মানুষের সত্য ধর্ম্ম বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। "মধুময় পৃথিবীর ধুলি"—এই মহামন্ত্রেই তিনি চরিতার্থ জীবনের শেষ বাণী পাইয়াছেন।

'মানুষের ধর্ম্ম' বা Religion of Man শিরোনাম দিয়া রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতাগুলি দিয়াছিলেন, তাহাতে মানুষ ধর্ম্মের যে প্রত্যয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার একটা বিশিষ্ট রূপ এই পঞ্চম যুগের রবীন্দ্রকাব্যের জীবনাদর্শের মধ্যে পাওয়া যায়। বক্তৃতায় যে মানবধর্ম্মের কথা কবি বলিয়াছেন তাহা রবীন্দ্রকাব্যের কয়েকটি সুপরিচিত উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেখানে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে

মানুষের জৈব প্রকৃতি ছাড়া একটা আত্মিক প্রকৃতি-ও আছে, তাহাতেই মানুষের স্বরূপের যথার্থ প্রকাশ। আত্মিক প্রকৃতির বিকাশের দ্বারাই মানুষ নিজেকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে, সার্থকতা লাভ করিতে এবং "আনন্দীভূত" হইতে পারে। জৈব ও আত্মিক প্রকৃতির মধ্যে বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই, জৈব আত্মিকের পবিপোষক, জৈবের পরিণতি আত্মিকে যেমন তরুর পরিণতি পুষ্পে ও ফলে। জৈব প্রকৃতিকে নিপীড়ন করিয়া কোন আধ্যাত্মিক লাভ সম্ভব নহে, আত্মিকের সহিত সংযুক্ত হইলেই তাহা মনুষ্যত্বের বিকাশের সহায়তা করে। নিবৃত্তি নহে, প্রবৃত্তিই মনুষ্যত্বের সার্থকতার সাধক। অবশ্য প্রবৃত্তির যে কোন প্রকাশ, যে কোন স্পৃহা বা অভিরুচি-ই যে প্রশংসার্হ, জীবনে ত্যাগ সংযম বা আত্মদমনের যে কোন স্থান নাই, তাহা নহে। কিন্তু এই স্থান নির্ণীত হইতে পারে কোন বাহিরের আদর্শ বা নিয়ম অনুসারে নহে, কেবল আত্মার প্রেরণার দ্বারাই তাহার নির্ণয় হইতে পাবে। যে প্রবৃত্তি শ্রেয়ঃ তাহা মহামানবের কল্যাণের সহিত আমাদের যুক্ত করে, সঙ্কীর্ণ স্বার্থ ও অহঙ্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে না ; তাহা বিরোধের পথ ছাড়িয়া মিলনের পথে আমাদের লইয়া যায়, তাহা আমাদের মধ্যে একটা সর্ব্বগত আনন্দের সৃষ্টি করে, আমাদের আত্মিক উপলব্ধিকে স্ফূর্ত্ত ও বিকশিত করে। ত্যাগ বা দমের অর্থ আংশিক আত্মঘাত নহে, তাহার অর্থ পূর্ণতর উপলব্ধির জন্য সার্থকতর পথে প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ। যে আত্মিক প্রকৃতি প্রতি মানুষের মধ্যে রহিয়াছে, তাহার দ্বারাই মানুষে মানুষে মিলনের সূত্র রচিত হইয়াছে। এই অন্তর্নিহিত আত্মিক প্রকৃতি বস্তুতঃ বিশ্ব-আত্মারই বীজ, এবং জীবনের অভিজ্ঞতার তাপে জৈব প্রকৃতির রসেই ইহা অঙ্কুরিত ও বিকশিত হয় এবং মহামানবের কল্যাণের দিকে ইহা

প্রসারিত হইয়া থাকে। এই বিশ্ব-আত্মা-ই বিশ্বদেবতা, ব্যক্তির মধ্যে তাঁহার যে আবির্ভাব তাহাই জীবনদেবতা, এবং এই জীবন-দেবতা-ই আমাদের আত্মিক প্রকৃতির কর্ণধার।

মোটামুটি এই প্রত্যয় রবীন্দ্রকাব্যের সকল যুগেই পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহার রচনায় এক এক যুগে এক এক দিক্ সেই যুগের বিশিষ্ট অনুভূতির আলোকে পরিস্ফুট হইয়াছে। কোন যুগে মানবসুলভ প্রবৃত্তি, আবার কোন যুগে বিশ্বদেবতার উপলব্ধি তাঁহার কাব্যে প্রবল হইয়াছে। পঞ্চম যুগে রবীন্দ্রনাথের কাছে সুস্পষ্ট হইয়াছে **মানব-হৃদয়ের প্রেম-প্রবণতা, বাস্তবের বৈচিত্র্যের মধ্যে অমর্ত্য লোকের ইঙ্গিত, জীবনের যুগ-যুগান্তরের অনুভব ও অভিজ্ঞতার মধ্যে একটা অলক্ষ্য সূত্রের সংযোগ**। তাঁহার দৃষ্টি এখন কল্পনার জগতে নহে, তাঁহার দৃষ্টি এখন বাস্তব পৃথিবীর দিকে। কোন 'ধ্যানের ধন'কে তিনি খুঁজিতেছেন না, 'ধূলির তিলক'-ই তাঁহার কাম্য। জীবনদেবতা বা বিশ্বদেবতার সহিত মনোমিলনের জন্য তিনি উৎসুক নহেন, সাধারণ মানবের "জীবনে জীবন যোগ করা"ই এখন তাঁহার কাছে পরমার্থ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। মানুষের সাধারণ অভিজ্ঞতা, প্রকৃতি এবং পারিপার্শ্বিকের মধ্যে যে সৌন্দর্য্য ও আবেদন রহিয়াছে, তাহাই এখন তাঁহার কাব্যের উপজীব্য। জীর্ণ দীর্ণ দেবতালয়ে দেববিগ্রহ না থাকিলেও তাহা শুধু সৌন্দর্য্যময় পরিবেশের জন্যই এখন কবির কাছে পবিত্র। এখন দেবতা নহে, মানব-ই তাঁহার কাছে সত্য; স্বর্গের অমৃত নহে, পৃথিবীর মধুই তাঁহার কাম্য।'

এই প্রসঙ্গে 'কল্পনা' হইতে 'নৈবেদ্য' পর্য্যন্ত কাব্যগুলির সহিত এই যুগের কাব্যের একটা তুলনা করা যাইতে পারে। সে সময়েও কবি বাস্তব সত্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছিলেন। কিন্তু 'কল্পনা', 'কথা ও

কাহিনী' প্রভৃতিতে কবি আদর্শনিষ্ঠ, জীবনের ঊর্দ্ধে অবস্থিত একটা মহত্তর শক্তির স্পর্শ লাভের জন্য উন্মুখ; **পঞ্চম যুগে** কবি বাস্তব-জীবনের বৈচিত্র্যকেই সত্য বলিয়া জানিয়াছেন, **কোন বাস্তবাতীত সত্তার কল্পনা তাঁহার মনকে উদ্বুদ্ধ করে নাই**। 'ক্ষণিকা'তে কবি "সত্যরে লও সহজে" এ কথা বলিলেও জীবনের বিচিত্র সত্যকে জানিবার ও গ্রহণ করিবার কথা সেখানে নাই, সাংসারিকতার প্রতি একেবারে বিমুখ হইয়া শিশির-বিন্দুর মত "শিথিল-বাঁধন" হইয়া অকারণ পুলকে স্পন্দিত হইবার উপদেশ আছে; এখানে কিন্তু "বিপুলা এ ধরণী"কে জানিবার ও তাহার জীবনের সহিত জীবন যোগ করিবার কথাই রহিয়াছে। "নৈবেদ্যে" যে কর্ম্মযোগের কথা বলা হইয়াছে তাহা ঈশ্বরোপলব্ধির-ই একটা উপায়; **এই যুগের জীবনাদর্শের মধ্যে কিন্তু কোন ঐশী সাধনার প্রেরণা নাই,** মহা-মানবের সহিত এক হইয়া নিবিড়ভাবে পৃথিবী-কে অনুভব করা ও মানব-জীবনের রস গ্রহণ করাই কবির কাছে এখন স্বধর্ম্ম।*

* পাশ্চাত্ত্য নানা মহাদেশে পরিভ্রমণ, সেখানকার জীবনাদর্শের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়, আধুনিক য়ুরোপের চিন্তাধারা এই যুগে রবীন্দ্রনাথকে কতটা প্রভাবিত করিয়াছিল, তাহা আলোচনার বিষয়।

চতুর্দ্দশ পর্ব্ব (ভাব)

['পূরবী']

"শেষ বসন্ত"

"আজ যেন পায় নয়ন আপন
নতুন জাগা।
আজ আসে দিন প্রথম দেখার
দোলন লাগা।
এই ভুবনের একটি অসীম কোণ
যুগল প্রাণের গোপন পদ্মাসন,
সেথায় আমায় ডাক দিয়ে যায়
নাই জানা কে,
সাগরপারের পান্থ পাখীর
ডানার ডাকে॥"

যে অভিনব উপলব্ধির পরিচয় এই পঞ্চম যুগের কাব্যে পাওয়া যায়, তাহার তিনটি বিভিন্ন প্রকাশ দেখা যায় পর পর তিনটি পর্ব্বে। প্রথম পর্ব্ব 'পূরবী', 'প্রবাহিনী', 'সুন্দর', 'গীতমালিকা' (১ম) রচনার কাল অর্থাৎ খৃঃ অঃ ১৯২৩ হইতে ১৯২৫ পর্য্যন্ত কয়েকটি বৎসর।

এই প্রথম পর্ব্বে কবির নবোপলব্ধ মানুষ-ধর্ম্ম প্রধানতঃ একটা রোম্যান্টিক আবেগ-বিহ্বলতার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই রোম্যান্টিক আবেগ মানবপ্রেম ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যে সুন্দর আমাদের চারিদিকে প্রকৃতির রূপ, রস

ও গন্ধের মধ্যে এবং মানবহৃদয়ের প্রণয়বৃত্তির মধ্যে বিধৃত রহিয়াছে, তাহারই জয়গান কবি এখন করিতেছেন। যে ভোলানাথকে পূর্ব্বে কবি দেখিয়াছিলেন ত্যাগ ও ধ্বংসের দেবতারূপে, সেই ভোলানাথ এখন "সুন্দরের হাতে একান্ত পরাভব আনন্দে" যাচ্ঞা করিতেছেন। মদনভস্মে নহে, উমামিলনেই কবি দেবাদিদেবের সত্য পরিচয় পাইতেছেন। তাঁহার তপস্যাব উদ্দেশ্য মাত্র কৃচ্ছ সাধনা নহে, "জ্যোতির্ম্ময় পাত্রটি সুধার" সন্ধান-ই তাঁহার লক্ষ্য; তপোভঙ্গেই তপস্যার পরিণতি ও সার্থকতা। এই ভাবে কবি নব উপলব্ধির সহিত তাঁহার পুর্ব্বতন আদর্শের সামঞ্জস্য কবিবার প্রয়াস করিয়াছেন।

এই পর্ব্বের প্রথম কাব্য 'পূরবী'তেই এই প্রয়াস বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। 'সাবিত্রী' প্রভৃতি প্রথম দিকের কয়েকটি কবিতায় 'বলাকা' পর্ব্বের প্রভাব বর্ত্তমান; পক্ষান্তরে 'শেষ বসন্ত' প্রভৃতি শেষের দিকের কবিতায় এই পর্ব্বের নূতনতর ভাব ও আবেগের পুরাপুরি প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মাঝেকার 'আহ্বান,' 'ক্ষণিকা, 'লীলাসঙ্গিনী' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতায় পূর্ব্বতন ও নূতন উপলব্ধির সামঞ্জস্য করার চেষ্টা আছে; কবি এখন 'লীলাসঙ্গিনী'র সহিত 'গোপনরঙ্গিনী'র অভেদ অনুভব করিতেছেন, অমাবস্যার আঁধারের মধ্যেই আলোকের উৎস আবিষ্কার করিতেছেন, জন্মমৃত্যুর আঁধার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কল্যাণী নারীর আহ্বানে আত্মাকে উপলব্ধি করিতেছেন। সমন্বয়ের যে ক্ষমতা রবীন্দ্রপ্রতিভার অন্যতম লক্ষণ 'পূরবী'তে তাহার যথেষ্ট পরিচয় আছে; এখানে কবির কণ্ঠে যে "শেষ রাগিনীর বীণ্" বাজিয়াছে তাহাতে 'বলাকা'র "ঝড়ের ঝঙ্কার" না থাকিলেও মানবতার একটা সুগভীর আবেদন ও জীবনের বিভিন্ন প্রবৃত্তির সামঞ্জস্যের প্রশান্তি আছে।

এই সময়কার কাব্যের আঙ্গিক-ও উল্লেখযোগ্য। 'বলাকা', 'পলাতকা'র অসম ও অমিতাক্ষর ছন্দ যেন আপাততঃ ত্যাগ করিয়া কবি ফিরিয়া গিয়াছেন সুষম ও সম্মিত ছন্দের যুগে। নানা শোভন স্তবক ও সুঠাম চরণ পুনরায় তাঁহার কাব্যের বাহন হইয়াছে। কখনও ঝঙ্কারে, কখনও মন্ত্রে, কখনও ক্বণনে তাঁহার কাব্য এখন মুখরিত। যে পুলক-হিল্লোলে এখন কবির চিত্ত আন্দোলিত তাহাই এই সময়কার ও পরবর্ত্তী পর্ব্বের ললিত-গীত-কলিত কল্লোলে ব্যক্ত হইয়াছে।

পঞ্চদশ পর্ব্ব

(মহাভাব)

[মহুয়া—পরিশেষ]

(খৃঃ অঃ ১৯২৬-১৯৩১)

(বয়স ৬৫-৭০)

'পূরবী' পর্ব্বে রবীন্দ্রকাব্যে যে "শেষ বসন্তে"র সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহারই পরিণত রূপ দেখা যায় পরবর্ত্তী পর্ব্বে। এই সময়ে পুনশ্চ নূতন একটা মহাভাবের উপলব্ধির প্রকাশ হয়, কবি প্রজ্ঞানচক্ষু দিয়া জীবন ও পৃথিবীকে দর্শন করেন। এই সময়ের রচিত কবিতাগুলি সঙ্কলিত হইয়াছে 'মহুয়া', 'বনবাণী', 'বিচিত্রিতা' ও 'পরিশেষ' এই কয়েকটি কাব্যগ্রন্থে। 'বীথিকা'র কবিতাগুলিতেও এই পর্ব্বের বিশিষ্ট অনুভূতি ব্যক্ত হইয়াছে।

এই সময়ে কবিচিত্তে যে নূতন উপলব্ধি জাগ্রত হইয়াছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায় কাব্য ছাড়াও অন্যান্য সৃষ্টিকর্ম্মে। এই সময়ে তাঁহার রসসত্তার বিস্ময়কর সৃষ্টি—রবীন্দ্রচিত্রকলার সাধনা আরম্ভ হয়। বিদেশে নানা স্থানে তাঁহার চিত্রের প্রদর্শনী হয় এবং শিল্পি-সমাজে তাহার বিশেষ সমাদর হয়। এই সময়ে তিনি যে সমস্ত গান, উপন্যাস ('যোগাযোগ' ও 'শেষের কবিতা'), নাটক ('তপতী') ও গীতিনাট্য ('ঋতুরঙ্গ', 'নবীন' ও 'নটীর পূজা') রচনা করেন, তাহাতেও তাঁহার রসসত্তার সময়োচিত অনুরূপ গুণ দেখা যায়। এই পর্ব্বেই কবি বারংবার বিদেশে ভ্রমণ করেন, আধুনিক জগতের ভাব, চিন্তা ও

জীবনধারার সহিত সুপরিচিত হন, সর্ব্বদেশে তাঁহার খ্যাতি প্রসারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার Hibbert বক্তৃতামালাতে তিনি তাঁহার নব জীবনবেদ ব্যক্ত করেন।

এই পর্ব্বের মর্ম্মবাণী—"জীবনের হেরিনু মহিমা"।

"আলোকিত ভুবনের মুখপানে চেয়ে নির্নিমেষ
বিস্ময়ের পাই নাই শেষ।...
লভিয়াছি জীবলোকে মানবজন্মের অধিকার,
ধন্য এই সৌভাগ্য আমার।"

"ধন্য আমি" এই মহাভাবই নানা ভাবে এই পর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই পর্ব্বের প্রধান কাব্য 'মহুয়া' মানব-প্রণয়ের জয়গাথা, এবং এখানেই নূতন উপলব্ধির উল্লাস সম্পূর্ণরূপে স্ফূর্ত্ত হইয়াছে। মানব-প্রেমের মধ্যেই এখন যেন কবি জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পাইতেছেন। জীবনের পথ দুর্গম ও মরুপথের ন্যায় তপ্ত হইলেও পরস্পরের হৃদয়ের ও মনের ঐকান্তিক সহযোগের বলে প্রণয়ি-যুগলের পক্ষে তাহা হাস্যমুখে সহ্য করা সম্ভব; তাহারা পরস্পরকে যখন পূর্ণ-ভাবে হৃদয় দিয়া চিনিতে ও জানিতে পারে, তখন জগতের রূপ বদলাইয়া যায়, সংসারের মরীচিকার পশ্চাতে ধাবিত হওয়ার কোন প্রবৃত্তি থাকে না, নানা রঙীন মিথ্যার কাচ দিয়া মন ভুলাইবার আবশ্যকতা থাকে না। 'তুমি আছ, আমি আছি'—এই মহীয়সী বাণীর মন্ত্রশক্তির প্রভাবে আত্মা সঞ্জীবিত হয়, অপূর্ব্ব গৌরবে চিত্ত ভরিয়া উঠে, প্রাণ দুর্দ্দম বেগে দুঃসহতম কাজে অগ্রসর হয়, রুক্ষ দিনের দুঃখেও শান্তি বা সান্ত্বনার জন্য কাতরতা কিংবা ভাগ্যের পায়ে ভিক্ষুকতা করার প্রবৃত্তি থাকে না, এমন কি মৃত্যুর মুখে দাঁড়াইয়াও কোন দুর্ব্বলতা বোধ

হয় না। এই প্রেম 'অভীঃ' মন্ত্রে আমাদের দীক্ষিত করে, জীবন-সত্যকে গ্রহণ করিবার উপযুক্ত দৃষ্টি ও শক্তি দেয়; এই প্রেম পঞ্চশরের বেদনা-মাধুরী দিয়া বাসর-রাত্রি রচনার লোভ করে না, মুগ্ধ ললিত অশ্রু-গলিত গীতের উপাদান দিয়া ধরণীতে স্বর্গ-খেলনা গড়িবার চেষ্টা করে না। এ প্রেম বলিষ্ঠ ও সাহসিক; সাধারণ প্রেমের ন্যায় ভীরু, দুর্ব্বল ও কম্প্রবক্ষ নহে; ইহা স্পষ্টদর্শী, সামান্য প্রণয়ের ন্যায় অন্ধ নহে। এ প্রেম বন্ধন নহে, ইহা মুক্ত প্রাণের "বন্ধনহীন গ্রন্থি"। ইহা বিরহে ক্ষীণ নহে, ইহা বিচ্ছেদের মধ্যেও পূর্ণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠ। ইহার নায়িকা মানস-সুন্দরী নহে, আত্মার লীলাসঙ্গিনী; ইহা "নিষ্ফল কামনা" নহে, ইহা "বিপুল বিশ্বাস।" পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যে প্রেমের কথা রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, তাহা এক প্রকারের মোহ অথবা কল্পনা; 'স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু'—এই জাতীয় একটা উপলব্ধি তাহার সহিত জড়িত আছে; তাহা "আপন মনের মাধুরী"-র অথবা "ধ্যানের ধনের" জন্য একটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত আকর্ষণ। কিন্তু 'মহুয়ার' প্রেম সত্য পরিচয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত; "স্বপনে দোঁহে ছিনু কি মোহে"—এই জাতীয় মধুর কল্পনা-বিলাসের সহিত তাহার সম্পর্ক নাই। প্রেমের এই নবীন অনুভূতির সহিত বিজড়িত হইয়াছে নারীর ব্যক্তিত্ব ও স্থান সম্পর্কে নূতন ধারণা। নারী অবলা, কোমলা রমণী, কেবল মাত্র প্রীতি, সেবা, মাধুর্য্য ও মঙ্গল-স্পর্শেই তাহার পরিচয়, এই সনাতন প্রত্যয় নারীর স্বাধীন সত্তা ও ব্যক্তিত্বের প্রতি অপমানসূচক। নারী-কে দেবী, কল্যাণী, শ্রী ও হ্রী রূপে কল্পনার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে নারীর প্রতি একটা করুণা ও একটা হীনতার আরোপ। নারী সবলা, সংসারে আপনার ভাগ্য সে নিজেই জয় করিতে পারে, "বধূবেশে বাসরকক্ষে" যাওয়াই তাহার একমাত্র পথ নহে। পুরুষের প্রেমের

কাঙাল হওয়া তাহার পক্ষে অগৌরব, "বীরহস্তে বরমাল্য" লইয়া "মাথার গুণ্ঠন খুলি" বাঞ্ছিতকে সে স্বেচ্ছায় বরণ করিবে। তাহার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ইত্যাদি অলঙ্কারের জন্য নহে, তাহার অনির্ব্বচনীয় আত্মিক মহত্ত্বের জন্যই সে তাহার দয়িতের প্রেম ও শ্রদ্ধার পাত্রী হইবে। "আলো দিয়ে জ্বেলেছিনু আলো"—ইহাই হইবে তাহার শ্রেষ্ঠ গৌরব।

নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রেম সম্বন্ধে যে আদর্শ 'মহুয়া'য় প্রকাশ লাভ করিয়াছে, তাহাতে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য আদর্শ ও Meredith প্রভৃতি কবির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু যে ভাবে রবীন্দ্রনাথ এই প্রেমের সহিত নিসর্গ-সৌন্দর্য্যের অনুভূতির সংযোগ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কবি-প্রতিভার স্বকীয়তা পরিস্ফুট হইয়াছে। যে প্রাণের পরিচয়, যে রোম্যান্টিক আবেগ কবি মানব-প্রেমের মধ্যে লক্ষ্য করিতেছেন, তাহা নিসর্গের লীলা-র মধ্যেও তিনি দেখিতেছেন। ইহা সমাসোক্তি বা Pathetic Fallacy মাত্র নহে। মানুষের জীবন এবং দিগ্‌দিগন্তব্যাপী নিসর্গের মধ্যে তিনি একই প্রাণশক্তির লীলা দেখিতে পাইতেছেন। এই প্রাণশক্তি "মৃত্তিকার বীর সন্তান" বৃক্ষেও যেমন, সুকোমল নীলমণি-লতাতেও তেমনি প্রকট হইতেছে। * বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে চলিতেছে একটা অনন্ত লীলা—নটরাজের নৃত্য। প্রতিটি লতায়, পাতায়, ফুলে একটা প্রাণশক্তি স্পন্দিত হইতেছে,

* এইখানে স্মরণ রাখা দরকার যে রবীন্দ্রনাথের কাছে বৃক্ষ লতা ইত্যাদি প্রাণবান্ বলিয়া প্রতীত হইলেও তাহাদের লইয়া একটা সামগ্রিক পৃথক সত্ত্বার প্রত্যয় তাঁহার এ সময়ে ছিল না। সেই হিসাবে তাঁহার উপলব্ধি Wordsworth, Meredith প্রভৃতির উপলব্ধি হইতে বিভিন্ন। Nature একদিকে ও Man অন্যদিকে এরূপ ধারণা তাঁহার কিংবা ভারতীয় ঋষিদের ছিল না। বরং Shelley-র সহিত রবীন্দ্রনাথের ধারণা অনেকটা মেলে।

সকলে মিলিয়া এক বিশ্বব্যাপী আনন্দ-ঘন জীবনের ছন্দ গড়িয়া তুলিতেছে। দেহে মনে সেই ছন্দে যোগদান করিতে পারিলে মানব-আত্মার মুক্তানন্দলাভ হয়। এই ভাবে বাস্তবের সৌন্দর্য্যই এখন তাঁহার কাছে জীবনসত্যের উৎস রূপে প্রতিভাত হইতেছে।

ষোড়শ পর্ব্ব (ভাবাভাব)

(পরিশেষ* ; পুনশ্চ—শ্যামলী)

(খৃঃ অঃ ১৯৩১—১৯৩৬)

(বয়স—৭০-৭৫)

"হে মানব, তোমার মন্দিরে
দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে
আরতির সান্ধ্যক্ষণে ; একের চরণে রাখিলাম
বিচিত্রের নর্মবাঁশি,—এই মোর রহিল প্রণাম।"

সপ্ততি-বর্ষ-পূর্ত্তির পর রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনে আর এক পর্ব্বের সূচনা হইল। এই সময়ে কবিচিত্ত আশ্চর্য্যরূপে নব নব ভাব ও শিল্প-কলায় আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। ইহার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই কবি চিত্রকলার চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং এই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিভার মৌলিক শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। এখন কাব্যেও তিনি নিজস্ব একটা নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করিলেন; কাব্যের ভাবের দিক্ দিয়াও যেমন একটা নূতনত্বের সন্ধান দিলেন, আঙ্গিকের দিক্ দিয়াও তেমনি একটা অভিনব রীতির প্রচলন করিলেন। এই বয়সেও তাঁহার নব-নব-উন্মেষশালিনী প্রতিভার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা সত্যই বিস্ময়কর।

মোটামুটি ১৯৩১।৩২ হইতে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই পর্ব্বের ব্যাপ্তি, এ কথা বলা যাইতে পারে। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ 'পুনশ্চ',

---

* 'পরিশেষ' যুগসন্ধির কাব্য

'বীথিকা', 'শেষ সপ্তক', 'পত্রপুট', 'শ্যামলী' প্রভৃতি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই পর্ব্বের বিশিষ্ট ভাব পূর্ব্বরচিত 'পরিশেষে'র কয়েকটি কবিতায় এবং পরবর্ত্তী কালের 'নবজাতক', 'আকাশ-প্রদীপ', 'সানাই'-র কয়েকটি কবিতাতেও * পাওয়া যায়। তবে রচনাকালের হিসাবে 'বীথিকা' কাব্যখানি এই পর্ব্বের মধ্যে পড়িলেও তাহাতে এই সময়কার বিশিষ্ট অনুভূতি ও প্রকাশভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় না; 'বীথিকা'র কবিতাগুলি পূর্ব্বতন অর্থাৎ 'মহুয়া' পর্ব্বের ঝঙ্কারের রেশ। যে 'শেষ বসন্ত' কবির জীবনে আসিয়াছিল, তাহারই পুষ্পবীথির কয়েকটি অবশিষ্ট কুসুম লইয়া 'বীথিকা'র মাল্য গ্রথিত হইয়াছে।

এই পর্ব্বে 'পূরবী-মহুয়া'র নূতন দৃষ্টি বিস্তৃততর পরিসরের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়াছে। তাহার ফলে পুনশ্চ একটা ভাবাভাবের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিতেছে। যে জীবন-সত্যের আহ্বানে কবি ধ্যানলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার পরিধি এতদিন সীমাবদ্ধ ছিল মানবপ্রেম ও নিসর্গ-লীলার মধ্যে। এখন তাহা প্রসারিত হইয়া মানবজীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার সহিত সমবিস্তার হইয়াছে। 'পূরবী'র কবি অন্তর্মুখ, আবেগ-বিহ্বল ও উচ্ছ্বাস-প্রবণ। 'মহুয়া'র কবি আত্মস্থ, রসসিদ্ধ, অভাবনীয়ের কিরণে তাঁহার মনপ্রাণ দীপ্ত। এখন কিন্তু কবির দৃষ্টি-কোণের ও মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিনি এখন বহির্মুখ, বাস্তব সত্যের দার্শনিক। এই পর্ব্বেই যথার্থ realism বা বাস্তবতা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রকট হইয়াছে। "ধরিত্রী"র যে "মহা-একতান" "দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী"তে অহরহ ধ্বনিত হইতেছে, তাহাই এবার কবি তাঁহার কুড়াইয়া-পাওয়া "বিচিত্রের নর্মবাঁশি"তে বাজাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। "নিখিলের অনুভূতি" কবির "সঙ্গীত-সাধনা-মাঝে

* যথা, 'এপারে ওপারে', 'ইস্‌টেশন' (নবজাতক), 'অপঘাত' (সানাই)

"আপন আকৃতি" ব্যক্ত করিয়াছে। কিন্তু এই অভিব্যক্তির মধ্যে কোন প্রচারের উদ্দেশ্য নাই। বাস্তবতার নামে অনেকে কোন কোন অর্ব্বাচীন মতবাদ ও তাহার বিজ্ঞাপন চালাইতে চেষ্টা করেন। ইহা প্রকৃত বাস্তবতা নহে; সুবিস্তৃত ও সুগভীর জীবন-সত্যের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণতি বা তৎসম্বন্ধে যথার্থ জিজ্ঞাসা-র পরিচয় তাহাতে নাই। প্রকৃত বাস্তববাদী দলীয় মতবাদের সঙ্কীর্ণতার অনেক উর্দ্ধে অবস্থান করিয়া থাকেন; তিনি প্রচারক নহেন, তিনি জিজ্ঞাসু; তিনি একদেশদর্শী কিংবা স্থূলদৃষ্টি নহেন, তিনি যেমন সমদর্শী তেমনই সূক্ষ্মদর্শী। তিনি কোন লোকধর্ম্মের পুরোহিত নহেন, তিনি জীবন-সত্যের দ্রষ্টা। সেই হিসাবে তিান ঋষি বা দার্শনিক। বর্ত্তমান পর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ-ও এই অর্থে বাস্তব সত্যের দার্শনিক। তিনি যে মানুষের "সব চেয়ে দুর্গম" "অন্তরালে" দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াছেন এবং সেখানে অপূর্ব্বপরিচিত, ব্যাখ্যার অতীত, বিচিত্র সত্যের ইঙ্গিত পাইয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার সার্থকতা—এই কথাই কবি এখন অনুভব করিতেছেন। কোন অতিবাস্তব সত্তা বা সৌন্দর্য্য, কোনও জীবনদেবতা বা বিশ্বদেব এখন আর কবির প্রতিপাদ্য নহে, 'চিত্রা'-'নৈবেদ্য'-'গীতাঞ্জলি'-'বলাকা'র উপলব্ধি কবি এখন পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছেন। বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতিই এখন কবির প্রেরণার উৎস। এইবার বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া কবি উপলব্ধি করিয়াছেন, "অতি বৃহৎ বিশ্ব / অম্লান তার মহিমা,/অক্ষুব্ধ তার প্রকৃতি ;/…আমার সে নয়/, সে অসংখ্যের/ বাজে তার ভেরী সকল দিকে,/জ্বলে অনিভৃত আলো,/ দোলে পতাকা মহাকাশে।" তাহার "অর্থ কিছু" বুঝিবার কোন ক্ষমতা তাঁহার নাই, তাহার কোন ব্যাখ্যা বা অপব্যাখ্যা করার মত কোন ধৃষ্টতাও তাঁহার নাই, নিজের কোন কল্পনা বা আদর্শ তাহার উপর আরোপ করিবার

প্রবৃত্তি তাঁহার নাই। তিনি এখন মানুষের কবি ; মানুষের "পুলকে-বিষাদে-মেশা" দিনগুলি-ই এখন তাঁহার কাছে সত্য। মানুষের "চেতনাসিন্ধু-র ক্ষুব্ধ তরঙ্গের মৃদঙ্গগর্জ্জন" ধ্বনিয়া উঠিতেছে, "উন্মুখর অট্টহাস্য সনে অতল অশ্রুর লীলা" মিলিয়া কলরল-রোল রণিয়া উঠিতেছে, "ছায়া রৌদ্র সে দোলায়—অশ্রান্ত উল্লোলে" তুলিতেছে। কবি তাহারই রুদ্রতালে গান বাঁধিতেছেন, "অনন্তের আনন্দবেদনা" অনুভব করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে প্রসারিত "চিত্রকরের বিশ্ব-ভুবনখানি" তিনি চরম সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন, "দু'বেলা সেই এ সংসারের চলতি ছবি" দেখাতেই এখন তাঁহার পরিতৃপ্তি। সেই সব ছবির মধ্যে কবি দেখিতেছেন একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব, ব্যাখ্যার অতীত ব্যঞ্জনা। নব নব জিজ্ঞাসা, নব নব বিস্ময় তাঁহার মনে জাগিতেছে। দয়াময় ভগবান্‌কে কবি প্রশ্ন করিতেছেন

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি ভেসেছ ভালো।

ইহার হ্যাঁ বা না কোনও উত্তর এখন তাঁহার দেওয়ার ক্ষমতা নাই।* পূজোর ছুটির প্রারম্ভে "কাশের ঝালর-দোলা শরতের শান্ত আকাশে" যখন "শহরের দাদন-দেওয়া দড়ি-বাঁধা ছাগল-ছানার নিষ্ফল কান্নার স্বর" ছড়াইয়া পড়ে, তখন তাহার মধ্যে একটা দুর্লক্ষ্য সঙ্গতির আভাস কবি পাইয়া থাকেন কিন্তু তাহার ব্যাখ্যা কবির বুদ্ধির অতীত। নারীপ্রেমবঞ্চিত পঁচিশ টাকা মাহিনার কেরাণী, প্রণয়-দ্বন্দ্বে পরাজিত কুরূপা তরুণী, একটা দুরন্ত লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, পিতৃবিরহে মুমূর্ষু বালিকা ইত্যাদি অতি সাধারণ নরনারীর মনোজগৎ কবির কাছে একটা অনাবিষ্কৃত বিরাট্ মহাদেশের ন্যায় রহস্যময় বলিয়া মনে

* ইহার সহিত 'বলাকা'র ১১ সংখ্যক কবিতা—'হে মোর সুন্দর'—তুলনীয়।

হইতেছে। অদৃষ্টের যে পরিহাসে ব্যর্থ প্রেমিকের প্রণয় নিবেদনের জন্য সমাহৃত পুষ্প পরিচারিকার কর্ণভূষণ হয়, কিংবা ভাগ্যের যে নিষ্ঠুরতায় পাড়ার নিরীহ কালো মেয়েটির জীবন ও যৌবন দলিত ও পিষ্ট হয় এবং "শাস্ত্রমানা আস্তিকতা" ধূলায় উড়িয়া যায়, তাহার গূঢ় তাৎপর্য্য-ও কবির বোধাতীত। কেবল মানবজীবন নয়, বাস্তব জগতের পৃথিবী, চন্দ্র, শুক্রগ্রহ প্রভৃতি অতি স্থূল ও অতি বিরাট্ পদার্থের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে গেলেও একটা অজ্ঞেয় সত্যের আভাস পাওয়া যায়। মানবসমাজের যুগযুগান্তরব্যাপী জীবনযাত্রার ইতিহাস, কিংবা ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশের ধারা অনুধাবন করিলেও একটা বচনাতীত অজ্ঞাত রহস্যের ব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠে। এই ভাবে "মন্থর তরী"র ন্যায় বাস্তবজীবন "নিরুদ্দেশে স্বপ্নেতে বোঝাই" হইয়া চলিয়াছে। সে স্বপ্ন কবিরও স্বপ্নাতীত; তাহার উৎস কবির বিশ্বাস বা কল্পনা নহে, বাস্তবের মহান্ বৈচিত্র্য।

নিজস্ব আদর্শ ও কল্পনা পরিহার করিয়া একান্তভাবে বাস্তব বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রেরণালাভের প্রয়াস এই সময়ের কাব্যের রূপ ও রীতি-কেও প্রভাবিত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই সময়েই বাংলা গদ্য-কবিতার সৃষ্টি করিয়া বাংলা কাব্যের ইতিহাসে একটা যুগান্তর আনয়ন করিলেন। কবির কাছে এখন কোন পদ্যছন্দ, এমন কি 'বলাকা'র ছন্দ-ও, তাঁহার নূতন অনুভূতির যোগ্য প্রকাশ মনে হইতেছে না। কারণ পদ্য মানেই এক প্রকার pattern বা রূপ-কল্পের অনুকরণ, অর্থাৎ কোন আদর্শের অনুসরণ। কবি এবার স্বকপোলকল্পিত সব আদর্শের সহিত সম্বন্ধ চুকাইয়া দিয়াছেন, ধরিত্রীর বস্তু-বৈচিত্র্যের প্রতি নয়নপাত করিয়া তাহার অনির্ব্বচনীয় ও ধারণাতীত মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া রহিযাছেন। এই জন্যই গদ্য কবিতাই

এখন হইয়াছে তাঁহার কাব্য-সরস্বতীর বাহন। আজ আর "ফুল-বাগানের ফুলগুলিকে" তোড়ায় বাঁধিবার কোন প্রয়াস তাঁহার নাই, "গাছের ফুলে ডালে-পালায় সব মিলিয়ে" যাহা পাওয়া যায় তাহাই তিনি চান। এই জন্য তাঁহার কাব্য এখন গদ্যের স্বভাবোক্তি-কে অবলম্বন করিয়া লইয়াছে। এইরূপে ভাব ও ছন্দের সঙ্গতি এই পর্ব্বের কাব্যে একটা ঐকতান সৃষ্টি করিয়াছে।

অন্তিম যুগ

['প্রান্তিক'—'শেষ লেখা']

(খৃঃ অঃ ১৯৩৮-১৯৪১)

(বয়স ৭৭-৮০)

"নিকটের দুঃখদ্বন্দ্ব, নিকটের অপূর্ণতা তাই
সব ভুলে যাই ;
মন যেন ফিরে
সেই অলক্ষ্যের তীরে তীরে"

রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের শেষ যুগ আরম্ভ হয় তাঁহার সপ্ত সপ্ততি বর্ষ বয়সে। মোটামুটি বলিতে গেলে ১৯৩৮ হইতে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত কবিতাগুলি এই যুগের মধ্যে পড়ে। 'প্রান্তিক' কাব্যে এই পর্ব্বের নূতন সুরটি প্রথম ধরা পড়ে। জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছিয়া কবি যেন নূতন একটা অনুভূতির স্পর্শ লাভ করিতেছেন, তাঁহার যেন নূতন একটা উপলব্ধির জগতে পুনর্জন্ম হইতেছে। 'প্রান্তিক' কাব্যের সবগুলি কবিতায় এই নূতন অনুভবের প্রকাশ হইয়াছে। 'সেঁজুতি' হইতে 'জন্মদিনে'র প্রায় সমস্ত কবিতায় এবং 'রোগশয্যা'য়, 'আরোগ্য,' ও 'শেষ লেখা'-র সব কয়টি কবিতাতেই এই শেষ রাগিণী ধ্বনিত হইতেছে।

এই সময়ে দেখিতে পাই যে চিরাভ্যস্ত রীতিতে আবার একটা নব ভাব রবীন্দ্রকাব্যে ফুটিয়া উঠিতেছে, পূর্ব্বতন পর্ব্বের ভাবাভাবের বিরোধী একটা প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। যে বাস্তব-বৈচিত্র্য

পূর্ব্বে কবি-প্রেরণার একমাত্র উৎস ও জীবন-সত্যের একমাত্র অকৃত্রিম প্রকাশ বলিয়া তাঁহার কাছে প্রতীত হইয়াছিল, যাহার সহিত তুলনায় তাঁহার প্রাক্তন কবিকর্ম্ম "শৌখীন মজতুরি" বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন, তাহাকে ছাপাইয়া আর একটা বোধ ক্রমে ক্রমে তাঁহার মনে ফুটিয়া উঠিতেছে। মৃত্যুর সান্নিধ্য এবং এই সময়ের বারংবার গুরুতর পীড়া ও তজ্জনিত অর্দ্ধচেতন অবস্থার সহিত বিজড়িত বিশিষ্ট মানসিক অনুভূতি সম্ভবতঃ এই নূতন বোধের সহিত সম্পৃক্ত। যাহা হউক দেহে ও মনে একটা গুরুতর পরিবর্ত্তন এখন কবি অনুভব করিতেছেন ; ইহজগতের প্রসারিত চিত্রপটের উপর যেন একটা অজানা আলোক, হয়ত বা ওপারের আলো, আসিয়া পড়িতেছে, প্রত্যক্ষের চেয়ে একটা অলক্ষ্যের বোধ যেন ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এই অপূর্ব্ব আলোকের উৎস ও তাহার পরিচয় এখনও কবির অগোচর ; কবি তাহার আভাস মাত্র পাইয়াছেন এবং বুঝিয়াছেন যে ইহা তাঁহার "চৈতন্যসীমা অতিক্রম করিয়া বহুদূরে রূপের অন্তরদেশে অপরূপ পুরে" অধিষ্ঠিত এবং সেই অবাঙ্‌মনসোগোচর রহস্যনিলয় হইতে উৎসারিত। এই আবির্ভাব এখন কবির মুখরতাকে স্তব্ধ করিয়াছে। এখন শুধু প্রত্যক্ষ অনুভবে উচ্ছ্বসিত গীতধর্ম্মী কবিতায় তাঁহার এই নব উপলব্ধির আভাস ও ইঙ্গিত ব্যক্ত হইতেছে।

কবির বাস্তববোধ-কে আচ্ছন্ন করিয়া যে একটা অতীন্দ্রিয় বোধ এই সময়ে প্রবল হইয়া উঠিতেছে, তাহার সহিত 'সোনার তরী' অথবা 'খেয়া' যুগের অলৌকিক উপলব্ধির মৌলিক পার্থক্য আছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের উপলব্ধি কবিরই নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণার দ্বারা অনুপ্রাণিত ও পুষ্ট। যিনি কবির অন্তরতম, তাঁহার কথাই তিনি সেখানে বলিয়াছেন। জীবনদেবতা কিংবা বিশ্বদেবতা সে যুগের

রবীন্দ্রকাব্যের প্রতিপাদ্য, তাঁহার উপলব্ধিই কবির সে কালের সমস্ত রচনার মধ্যে পরিব্যাপ্ত। কিন্তু সেই "নিভৃত প্রাণের দেবতা" কবিরই আত্মিক অনুভব ও প্রেরণার ধ্রুববিন্দু। বস্তুজগৎ নহে, কবিচিত্তই হৃদয়-দেবতার সিংহাসন; কবির "বিকশিত বাসনার অরবিন্দ মাঝখানে"ই তাঁহার পাদপদ্ম স্থাপিত। কিন্তু যে অতীন্দ্রিয় বোধ রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্ব্বে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা কবিহৃদয়ের কামনার বিকার, অথবা তাঁহার কল্পনার কিংবা ধ্যান-ধারণার সৃষ্ট নহে। যে বাস্তব সত্য কবির চক্ষে পূর্ব্বতন পর্ব্বে প্রতীত হইয়াছিল, তাহারই যে অপর একটা দিক্ আছে, সেই উপলব্ধি-ই এই অভিনব অতীন্দ্রিয় বোধের মূলীভূত। বাস্তবের মধ্যে একটা অজ্ঞেয় ব্যঞ্জনার আভাস তিনি 'পুনশ্চ' পর্ব্বে পাইয়াছিলেম, সেই আভাস এখন একটা নিশ্চয় প্রত্যয়ে পরিণত হইয়াছে। বাস্তবের বিচিত্র যবনিকা এখনও তাঁহার চক্ষের সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে; কিন্তু সে যবনিকার পশ্চাতে আলো জ্বলিয়াছে, দৃশ্যপটের চিত্রাবলী সেই অগোচর আলোকের আভায় নূতন রূপে উদ্ভাসিত হইতেছে; যবনিকা ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে, মনে হইতেছে এখনই বুঝি তাহা অপসৃত হইবে ও চির-আকাঙ্ক্ষিত উজ্জ্বল দৃশ্য নয়নগোচর হইবে; কিন্তু এখনও তাহা হয় নাই, উৎসুক কবি শুধু শুনিতে পাইতেছেন যে "অন্তরীক্ষে দূর হতে দূরে—অনাহত সুরে···সোনার ঘণ্টা" ঢং ঢং করিয়া বাজিতেছে।

মৃত্যুর দেহলিতে পৌঁছিয়া কবি এইভাবে পুনশ্চ একটা অলৌকিক উপলব্ধিতে অনুপ্রাণিত হইলেন। এই জাতীয় অনুভূতির প্রবণতা রবীন্দ্রনাথের মজ্জাগত, জীবনের শেষ লগ্নে তাহাই আবার প্রবল হইয়া উঠিল। পূর্ব্বতন পর্ব্বে তাঁহা মন বাস্তবমুখী হইয়াছিল, এখন তাহা পুনশ্চ অন্তর্মুখী ও আত্মসচেতন হইল। এই নূতন উপলব্ধির

আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশভঙ্গীরও পরিবর্ত্তন হইল। এখন আর গদ্য-কবিতার ছন্দ নহে, পদ্যছন্দই কাব্যের বাহন। সুমিত অমিত্রাক্ষর, সাধারণ মিত্রাক্ষর ও বলাকার ছন্দেই এখন কাব্যরচনা চলিতেছে। শেষের দিকে সম্পূর্ণ মুক্তবন্ধ ছন্দে কবিতা রচিত হইয়াছে, কিন্তু উপকরণ পদ্যের পর্ব্ব। যাহা আপাততঃ "ছন্দভাঙা অসঙ্গতি" মাত্র বলিয়া প্রতীত হয়, তাহার মধ্যেই "সারঙের তান" তিনি এখন শুনিতে পাইতেছেন। এই "তানের" স্বাভাবিক প্রকাশ পদ্যছন্দে।

সপ্তদশ পর্ব্ব (ভাব)

(প্রান্তিক—সানাই)

(খৃঃ অঃ ১৯৩৮-১৯৪০)

(কবিজীবনের অন্তিম যুগে রবীন্দ্রনাথের অন্তরে যে নূতন উপলব্ধির আবির্ভাব হয়, তাহার প্রাথমিক প্রকাশ দেখা যায় 'প্রান্তিক', 'সেঁজুতি', 'আকাশ প্রদীপ', 'নবজাতক', 'সানাই',—এই কাব্যগুলিতে।) ১৯৩৮ সালের আগষ্ট মাসে যে দিন তিনি হঠাৎ অচৈতন্য হইয়া পড়েন, তাহার পরেই তিনি 'প্রান্তিকে'র উপনিষদ্-তুল্য কবিতাগুলি রচনা করেন, (ভাবে, ভাষায়, ছন্দে, অনুভূতিতে এই কবিতাগুলি পূর্ব্ব পর্ব্বের রচনা হইতে একেবারে পৃথক্। মনে হয় যেন এই কবিতাগুলি কবির পূর্ব্ব জীবনের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির স্বাভাবিক পর্য্যায়ভুক্ত নহে, কোন আকস্মিক দৈব প্রেরণা বা সহসা মানবচিত্তে দৈব আবির্ভাবই ইহার উৎস।

মানুষের জগৎ হইতে কবির দৃষ্টি এখন একটা অতি-মানব অতি-পার্থিব দুর্লক্ষ্য সত্তার প্রতি আকৃষ্ট হইল। তিনিই পূষা, এ জন্মের অধিদেবতা, বাস্তবের তমিস্রার অন্তরালে সেই পুরুষ বিরাজমান, তাঁহাকেই কবি এখন দেখিতে চান। অভ্যাসের জাল ছিঁড়িয়া, তুচ্ছতার জীর্ণ উত্তরীয় ত্যাগ করিয়া কবির পথিক চিত্ত গভীর অদৃশ্য লোকের ইসারার অনুসরণে সম্মুখ দিকে "আত্মার যাত্রার পন্থ" ধরিয়া অনন্তের পানে একা অগ্রসর হইতে চাহিল, পশ্চাতের নিত্য সহচর অকৃতার্থ অতীতের বন্ধন ছিন্ন করিয়া দূরে-চাওয়া আকাশের বংশীধ্বনির অনুগামী হইল।

তবে এই পর্ব্বে বাস্তব জগৎকে কবি একেবারে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, কিন্তু যে দৃষ্টি দিয়া তিনি পূর্ব্বে অর্থাৎ 'পুনশ্চ'-'শেষ-সপ্তকে'র পর্ব্বে বাস্তব-বৈচিত্র্য দেখিয়াছিলেন তাহার এখন পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মাঝে মাঝে সেই পুরাতন বোধ ফিরিয়া আসিলেও এখন তিনি মরণের অপর পারে বিরাট্ গূঢ় রহস্যের সন্ধানে যাইবার জন্য উন্মুখ। তাঁহার মন এখন "পরীর দেশের বন্ধ দুয়ারে" হানা দিতেছে, সমস্ত জীবনটাই "একটা স্বপ্নের আয়োজন" বলিয়া মনে হইতেছে। যাহা তিনি খুঁজিতেছেন "সে রয়েছে সব প্রত্যক্ষের পিছে, নিত্যকাল সে শুধু আসিছে"। তাহারই উদ্দেশে "পথিক চলিল একা—অচেতন অসংখ্যের মাঝে"। ঘরছাড়া চাকুরে পুরাতন বাসার মেয়াদ ফুরাইবার পর যখন শেষ রাত্রে আত্মীয়-পরশহীন অজানা দেশের দিকে একা যাত্রা করে, তখন যেন এই জাতীয় অনুভবই সঞ্চারিত হয়। মনে হয় "এ প্রাণ রাতের রেলগাড়ি"তে পাড়ি দিতেছে, "কামরায় গাড়িভরা ঘুম, রজনী নিঝুম।" "চালায় যে নাম নাহি কয়—কেউ বলে যন্ত্র সে আর কিছু নয়।" তবুও তার হাতেই প্রাণমন সঁপিয়া দিয়া যাত্রী বিছানা পাতিয়া শুইয়া পড়ে, "ঘুমের ভিতর থাকে অচেতনে কোন্ দূর প্রভাতের প্রত্যাশা নিদ্রিত মনে"। বাস্তবের "ছন্দভাঙা অসঙ্গতি" ছাপাইয়া ধ্বনিত হইতেছে একটা তান, সেই তান একটা "বস্তুর অতীত…ইন্দ্রজাল" সৃষ্টি করিতেছে, সেই ইন্দ্রজালই এখন কবির কাছে চরম সত্যের আভাস বলিয়া মনে হইতেছে। এই সুর "ধীরে ধীরে কিছু খুলে দিয়ে যায়—ভাবী যুগ আরম্ভের অজানা পর্য্যায়"। এই জন্য কবি "নিকটের দুঃখদ্বন্দ্ব, নিকটের অপূর্ণতা" ভুলিয়া যান, "মন যেন ফিরে সেই অলক্ষ্যের তীরে তীরে"।

এই পর্ব্বে কবির দৃষ্টি যে রোম্যান্টিক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এখানে তাঁহার কাব্যের বস্তু যে সহজ বুদ্ধিতে “অনেকটা মায়া, অনেকটা ছায়া” বলিয়া মনে হইবে তাহা তিনি জানেন; “আমারে শুধাও যবে, এরে কভু বলে বাস্তবিক?—আমি বলি, কখনো না, আমি রোম্যাণ্টিক।” তবে এই রোম্যাণ্টিকতা হৃদয়াবেগের চর্চ্চা নহে; অলক্ষ্যের “আলো ছায়া ভাবনার প্রাঙ্গণে খনে খনে (যে) আলিপন লেখে আর মোছে” তাহাই তিনি কবিতায় ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই ক্ষণ গুলিই তাঁহার সারা জীবনের সঞ্চয়, Faust-র ন্যায় তাঁহার কাছেও এই পলাতক মুহূর্ত্তগুলি “too fair”।। রোম্যাণ্টিক কবিরা যে ভাবে “look before and after” (সম্মুখে ও পশ্চাতে দৃষ্টিক্ষেপ করেন), সে রকম প্রবৃত্তি কবির এই যুগেও আছে; তবে “before” হইল বাস্তবাতীত ও মরণাতীত অলক্ষ্য লোক আর “after” হইল পশ্চাতের জীবন; উভয়ই অনির্ব্বচনীয়ের আলোকে উদ্ভাসিত। অবচেতন সত্তার অন্তস্তলে এই অনুভূতির উৎস।

অষ্টাদশ পর্ব্ব (মহাভাব)

(সেপ্টেম্বর ১৯৪০—আগষ্ট ১৯৪১)

[রোগশয্যায়, আরোগ্য, জন্মদিনে, শেষ লেখা]

রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্ব্বের রচনাগুলি সংগৃহীত হইয়াছে চারিটি গ্রন্থে —'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে', 'শেষ লেখা'। জীবনের শেষ বৎসরে অর্থাৎ ১৯৪০ অব্দের প্রায় মাঝামাঝি হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কয়েক মাসে এইগুলি রচিত হয়। এই খানেই পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সাধনার ও তাঁহার ধর্ম্মবোধের শেষ অবদান, তাঁহার শেষ কথা, তাঁহার চরম ও পরম উপলব্ধির বাণী।

ইহার পূর্ব্বের পর্ব্বে যে ভাবের আগম হইয়াছিল, তাহাই এখন পরিশোধিত ও প্রগাঢ় হইয়া মহাভাবে পরিণত হইয়াছে। 'সন্ধ্যা-সঙ্গীতে'র ভাবাভাবে যে প্রবাহের উৎপত্তি, 'শেষ লেখা'র মহাভাবে তাহার সমাপন। প্রত্যাসন্ন পর্ব্বে যে অলক্ষ্য সত্যের আভাস কবি পাইয়াছিলেন, তাহাই এখন দিব্য দৃষ্টির দ্বারা যেন তিনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথকে অনেক সময় ঋষি বলা হয়, এই পর্ব্বেই তিনি সেই আখ্যার সম্পূর্ণ যোগ্য হইয়াছেন মনে হয়। আকুলতা, আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহের স্তর তিনি অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, যে চরম সত্য জীবন মরণের সীমানা ছাড়াইয়া "বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাংগুলং" তাহাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা জানিতেছেন। তাঁহার এই সময়কার অধিকাংশ কবিতাই বৈদিক সূক্তের ন্যায় অনাড়ম্বর নিরলঙ্কার সুসংহত সংক্ষিপ্তসার; পদ্যের মূল প্রকৃতি বজায় থাকিলেও পদ্যের বন্ধন এই কবিতাগুলিতে নাই, এখানেই পাওয়া যায় যথার্থ মুক্তবন্ধ পদ্যের নিদর্শন।

কবির এই সময়কার দৃষ্টি চরম সত্যের উদয়শিখরে সূর্য্যের প্রতি নিবিষ্ট নিমেষনিহিত দৃষ্টি বা যোগস্থ তপস্বীর ধ্যানদৃষ্টি। তিনি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহা বোধ হয় রহস্যের সমাধান নহে, তাহা হইতেছে রহস্যেরই নিবিড়তর ও ঘনিষ্ঠ অনুভূতি। প্রথম দিনের সূর্য্য প্রশ্ন করিয়াছিল 'কে তুমি', সে প্রশ্নের 'মেলেনি উত্তর'; শেষ দিবসের সূর্য্যও সেই প্রশ্ন উচ্চারণ করিল, কিন্তু এবারও "পেল না উত্তর"।

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনঃ।
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ ॥

(কেনোপনিষৎ—১।৩)

[যেখানে চক্ষু গমন করে না, বাক্য গমন করে না, মনও গমন করে না; (ব্রহ্ম কি) জানি না, যে প্রকারে ইহা (ব্রহ্মজ্ঞান) উপদেশ দিতে হয়, তাহাও অবগত নই।]

উপনিষদের এই বচনে যে উপলব্ধির পরিচয় আছে, তদনুরূপ উপলব্ধিই এখন কবির হইয়াছে। কিন্তু এই উপলব্ধি একান্ত ভাবে কবির নিজস্ব, তাঁহার সমগ্র জীবনের সাধনার ফল, ইহা শাস্ত্রোক্তির অনুবর্ত্তন মাত্র নহে।

১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষে কালিম্পঙে থাকিতে কবি যখন পুনশ্চ সংজ্ঞাহারা হইয়া পড়েন, সেই সময়েই তাঁহার অবচেতন মনে এই মহাভাবের আবির্ভাব হয়, এরূপ কল্পনা অসঙ্গত না হইতে পারে। এই সময়কার অনেক কবিতাতেই "অতিমৃত্যুমেতি" এই অনুভবের প্রকাশ দেখা যায়, ওপারের আলো প্রায় কবিতাতেই আসিয়া পড়িয়াছে। মৃত্যু এখন যেন তাঁহার কাছে জীবন হইতে পৃথক্ কোন ব্যাপার নহে। জীবন ও মরণের মধ্যে একটা অলক্ষ্য ঘনিষ্ঠ সূত্রের সংযোগ রহিয়াছে, "মৃত্যুর দক্ষিণ বাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত"

"বরের চরম দান" বহন করিয়া "মরণের বধূ" "যুগান্তরের পানে" চলিতেছে। এই চলার পথ শেষ হইবে—হয়ত

যেথা নাই নাম,
যেখানে পেয়েছে লয়
সকল বিশেষ পরিচয়,
নাই আর আছে
এক হয়ে যেথা মিশিয়াছে,—
যেখানে অখণ্ড দিন
আলোহীন, অন্ধকারহীন,—
আমার আমির ধারা মিলে যেথা যাবে ক্রমে ক্রমে
পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগরসঙ্গমে।

এইভাবে তাঁহার নির্ব্বাণ হইবে, না, তাঁহার "বাহ্য আবরণ নানা রূপে রূপান্তরে কালস্রোতে" ভাসিতে থাকিবে, তাহা কবি জানেন না। আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির অতীত যে মহাশক্তি বিশ্বজগৎ নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তিনি "ছলনাময়ী" এইটুকু-ই কবি এখন নিশ্চয়রূপে জানিয়াছেন; সেই মহাশক্তি তাঁহার "সৃষ্টির পথ বিচিত্র ছলনাজালে আকীর্ণ" করিয়া রাখিয়াছেন। "ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি" সে পথের পাশে প্রসারিত। তবে এই ছলনা যে "অনায়াসে সহিতে" পারে এবং "সত্যের দারুণ মূল্য" লাভের জন্য "আমৃত্যু দুঃখের তপস্যা" করিয়া "মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ" করিয়া দিতে পারে, সে যে "শান্তির অক্ষয় অধিকার" পাইবেই—এই বিশ্বাসই রবীন্দ্রনাথের সাধনার শেষ কথা।*

* Browning-র Prospice কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মর্ত্তব্য।

পরিশিষ্ট

বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের সাধনা ও সৃষ্টি

রবীন্দ্রনাথের আজীবন কাব্যসাধনার সহিত তাঁহার ছন্দ-সাধনা অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত। ছন্দ রবীন্দ্রকাব্যের বাহন মাত্র নয়, কাব্যের আত্মার মূর্ত্ত প্রকাশ, কবির উপলব্ধির প্রতীক। 'ছন্দে উঠিছে তারকা, ছন্দে জগ-মণ্ডল চলিছে'; রবীন্দ্রনাথের মতে কবিচিত্তের ছন্দ-স্পন্দনের প্রভাবেই কাব্যের ভাব ও ভাষা আহৃত হয়, কাব্যসত্তার সৃষ্টি সম্ভব হয়। রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-সাধনার ইতিহাস আলোচনা করিলে তাহার ভিতরেই তাঁহার জীবনসাধনা তথা কাব্যসাধনার সূত্র লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে।

(১)

অতি অল্প বয়সেই রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু 'কবিকাহিনী', 'বনফুল', 'ভগ্নহৃদয়', 'রুদ্রচণ্ড' প্রভৃতি বালরচনার মধ্যে যেমন রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সাধনার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, তেমনই তাঁহার ছন্দ-সাধনারও কোন বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায় না। তখন পর্যন্ত তিনি কবিপ্রসিদ্ধ মত ও ভাবের উপাদান সহযোগেই কাব্য রচনা কবিতেছিলেন, এবং প্রচলিত ছন্দের বাঁধা পথেরই অনুসরণ করিতেছিলেন। রবীন্দ্রকাব্যের ও রবীন্দ্রছন্দের ইতিহাসে এই রচনাগুলির কোন উল্লেখযোগ্য স্থান নাই।

রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কাব্যানুভূতির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় 'সন্ধ্যা-সঙ্গীতে' এবং তাঁহার ছন্দ-সাধনারও প্রথম পর্বের সূত্রপাত হয় 'সন্ধ্যা-

সঙ্গীতে'। যে চঞ্চল রোম্যান্টিকতা, যে নৈরাশ্যমুখর ব্যাকুলতা, যে প্রকাশ-বেদনার দৈন্য 'সন্ধ্যাসঙ্গীতের' লক্ষণ, তাহা এই সময়কার ছন্দেও দেখিতে পাওয়া যায়। সনাতন রীতি ও প্রথার অনুবর্ত্তন না করিয়া কবি এখন নিজস্ব একটা সাধনার দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করিতেছেন, ছন্দেও একটা নূতন কিছু কবার প্রয়াস করিতেছেন, কিন্তু সে প্রয়াসের ফলে কোনরূপ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। সনাতন পয়ার ও ত্রিপদীর শ্লোকে তিনি আর সন্তুষ্ট নহেন। ছোট বড় চরণ মিশাইয়া নূতন রকমের শ্লোক রচনার চেষ্টা করিতেছেন, কখনও বা বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের পর্ব্ব সহযোগে চরণ সৃষ্টির প্রয়াস করিতেছেন, কিন্তু কোনটাই ঠিক দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারিতেছে না, বুদ্বুদের মত সবই ভাসিয়া ভাসিয়া বহিয়া যাইতেছে। তাঁহার ললিত-গীত-উচ্ছ্বাসের যথার্থ প্রকাশ যেন কিছুতেই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, বিশেষতঃ যুক্তবর্ণ যেন পদে পদে তাঁহাকে ব্যাহত করিতেছে। কখনও তাহাকে ভাঙিয়া দুটি ভিন্ন অক্ষর তৈয়ার করিতেছেন, কখনও বা শব্দের শুদ্ধ বানানের একটা কোমল সংস্করণের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন। তবে কবি সিদ্ধিলাভ না করিলেও সাধনার সূত্রপাত যে হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রায় এই সময়েই—'সন্ধ্যাসঙ্গীত' রচনার কিছু পূর্ব্বে—'ভানু-সিংহের পদাবলী' রচিত হয়। ব্রজবুলি-তে রচিত বলিয়া এই পদগুলির হয়ত বাংলা ছন্দের ইতিহাসে স্থান না হইতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-সাধনার প্রবৃত্তি কোন দিকে, তাহার আভাস এইখানে কিছু কিছু পাওয়া যায়। যে ভাবে সুষম স্তবক রচনা এবং সুকৌশলে হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের সমাবেশ করিয়া রবীন্দ্রনাথ এখানে ছন্দ-স্পন্দনের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার উত্তরকালের ছন্দ-সাধনার গতি-নির্দ্দেশ পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কাব্যসাধনার আরম্ভ হয় 'প্রভাত-সঙ্গীত' রচনার সময়। এই সময়ই দেখি যে একটা নূতন দৃষ্টি দিয়া তিনি বিশ্বজগৎ দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নৈরাশ্যের স্থলে একটা আনন্দোজ্জ্বল উপলব্ধি তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে। এই সময়কার ছন্দ রচনাতেও কবির কতকগুলি নূতন উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা ছন্দে পর্ব্বের গুরুত্ব এখন তিনি বুঝিয়াছেন, এবং মূল পর্ব্ব বজায় রাখিয়া কি ভাবে নূতন নূতন চরণ ও স্তবক রচনা করিয়া বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করা যায়, সে তত্ত্বটি তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। তিন ও চার মাত্রার পর্ব্বাঙ্গ দিয়া সাত মাত্রার বিষম-মাত্রিক পর্ব্ব তিনি বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিতেছেন এবং এই ভাবে তাঁহার উচ্ছল আনন্দ ছন্দে প্রকাশ করিতেছেন।

কিন্তু যুক্তবর্ণের ব্যবহারে এখনও তিনি পটুত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু অল্পকাল পরেই রচিত 'কড়ি ও কোমলে' দেখিতে পাই যে যুক্তবর্ণ সহযোগে সুষম ছন্দ রচনার কৌশল তিনি অধিগত করিয়াছেন, ছন্দ রচনায় তাঁহার কৃতিত্ব পূর্ব্বাচার্য্যগণের চেয়ে কোন ক্রমেই অল্প নহে। 'কড়ি ও কোমলে'-ই দেখিতে পাই যে কবি ছড়ার ছন্দের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন, যদিচ এই ছন্দের সম্ভাবনা সম্পর্কে এখনও তিনি ততটা সচেতন হ'ন নাই। আট ও দশ মাত্রার দীর্ঘ পর্ব্ব লইয়াই এই সময়ে তিনি পরীক্ষা চালাইতেছেন, এবং এই সূত্রে দীর্ঘতর চরণ ও নূতন 'পরিপাটী' (pattern) সহযোগে সনেটের একটা নূতন পদ্ধতি আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছেন।

(২)

ইহার পরবর্ত্তী কাব্য 'মানসী' রচনার কাল রবীন্দ্রকাব্যের ইতিহাসে একটা সন্ধিক্ষণ। এই সময়েই তাঁহার কাব্য সম্পূর্ণ ভাবে

আত্মসচেতন ও আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। ছন্দেও এই সময়ে তিনি এক অভিনব ধারাব প্রবর্ত্তন করেন, এবং সেই ধারাতেই আধুনিক বাংলা কাব্যের স্রোত প্রধানতঃ প্রবাহিত হইয়াছে। আধুনিক বাংলা মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান রীতিব স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ, এবং 'মানসী' কাব্যেই ইহার স্বরূপ প্রথম বিকশিত হয়। এই রীতিতে প্রত্যেকটি হলন্ত অক্ষরকে (closed syllable) দীর্ঘ বা দ্বিমাত্রিক ধরিয়া লইয়া কবি যুক্তবর্ণের ব্যবহার সমস্যাব সমাধান করিলেন, এবং প্রায় নিস্তরঙ্গ বাংলা পর্ব্ব ও পর্ব্বাঙ্গে ছন্দহিল্লোল প্রবর্ত্তন কবিলেন। 'অতৃপ্ত যত/ মহৎ বাসনা/গোপন মর্ম্ম/দাহিনী, //আপনা-মাঝারে/শুষ্ক জীবন-/ বাহিনী//' তাঁহার কাব্যে পরিস্ফুট রূপ গ্রহণ কবিল।

কেবল বাংলা ধ্বনিপ্রধান রীতির প্রবর্ত্তনই 'মানসী'র ছন্দের একমাত্র উল্লেখযোগ্য লক্ষণ নহে। সনাতন তানপ্রধান ছন্দের ব্যবহারেও কবি এখানে অভূতপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। বিশেষতঃ, 'অহল্যা' ও 'মেঘদূত' প্রভৃতি তানপ্রধান কবিতায় রবীন্দ্রনাথ মিত্রাক্ষর পয়ারের আধারে অমিতাক্ষর ছন্দ রচনা কবিয়া একটা অভিনব ছন্দ-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিলেন। এতদ্ভিন্ন নানা বিচিত্র 'পরিপাটী'র স্তবকও এই সময়ে কবি রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার মধ্যে অনেকগুলিই পরে বাংলা কাব্যে লোকপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে। ধ্বনিপ্রধান ছন্দে ছয় মাত্রার পর্ব্বের বিশেষ উপযোগিতাও কবি এই সময়ে আবিষ্কার করেন।

'মানসী'তে কবির যে ছন্দ-কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই পরবর্ত্তী 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা' কাব্যে বিকাশ লাভ করে। তবে এই সময়ে কবি অভিনব সৃষ্টিকর্ম্ম অপেক্ষা পূর্ব্ব সৃষ্টির মধ্যে যেগুলি সার্থক,—পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা সেইগুলির প্রতিষ্ঠার দিকেই মনো-

যোগ দিয়াছিলেন। দশ মাত্রার পর্ব্ব ও আঠার মাত্রার চরণের বহুল ব্যবহার এই সময়ের একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার—-এবং অমিতাক্ষর মিত্রাক্ষরেই ইহার সার্থকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার পরে 'চৈতালি'তে দেখা যায় যে, কবি সনাতন পয়ার প্রভৃতি ছন্দের দিকেই পুনরায় আকৃষ্ট হইয়াছেন, 'চৈতালি'র ধীরোদাত্ত সুরের সহিত এই ছন্দের সঙ্গতি আছে। পরবর্ত্তী কাব্য 'কল্পনা'য় দেখিতে পাই যে, একটা বিদ্রোহ ও নব জীবনের বাণী ঘোষিত হইতেছে, এবং তাহার প্রকাশ হইয়াছে প্রধানতঃ মিত্রাক্ষর ছন্দে। কিন্তু এখনকার মিত্রাক্ষর ছন্দ সনাতন মিত্রাক্ষরের ন্যায় নিস্তেজ ও নিঃস্পন্দ নহে, ইহার মধ্যে একটা অভূতপূর্ব্ব 'ভৈরব হরষ' ধ্বনিত হইয়াছে, ইহার ধ্বনিমাত্রিক ছন্দেও কোমলকান্ত কূজনের স্থলে 'গুরুগর্জ্জন' শ্রুত হইয়াছে, ইহার তানপ্রধান ছন্দে দেবকুমারের কোদণ্ড-টঙ্কার ও 'ঝঞ্ঝার মঞ্জীর' বাজিয়া উঠিয়াছে। কোনও নূতন ধারার প্রবর্ত্তন এখানে নাই, কিন্তু পরিচিত পর্ব্ব ও চরণ, অনুপ্রাস ও যুক্তাক্ষরের ব্যবহার করিয়াই বাংলা ছন্দের ব্যঞ্জনাশক্তির চরমোৎকর্ষ কবি এখানে প্রদর্শন করিয়াছেন। যে যুক্তাক্ষরকে আগে ছন্দের নিগড় বলিয়া মনে করা হইত তাহা যে কি ভাবে ছন্দের দ্যুতিময় অলঙ্কারে রূপায়িত হইতে পারে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় বোধ হয় পাওয়া যায় 'কল্পনা'তে। সাবলীল স্বচ্ছন্দ গতির সহিত সুসংহত শক্তির সমন্বয়ে 'কল্পনা' ছন্দ-গৌরবে মহীয়ান্ হইয়াছে।

(৩)

রবীন্দ্রনাথের জীবন-সাধনা ও ছন্দ-সাধনার একটা নূতন অধ্যায়ের আরম্ভ হয় 'ক্ষণিকা' রচনার সময়ে। 'ক্ষণিকা'য় যে একটা অভিনব ক্ষণবাদ বা সহজিয়া বাদ জীবনধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তাহারই

প্রকাশ দেখা যায় এই কাব্যের অভিনব ছন্দ-পদ্ধতিতে। যে 'অকারণ পুলক' এই সময়ে কবির হৃদয়-মন অধিকার করিয়াছিল, তাহারই স্বাভাবিক প্রতিরূপ দেখা দিল নূতন এক ছন্দ-রীতিতে। যে ছড়ার ছন্দ পূর্ব্বে কেবল মাত্র ছেলে-ভুলানো পদ্য, তন্ত্র-মন্ত্র, খনার বচন এবং হাল্কা হাসি ও ব্যঙ্গ কবিতার বাহন মাত্র ছিল, তাহারই মর্ম্মকথাটি অধিগত করিয়া কবি উচ্চাঙ্গের কবিতায় নূতন এক রীতি—বলপ্রধান রীতির (stressed metre) প্রবর্ত্তন করিলেন। ছড়ার ছন্দের চরণ ও শ্লোক রচনার পরিধি ছিল অতি সঙ্কীর্ণ; রবীন্দ্রনাথ বলপ্রধান ছন্দে নানা দৈর্ঘ্যের চরণ ও নানা 'পরিপাটী'র স্তবক রচনা করিয়া ইহার ব্যঞ্জনাশক্তিকে বহু গুণে বর্দ্ধিত করিলেন। 'সরল হাসি, সজল চোখে'র কথা এবং কবিহৃদয়ের গান স্বতঃস্ফূরিত হইয়া এই ছন্দেই তাহাদের ভাষা খুঁজিয়া পাইল।

'ক্ষণিকা'র সমস্ত কবিতাই অবশ্য বলপ্রধান ছন্দে রচিত নহে, ধ্বনিপ্রধান ছন্দও এখানে আছে। কিন্তু এখানে কবি যুক্তাক্ষরের স্বল্প ব্যবহার করিয়া নূতন রীতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। 'কল্পনা'র ঝঙ্কার ও হিন্দোল 'ক্ষণিকা'র মাত্রাবৃত্তে নাই। তানপ্রধান ও অমিতাক্ষর ছন্দের ব্যবহার 'ক্ষণিকা'য় নাই। 'ক্ষণিকা'র পুলক-চঞ্চল অভিনব সহজবাদের সহিত তানপ্রধান ছন্দের ধীর গম্ভীর গতির সঙ্গতি থাকিতে পারে না। 'গভীর সুরে গভীর কথা শুনিয়ে দিতে' কবির কোন ইচ্ছা নাই, তাঁহার ভাব এখন লঘুগতি কথ্য ভাষায় ও চটুল ছড়ার ছন্দেই ব্যক্ত হইয়াছে।

কিন্তু 'ক্ষণিকা'র এই দৃষ্টি অল্পকালের মধ্যেই 'নৈবেদ্যে'র বৃহত্তর উপলব্ধির মধ্যে মিশিয়া গেল। 'কে জানিত সেই ক্ষণিকা মুরতি দূরে করি দিবে বরষণ, মিলাবে চপল দরশন!' 'ক্ষণিকা'র বিক্ষিপ্ত

উপলব্ধি গ্রথিত ও ঘনীভূত হইয়া একটা বিরাট আদর্শনিষ্ঠায় পরিণত হইল। তানপ্রধান ছন্দের গম্ভীর উদাত্ত সুর আবার তাঁহার কাব্যে ধ্বনিত হইল, কিন্তু তাহার রূপ হইল পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সরল। সনেট্ জাতীয় অনেক কবিতা তিনি এই সময়ে রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু স্তবকের বৈচিত্র্যের দিকে বা ছন্দহিল্লোলের দিকে এখন তিনি আর বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। 'নৈবেদ্যে'র এই সমস্ত ছন্দোগুণ পরবর্ত্তী 'স্মরণ', 'উৎসর্গ' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থেও আছে। কবির রচনায় এখন তানপ্রধান, ধ্বনিপ্রধান ও বলপ্রধান—এই ত্রিধারা পাশাপাশি বহিয়া চলিতেছে। আবশ্যক মত তিন রীতিতেই তিনি কাব্য লিখিতেছেন,—গম্ভীর উদাত্ত ভাবের জন্য তানপ্রধানে, সূক্ষ্ম অনুভূতির স্পন্দনের জন্য ধ্বনিপ্রধানে এবং স্বচ্ছ স্বতঃস্ফূর্ত্ত আবেগের জন্য বলপ্রধানে।

ইহার পর 'শিশু' হইতে 'গীতালি' পর্য্যন্ত রচনার সময়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে বাস্তবাতীত উপলব্ধি ও গূঢ়াত্মবাদের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা প্রধানতঃ প্রকাশ পাইয়াছে বলপ্রধান রীতির ছন্দে। যে ছন্দকে পূর্ব্বে কেবল মাত্র লঘুভাব ও রঙ্গব্যঙ্গের উপযুক্ত মনে করা হইত, তাহাই যে রবীন্দ্রনাথের নিকট গূঢ় সত্য ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির যোগ্য মাধ্যম বলিয়া প্রতিভাত হইল, ইহা রবীন্দ্রকাব্যের একটা লক্ষণীয় ব্যাপার। বলপ্রধান ছন্দের সারল্য বোধ হয় তাঁহার কাছে মন্ত্রের ন্যায় আবেদন করিত, ইহার স্বরাঘাতের পৌনঃপুনিকতার মধ্যে তিনি বোধ হয় একটা অলৌকিক ইন্দ্রজালের প্রভাব অনুভব করিতেন। বলা বাহুল্য, বেদের সংহিতা, বাইবেলের Psalms ও Gospels-এর সারল্যের মধ্যে এই জাতীয় একটা অলৌকিকতা আছে; ধ্বনিপ্রধান ও তানপ্রধান ছন্দের যে বিপুল ঐশ্বর্য্য আছে তাহা স্বভাবতঃ

মানবিক ও পার্থিব, অলৌকিকের স্পর্শ তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠে না—কবি হয়ত এইরূপ অনুভব করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি তান-প্রধান বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দে কোনও কবিতা রচনা করেন নাই এমন নহে। কিন্তু যখনই কোন অপার্থিব বা অলৌকিক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছেন, তখনই তাঁহার ভাষা হইয়াছে সরল, ভাব হইয়াছে যুক্তিবিরল, বর্ণনা হইয়াছে বাহুল্যবর্জ্জিত এবং ছন্দ হইয়াছে বলপ্রধান। এই প্রসঙ্গে 'শিশু'র কবিতাগুলি বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। কবির চক্ষে শিশু মানবক মাত্র নহে; সে সংসারাতীত সত্যের ঋষি; তাহার স্বপ্ন, কল্পনা সেই পরম সত্যের আভাস। এই জন্য যখনই কাব্যে শিশুর মনোভাব কবি প্রকাশ করিয়াছেন, অথবা যখনই তাহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে কবি আসিয়াছেন, তখনই সরল ভাষায় ও বলপ্রধান ছন্দে তিনি কাব্য রচনা করিয়াছেন।

(৪)

ইহার পরে রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা' রচনার সময়ে এক অভিনব ছন্দোবন্ধ সৃষ্টি করিলেন, তাহার আকৃতি ও প্রকৃতি এতই অপরূপ ও অভাবনীয় যে 'বলাকার ছন্দ' ভিন্ন তাহার অন্য কোন সংজ্ঞা অদ্যাপি দেওয়া হয় নাই। ছন্দের পরিভাষায় ইহাকে মিত্রাক্ষরযুক্ত বিষম অমিতাক্ষর তানপ্রধান ছন্দ বলা যাইতে পারে। যতি ও ছেদের বি-যোগ করিয়া মধুসূদন বাংলা তানপ্রধান ছন্দের যে সম্ভাবনা প্রথম আবিষ্কার করেন, তাহারই এক চরম অভিব্যক্তি হইয়াছে 'বলাকা'র ছন্দে। মধুসূদনের অমিতাক্ষরে যতির দিক্ দিয়া ঐক্য এবং ছেদের দিক্ দিয়া আবেগবৈচিত্র্যের সৃষ্টি করা হইয়াছে, এবং এই উভয় সঙ্কল্পের (motif) সমাবেশে য়ুরোপীয় Contrapuntal সঙ্গীতের

ন্যায় একটা দোরোখা ছন্দের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এই দোরোখা ছন্দের জটিলতা বোধ হয় আমাদের স্বাভাবিক রুচির সহিত তেমন খাপ খায় না। অথচ ছেদের অবস্থান-বৈচিত্র্য না ঘটাইতে পারিলে, ছাঁচে ঢালা ছন্দের কাঠামোতে কবিতা রচনা করিলে, আবেগের সহজ স্পন্দন ও বৈচিত্র্যের প্রকাশ করা যায় না। 'বলাকা'র ছন্দে রবীন্দ্রনাথ যতির 'পরিপাটী'কে ছন্দের ভিত্তি না করিয়া শুদ্ধ ভাব-প্রবাহের তরঙ্গের অনুসরণ করিয়া ছেদের-ই অবস্থান অনুযায়ী চরণ রচনা করিতে লাগিলেন, বিভিন্ন মাত্রার বিভিন্ন সংখ্যক পর্ব্ব লইয়া চরণ গঠন করিলেন, কেবল পরস্পর সন্নিহিত বা অদূরস্থ চরণে মিত্রাক্ষরের আশ্লেষ রাখিয়া পদ্যের ঝঙ্কার বজায় রাখিলেন। ফলে, ছেদ ও যতির বি-যোগ উঠিয়া গেল ; ছন্দের গতি হইল একমুখী, তীব্র ও তরঙ্গভঙ্গিল। মধুসূদনের অমিতাক্ষরে যে contrapuntal গৌরব আছে তাহা রহিল না বটে, কিন্তু 'পরিপাটী'র বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করাতে পদ্যছন্দে 'তাণ্ডব ও তরল তালের' আভাস ফুটিয়া উঠিল। মিত্রাক্ষরের ব্যবহার ও 'পরিপাটী'র আভাস থাকার জন্য এ ছন্দকে ঠিক মুক্তছন্দ বলা যায় না ; এ ছন্দে 'পরিপাটি' ও মুক্তছন্দ উভয়েরই লক্ষণাদি থাকায় এখানে ছন্দের এক অভূতপূর্ব্ব অর্দ্ধনারীশ্বর রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'বলাকা'য় কবির উপলব্ধির যে বিরাট্ সমন্বয় ঘটিয়াছে তাহারই মূর্ত্ত রূপ দেখা যায় 'বলাকা'র ছন্দে। রবীন্দ্রনাথের ছন্দপ্রতিভার ইহাই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি।

'বলাকা'র দৃষ্টিভঙ্গি ও উপলব্ধিরই অনুবৃত্তি পাওয়া যায় পরবর্ত্তী 'পলাতকা' ও 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যদ্বয়ে। কিন্তু 'বলাকা'র ছন্দ এবং এই দুই কাব্যের ছন্দের মধ্যে পার্থক্য আছে। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, 'পলাতকা'য় 'বলাকা'র মুক্তবন্ধ ছন্দের-ই অনুসরণ

করা হইয়াছে, কারণ, চরণের দৈর্ঘ্যের কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমিতি নাই, কোন স্তবকের 'পরিপাটী'র আভাস নাই। কিন্তু সামান্য একটু বিবেচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, 'পলাতকা'র ছন্দ মুক্তবন্ধ নহে; ইহার প্রত্যেকটি চরণ চার মাত্রার বলপ্রধান পর্ব্বে গঠিত, এবং প্রতি পঙ্‌ক্তিযুগল মিত্রাক্ষর ব্যবহারের দ্বারা আশ্লিষ্ট। 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যেও চার মাত্রার বলপ্রধান পর্ব্ব ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং সেখানে চরণের দৈর্ঘ্য নিরূপিত, স্তবকের 'পরিপাটী'র স্পষ্ট ব্যবহার সেখানে করা হইয়াছে।

'বলাকা'র ছন্দ সৃষ্টির স্বল্প পরেই যে কবি সমমাত্রিক ছন্দোবন্ধে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, ইহা একটা লক্ষণীয় ব্যাপার। 'শিশু ভোলানাথে'র ছন্দ অবশ্য 'শিশু'র ছন্দেরই অনুরূপ, এবং যে কারণে কবি 'শিশু'তে ছড়ার ছন্দ বা বলপ্রধান ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন, সেই কারণেই 'শিশু ভোলানাথে' সেই ছন্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। সহজ ভাষা, সরল ছন্দ-ই শিশুর মুখে শোভা পায়; তাহা ছাড়া এই সারল্যের মধ্যে একটা অলৌকিকতার আভাস আছে, তাহাও এই সূত্রে ছড়ার ছন্দ ব্যবহারের অন্যতম কারণ। 'পলাতকা'র কবিতাগুলিতেও কবি সাধারণ জীবনযাত্রার কয়েকটি ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন; অসাধারণ একটা উপলব্ধির দীপ্তি প্রত্যেকটি কবিতার পরিশেষে ফুটিয়া উঠিলেও এই আর্বিভাবের আধার লৌকিক জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতা, ইহার পাত্র-পাত্রীরা এক একটি সুপরিচিত লোকচরিত্র। এইকারণেই রবীন্দ্রনাথ তাহাদের কথা ও কাহিনী লোক-ছন্দে বা ছড়ার ছন্দে রচনা করিয়াছেন; কিন্তু ছড়ার ছন্দের স্তবক তিনি গ্রহণ করেন নাই, বিচিত্র দৈর্ঘ্যের চরণের পারম্পর্য্যের মাধ্যমে জীবনের বাস্তবতা, বন্ধুরতা ও বিষম গতির ব্যঞ্জনা করিয়াছেন।

বোধ হয়, আরও একটা গভীরতর কারণ আছে। 'বলাকা'র ছন্দ অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-সাধনার শ্রেষ্ঠ মৌলিক কীর্ত্তি, কিন্তু ইহা বোধ হয় তাঁহার একটা *tour de force* বা 'অসাধ্য-সাধনি'; ইহা তাঁহার তপোলব্ধ ঐশ্বর্য্য, তাঁহার সহজ সম্পদ্ নহে। বিচিত্র অথচ সুষম সৌন্দর্য্যের প্রতিই তাঁহার প্রবণতা, বিষম ছন্দ বা তাণ্ডব লীলা তাঁহার স্বধর্ম্ম নহে। তাঁহার জীবন সাধনা ও ছন্দ-সাধনার ইতিহাসে বারংবার ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

'যে সহজ তোর রয়েছে সমুখে
আদরে তাহারে ডেকে নে রে বুকে,
আজিকার মতো যাক যাক চুকে যত অসাধ্য-সাধনি'—

অন্তরাত্মার এই বাণীই বার বার তাঁহার সাধনার পথে দিক্ পরিবর্তন ঘটাইয়াছে।

রবীন্দ্রকাব্যের পরবর্ত্তী যুগের ইতিহাস হইতেও ইহার সত্যতা প্রতিপন্ন হয়। এই যুগের পরিব্যাপ্তি মোটামুটি ভাবে 'পূরবী' রচনার সময় হইতে 'বিচিত্রিতা' রচনার সময় পর্যন্ত, 'পরিশেষে'র কয়েকটি কবিতাও এই যুগে রচিত। এই সময়ে কবির মনোজগতে একটা Indian Summer বা অকালবসন্তের আবির্ভাব ঘটে; মানবপ্রেম ও নিসর্গসৌন্দর্য্যের জয়গাথাই পুনশ্চ তাঁহার কাব্যের প্রধান উপজীব্য হয়। কোনও বাস্তবাতীত সত্তা নহে, বাস্তব জীবনের বৈচিত্র্যই এখন কবির কাছে পরম সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। এই পরিবর্ত্তনের পরিচয় কবির ছন্দেও প্রকট হইয়াছে। 'বলাকা' ও 'পলাতকা'র বিষম ছন্দ এখন আর তাঁহার কাছে যথেষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে না। 'বলাকা'র ঝড়ের 'ঝঙ্কারের' স্থলে বাজিয়া উঠিয়াছে 'শেষ রাগিণীর বীণ্'। কবি ফিরিয়াছেন সুষম ও সুমিত

ছন্দের যুগে—নানা শোভন স্তবক ও সুঠাম চরণ পুনরায় তাঁহার কাব্যের বাহন হইয়াছে। এই যুগের কিছু কিছু কবিতা তানপ্রধান এবং কদাচ বল-প্রধান ছন্দে রচিত হইয়া থাকিলেও, ধ্বনিপ্রধান ছন্দ-ই এখন তাঁহার কবিতার প্রধান বাহন, এবং যে পুলক-হিল্লোলে এখন কবির চিত্ত আন্দোলিত, তাহা ধ্বনিপ্রধান ছন্দেরই 'ললিত-গীত-কলিত-কল্লোলে' ব্যক্ত হইয়াছে। তবে যেখানে তাঁহার মননশীলতা ও চিন্তাসম্পদের পরিচয় আছে, সেখানে কবি তানপ্রধান ছন্দই ব্যবহার করিয়াছেন এবং অষ্টাদশ মাত্রার মিত্রাক্ষর অমিতাক্ষরই হইয়াছে তাহার বাহন। কদাচ তুই-একটি কবিতায় 'বলাকা'ব ছন্দেব প্রয়োগ আছে ; সেখানে পুলক-হিল্লোলের পরিবর্ত্তে ধ্বনিত হইয়াছে একটা বাস্তবাতীত অভিজ্ঞতার অথবা একটা বাস্তবদ্রোহী প্রেরণার সুর। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি কবিতার মর্ম্মবাণী তাহার ছন্দেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে,—এ কথা রবীন্দ্রকাব্যের সব যুগেই সত্য।

(৫)

ইহার পরে 'পুনশ্চ', 'শেষসপ্তক' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচনার সময় রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-সাধনার ইতিহাসে একটা বৈপ্লবিক রীতির প্রবর্ত্তন দেখা যায়। এই সময়ে তিনি গদ্যকবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। 'বলাকা'য় রবীন্দ্রনাথ যে ছন্দে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বিষমগতি এবং পরিপাটীর বন্ধন হইতে এক রকম মুক্ত হইলেও তাহা পদ্যছন্দ। তাহার উপকরণ পদ্যের পর্ব্ব, পদ্যছন্দের নির্দ্দিষ্ট রীতিতেই প্রত্যেটি পর্ব্ব সুগঠিত। কিন্তু এই গদ্যকবিতার উপকরণ পদ্যের পর্ব্ব নহে, সাধারণ গদ্যের-ই এক-একটি phrase বা অর্থবাচক শব্দসমষ্টি। এ ক্ষেত্রে পর্ব্বের বা পর্ব্বাঙ্গের মাত্রা, যতির অবস্থান

ইত্যাদি কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। তবে গদ্যকবিতায় এক-একটি পঙ্‌ক্তি ও তাহার এক-একটি বিভাগের দৈর্ঘ্য ও গুরুত্ব হইতে ভাবের আরোহ ও অবরোহের পরিচয় পাওয়া যায়, এবং অন্য এক প্রকারের ছন্দের (rhythm) আভাস ফুটিয়া উঠে। পঙ্‌ক্তির প্রত্যেকটি বিভাগে স্বাভাবিক উচ্চারণ-পদ্ধতি অনুসারে যে কয়েকটি শ্বাসাঘাত পড়ে, তাহার দ্বারা এক-একটি বিভাগের গুরুত্বের তারতম্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কোনও নির্দ্দিষ্ট 'পরিপাটী' নহে, কেবলমাত্র ভাবপ্রবাহের গতির অনুসরণেই পঙ্‌ক্তি ও বিভাগের দৈর্ঘ্য নিরূপিত হইয়া থাকে। 'পুনশ্চ' গ্রন্থের 'ছুটির আয়োজন' বা 'শেষ সপ্তকে'র 'পঁচিশে বৈশাখ' প্রভৃতি রচনা গদ্যকবিতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

কিন্তু গদ্যকবিতা গদ্যের উপকরণে লেখা হইলেও তাহা কবিতা; শুধু যে কবিতার বিশিষ্ট ভাব ইহাতে আছে তাহা নয়, কবিতার ভাব-রূপও গদ্যকবিতায় আছে। ছন্দোময় গদ্য ও গদ্যকবিতা এক নহে। ছন্দোময় গদ্যের বহু উৎকৃষ্ট উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের 'ধর্ম্ম' 'স্বদেশ' প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। প্রকাশ্য সভায় তিনি যে সমস্ত ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহাতেও অনেকে একটা বিশিষ্ট ছন্দোগুণ লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু গদ্যের ছন্দ ও গদ্যকবিতার ছন্দ এক নহে। গদ্য-ছন্দের গতি মূলতঃ কুটিল; কাব্যছন্দের তথা গদ্য কবিতার ছন্দ মূলতঃ সরল। গদ্যছন্দের এক-একটি আবর্ত্ত হইতেছে এক-একটি যুক্তিময় বাক্য; গদ্যকবিতার এক-একটি আবর্ত্ত হইতেছে এক-একটি ভাবময় পঙ্‌ক্তি, অনুভূতির এক-একটি ক্ষুদ্র উচ্ছ্বাস। গদ্যছন্দে স্তবক রচনার কোন প্রবৃত্তি থাকে না, গদ্যের বাক্য-পরম্পরায় গঠিত হয় এক-একটি অনুচ্ছেদ; গদ্যকবিতায় স্তবকের গঠনরীতি বা তাহার আভাস থাকে। পদ্যের চরণের ন্যায় গদ্যকবিতার পঙ্‌ক্তিতে সাধারণতঃ দুইটি হইতে

চারটি মাত্র বিভাগ থাকে, ছন্দোময় গদ্যে চারের অধিক বিভাগ প্রায়ই দেখা যায়। গদ্যকবিতায় পদ্যের সুস্পষ্ট 'পরিপাটী' না থাকিলেও তাহাতে একটা অব্যক্ত তালের ইঙ্গিত আছে, ছন্দোময় গদ্যে সুর থাকিলেও তাহাতে এরূপ কোন তালের আভাস নাই। ছন্দোময় গদ্য যুক্তির দ্বারা আর গদ্যকবিতা অনুভূতির দ্বরো নিয়ন্ত্রিত। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে রসানুভূতির যে সূক্ষ্ম স্পন্দন আছে, কবি তাহারই আভাস গদ্যকবিতায় দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু এখানে পদ্যছন্দের শাসন তিনি মানিয়া চলেন নাই।

এইজন্য গদ্যকবিতা রচনা করা (এবং ঠিক মত পড়া) সুকঠিন। রবীন্দ্রনাথের পদ্যছন্দের অনুসরণ করিয়া বহু কবিই সাফল্য লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার গদ্যকবিতার সার্থক অনুকরণ অদ্যাপি কেহই করিতে পারেন নাই। পদ্যছন্দের একটা আদর্শ আছে, সে আদর্শের মধ্যে একটা সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্য আছে সে কথা সত্য, কিন্তু সে আদর্শের জগৎ বাস্তব জগৎ হইতে এক হিসাবে স্বতন্ত্র। সে জগতে আমাদের বাস্তব জগতের কথা উপাদান হিসাবে স্থান পাইতে পারে বটে, কিন্তু তখন সে কথায় অন্য রকমের একটা সুর আসিয়া পড়ে, পরিচিত জগৎ অভিনব একটা সৃষ্টিতে পরিণত হয়। কিন্তু বাস্তব জগতের যে একটা নিজস্ব অব্যক্ত সুর আছে, গদ্যকবিতায় তাহাই ধরিয়া রাখার চেষ্টা করা হয়। যে প্রেরণা হইতে পদ্যের উদ্ভব, তাহাতে গদ্যকবিতা রচনা করা যায় না। গদ্যকবিতার বস্তু পদ্যছন্দে ফেলিলে শুধু তাহার রূপ নয়, তাহার রসও অন্যবিধ হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন, 'অনেক কথা আছে যা কখনই মিলের কবিতায় লেখা চলে না।···গদ্যেও নয়, মিলেও নয়, একমাত্র গদ্য-কবিতাতেই যথার্থ সুন্দর ভাবে প্রকাশ হতে পারে এমন কথাও আছে।

যখন গদ্যকবিতা লেখা হ'ত না, তখন সেগুলো লেখাই হ'ত না।… সমস্ত ছবিটা বাদ দিয়ে এতটুকু ভাবরস ছেঁকে তুলতে হোতো, তাতে বাদ পড়ত অনেক।…('পরিশেষ' কাব্যের) 'কিনু গোয়ালার গলি' অন্য কোন ছন্দেই চলত না,…লিখলে সে একেবারে অন্য জিনিষ হোতো, এ জিনিষ নয়।…কবিতার মতো লাইন না বেঁধে গদ্যের মতোও (গদ্যকবিতা) লেখা যেতে পারে, তবে পড়বার সুবিধার জন্য ফাঁক দেওয়া চাই, গদ্য-কবিতা পড়া শক্ত।'

যে সময়ে রবীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতা রচনা করেন, সেই সময়ের উপলব্ধির সহিত এই অভিনব রীতির একটা সামঞ্জস্য আছে। এই যুগের রবীন্দ্রনাথ বাস্তব সত্যের দ্রষ্টা ও দার্শনিক। যথার্থ **realism** বা বাস্তবতা এই সময়েই তাঁহার রচনায় প্রকট হইয়াছে। কোন অতিবাস্তব সত্তা বা সৌন্দর্য্য এখন আর কবির প্রতিপাদ্য নহে, বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতিই এখন তাঁহার প্রেরণার উৎস। তাহার 'অর্থ কিছু' বুঝিবার কোনও ক্ষমতা তাঁহার নাই, তাহার কোন ব্যাখ্যা বা অপব্যাখ্যা করার মত ধৃষ্টতাও তাঁহার নাই, নিজের কোন কল্পনা বা আদর্শ তাহার উপর আরোপ করিবার প্রবৃত্তিও তাঁহার নাই। নিজের কল্পনা ও আদর্শ পরিহার করিয়া একান্ত ভাবে বাস্তব বৈচিত্র্যের মধ্যে কবি এই সময়ে যে প্রেরণা লাভ করিলেন, কোন রকম পদ্য ছন্দেই তাহার যোগ্য প্রকাশ হইতে পারে না। কারণ, পদ্য মানেই এক প্রকার রূপকল্পের অনুকরণ অর্থাৎ কোন আদর্শের অনুসরণ। এই জন্য গদ্যকবিতাই এখন হইয়াছে তাঁহার কাব্যসরস্বতীর বাহন।

(৬)

জীবনের শেষ সীমায় মৃত্যুর দেহলিতে পৌঁছিয়া কবি পুনশ্চ একটা অলৌকিক উপলব্ধিতে অনুপ্রাণিত হইলেন, 'প্রান্তিক' হইতে 'শেষ

লেখা' পর্য্যন্ত রচনার সময়ে তাঁহার কাব্যে এই উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। বাস্তবের বিচিত্র যবনিকা এখনও তাঁহার চক্ষের সম্মুখে প্রসারিত ; কিন্তু সে যবনিকার পশ্চাতে একটা আলোকের উদ্ভাসন তিনি লক্ষ্য করিতেছেন। যবনিকা ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে, কিন্তু এখনও তাহা অপসৃত হয় নাই, 'অন্তরীক্ষে দূর হতে দূরে—অনাহত সুরে···সোনার ঘণ্টা' ঢং ঢং করিয়া বাজিতেছে, তাহারই একটা ক্ষীণ প্রতিধ্বনি এখন তিনি শুনিতে পাইতেছেন। ফলে বাস্তব তাঁহার কাছে 'ছন্দভাঙ্গা অসঙ্গতি' বলিয়া মনে হইতেছে, তাঁহার মন এখন বাস্তব ছাড়িয়া 'পরীর দেশে' 'গানের সুরের ডানা' মেলিয়া যাইতে উৎসুক। ইহার ফলে তাঁহার ছন্দ-সাধনাতেও একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিল। কবি পুনরায় বিচিত্র পদ্যছন্দে কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

জীবনের ও কাব্যসাধনার শেষ পর্ব্বে যখন যোগীর দিব্যদৃষ্টি দিয়া চরম রহস্য কবি প্রত্যক্ষ করিলেন, তখন আবার নূতন এক প্রকার ছন্দোবন্ধ তিনি প্রবর্ত্তন করিলেন। ইহাতে গদ্যকবিতার অবাধ গতির সহিত মিলিত হইয়াছে পদ্যছন্দের স্পন্দন। ইহার উপকরণ পদ্যের পর্ব্ব, কিন্তু এই পর্ব্বের সমাবেশের মধ্যে পদ্যের কোন রীতিই নাই। মিত্রাক্ষরও নাই, কোন স্তবক বা 'পরিপাটী'র আভাসও নাই। গদ্য-কবিতায় যে ভাবে অর্থসূচক শব্দসমষ্টির সমাবেশে এক-একটি পঙ্‌ক্তি গঠিত হয়, সেই ভাবেই এখানে পদ্যের পর্ব্বের সমাবেশে এক-একটি চরণ রচিত হইয়াছে। ইহাই যথার্থ free verse বা মুক্ত ছন্দ ; 'বলাকা'র ছন্দে যাহার সূচনা, ইহাতেই তাহার পরিশেষ। 'শেষ লেখা'র 'তোমার সৃষ্টির পথ' প্রভৃতি কবিতা ইহার উদাহরণ। মুক্তি-সন্ধানী কবির শেষ লেখা যে মুক্তছন্দে রচিত হইবে, ইহাই বোধ হয় সমুচিত।

(৭)

রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-সাধনার যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া হইল তাহা হইতে রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের মূল প্রবৃত্তি কি কি, সে বিষয়ে কিছু কিছু সিদ্ধান্ত করা যায়। রবীন্দ্রনাথ চিরজীবন-ই বিচিত্রের সন্ধান করিয়া গিয়াছেন। যাহা সনাতন ও চিরাচরিত তাহাকে তিনি আঁকড়াইয়া কখনই থাকেন নাই, নব নব রূপের সন্ধান-ই তিনি করিয়াছেন। কোনও প্রাচীন ছন্দোরীতি-ই তিনি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন নাই, সর্ব্বদাই তাহাকে নূতন একটা রূপ দিবার প্রয়াস করিয়াছেন। তিনি নিজে যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার মধ্যেও ঐক্য ও সৌযম্য অপেক্ষা বৈচিত্র্যই বিশেষ লক্ষণীয়। কিন্তু কোনও বিশেষ ছন্দোরীতি-ই তাঁহার প্রতিভার চরম অভিব্যক্তি এ কথা বলা যায় না। যে বিচিত্রের তিনি সন্ধান করিয়াছেন, নব নব রূপের মধ্যে তাহার আভাস লক্ষ্য করিলেও তাহার স্বরূপ তিনি কখনও প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাঁহার মর্ম্মবাণী কোন বিশিষ্ট ছন্দোবন্ধে চূড়ান্ত ভাবে প্রকাশিত হয় নাই। 'অজানা হইতে অজানায়' চিরকালই তিনি অগ্রসর হইয়াছেন।

জীবনে ও ছন্দে রবীন্দ্রনাথ বৈচিত্র্যপন্থী হইলেও তিনি পুরাতনকে ঢালিয়া সাজাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাকে নূতন রূপ দিয়া ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সনাতন পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দোবন্ধ, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ও সনেট্ ইত্যাদি সকল কিছুর মূল তত্ত্বকে তিনি নব ভাবে রূপায়িত করিয়াছেন, বিস্তৃততর পরিধির মধ্যে বিকশিত করিয়াছেন। যে আধুনিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দোরীতির তিনি প্রবর্ত্তন করেন, তাহার সম্ভাবনা প্রাচীন ছন্দোরীতির মধ্যেই অন্তর্নিহিত ছিল। গদ্যকবিতা-ই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বৈপ্লবিক সৃষ্টি, কিন্তু তাহাতেও

পুরাতন ছন্দোবন্ধের অন্ততঃ একটা ভাবরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। একেবারে সমস্ত রীতির এবং আদর্শ বা 'পরিপাটী'র বন্ধন হইতে মুক্ত কবিতা বোধ হয় তিনি কখনই রচনা করেন নাই, তাঁহার তথাকথিত মুক্তছন্দও সম্পূর্ণ ভাবে 'মুক্ত' নহে। 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়' মুক্তির সাধনাই তিনি করিয়া গিয়াছেন, শুধু জীবনে নয়, ছন্দেও। প্রাচীন রীতির বন্ধন হইতে তাঁহার ছন্দ উত্তরোত্তর মুক্তির দিকে অগ্রসর হইলেও তাঁহার ছন্দ সর্ব্বদাই নব নব বিচিত্র রূপকল্পের প্রভাব স্বীকার করিয়াছে। যদি কোনও ছন্দকে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট ছন্দ বলিতে হয়, তবে বোধ হয় 'বলাকা'র ছন্দই সেই অভিধার যোগ্য। এখানে কোনও 'পরিপাটী'র একটা বাঁধা ছাঁচ নাই, কিন্তু পদ্যের মূল উপকরণ আছে এবং বহু বিচিত্র চরণের ও স্তবকের আভাস ক্ষণে ক্ষণে ফুটিয়া উঠিয়া আবার নূতন কোন আভাসের মধ্যে বিলীন হইয়া যাইতেছে। আকাশমার্গে উড্ডীন বলাকার ন্যায় এই ছন্দ মুক্তগতি, কিন্তু প্রাচীন পৃথিবীর আকর্ষণ সর্ব্বদাই ইহার মধ্যে আছে। রবীন্দ্রনাথের জীবন্মুক্তির প্রতীক এই ছন্দেই যেন প্রকৃষ্ট ভাবে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত নূতন নূতন চরণ ও স্তবক সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার গঠনরীতি আলোচনা করিলে রবীন্দ্রমানসের আর একটা প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। নৃত্যচপল ছন্দের দিকে তাঁহার একটা বিশেষ প্রবণতা আছে। এইজন্য ত্রিপদীর লক্ষণাক্রান্ত চরণের প্রতি তাঁহার একটা পক্ষপাত দেখা যায়। সম অপেক্ষা অসম বা বিষম গতি-ই তাঁহার রুচিকর। তিনি যে বহুবিধ স্তবক রচনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে যেগুলির বহুল ব্যবহার,—সেগুলি, হয়, মধ্যক্ষামা, না হয়, জঘনচপলা। বলা বাহুল্য, নৃত্যছন্দের সহিত

এই সমস্ত স্তবকের গঠনরীতির ও গতির একটা মিল আছে। যে আধুনিক মাত্রাবৃত্ত পদ্ধতির তিনি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতেও পর্ব্বের মধ্যে দ্বিমাত্রিক অক্ষর সংযোজনার ফলে একটা নৃত্যের হিন্দোল ফুটিয়া উঠে।

পরিশেষে বলা যাইতে পারে যে রবীন্দ্রছন্দের লক্ষণাদি বিচার করিলে মনে হয় তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে একটা নারীসুলভ প্রবণতা ছিল। এই মন্তব্যের মধ্যে রবীন্দ্রপ্রতিভা সম্বন্ধে কোন দুর্ব্বলতার ইঙ্গিত নাই। হয়ত সৌন্দর্য্যবোধ ও সৌন্দর্য্যসৃষ্টির দিক্ হইতে বিচার করিলে বলা উচিত যে, নারীপ্রকৃতির মধ্যেই মানবচিত্তের সুকুমার বৃত্তিগুলির মহত্তর বিকাশ ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রছন্দের অনুপ্রাসবাহুল্য, ঝঙ্কারমুখরতা, নৃত্যচঞ্চলতা, উচ্ছ্বাসপ্রবণতা, গতিলালিত্য, সুরের তীব্রতা, আবেগের আরোহ ও অবরোহের ক্ষিপ্রতা ও আকস্মিকতা, শিহরণ ও দ্রুত স্পন্দন, বৈচিত্র্য-মুখিতা ইত্যাদি অনেকগুলি স্থূল ও সূক্ষ্ম লক্ষণ একত্র মিলাইয়া বিবেচনা করিলে এই মতের সত্যতা প্রতিপন্ন হয়। রবীন্দ্রকাব্যে অনুভূতির গভীরতা, ভাবের গাম্ভীর্য্য, আদর্শের মহত্ত্ব ইত্যাদি সমস্ত গুণই অবশ্য আছে, কিন্তু তাঁহার কাব্যের রূপ ও প্রকাশভঙ্গির যে স্বকীয়তা আছে, তাহা নারীসুলভ। 'যে ভাবে রমণীরূপে আপন মাধুরী আপনি বিশ্বের নাথ করিছেন চুরি'—সেই ভাবই রবীন্দ্রনাথের ছন্দে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নির্ঘণ্ট

(বিষয়সূচী)

---

* সঙ্কেত সূত্র পা. > পাদটীকা

দ্র° > দ্রষ্টব্য

নির্ঘণ্ট

(গ্রন্থসূচী)

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২২	১৫	জগদাহুরনীশ্বরম্	জগদাহুরণীশ্বরম্
”	১৬	কামহেতুকম্	কামহৈতুকম্
৩৯	১৫	উপলদ্ধি	উপলব্ধি
৪৩	শেষ	মহত্ত্বম	মহত্তম
৬৪	৭	দ্বদ্ধ	দ্বন্দ্ব
৭৫	৭	Juvenalia	Juvenilia
১০৪	৯	প্রেমলীলা	প্রেমশীলা
১২১	১০	শুদ্ধতার	স্তব্ধতার
১২৯	৬	ইপ্সিত	ঈপ্সিত
১৫৩	১৪	নূতম	নূতন
১৭৩	৬	কৃচ্ছ	কৃচ্ছ্র
১৭৪	৫	মন্ত্রে	মন্দ্রে
১৯১	শেষ	বিষরে	বিষয়ে
১৯৪	২	নিমেষনিহিত	নিমেষনিহত
২০২	৬	বিশেয	বিশেষ
২০৯	৬	রসানুভূাত	রসানুভূতি
২১০	২	টুকু	টুকু
২১৫	৩	ভাবাভার	ভাবাভাব

নির্ঘণ্টে ১৯৫র অতিরিক্ত যে সংখ্যাগুলি আছে তাহা হইতে ১ বিয়োগ করিয়া লইতে হইবে।

কবিগুরু

প্রথম সংস্করণ সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত

"রবীন্দ্রকাব্যের মর্মবাণী, রবীন্দ্রনাথের সাধনা এবং রবীন্দ্রকাব্যের ক্রমবিকাশ এই তিন পর্য্যায়ের আলোচনায় অধ্যাপক অমূল্যধন রবীন্দ্রকাব্যের মূল সূত্রগুলি যেমন নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তেমনি রবীন্দ্রপ্রতিভার ক্রমবিকাশকেও তাঁহার সুদীর্ঘ কাব্যসাহিত্যের আলোচনার ভিতর দিয়া ধারাবাহিক ভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। আলোচনার মর্মস্থলে সূক্ষ্ম একটি ঐতিহাসিক পারম্পর্য ধারা অনুসৃত হইলেও, আলোচনার ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে লেখক আগাগোড়া রসবিচারকেই মুখ্য বস্তুরূপে গণ্য করিয়াছেন—তাহার ফলেই জড় তথ্যের ভারে অধ্যায়গুলি ভারাক্রান্ত হয় নাই।···লেখক রসজ্ঞ, তাঁহার দৃষ্টি অন্তর্মুখী, বিশ্লেষণও প্রাণধর্মী—তাই সাহিত্য-সমালোচনার নিরূপিত গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তাঁহার বইটি সত্যকার সৎ সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। সমগ্রভাবে বইটির ভিতর দিয়া লেখকের যে জাগ্রত রসদৃষ্টি ও বিচারশক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। আশা করি রবীন্দ্র-সাহিত্য-সমালোচনা বিষয়ক অন্যান্য বিশিষ্ট গ্রন্থগুলির সহিত অধ্যাপক অমূল্যধনের এই বইটিও বাংলা ভাষায় স্মরণীয় হইবে। —যুগান্তর

"অধ্যাপক অমূল্যধনের উদ্যম অভিনব।···তিনি অতি নিপুণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।···অমূল্যধন বাবুর আলোচনা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।··· এই গ্রন্থে রসিক ও জিজ্ঞাসুগণ ভাবিবার ও বুঝিবার অনেক বিষয় পাইবেন, সম্পূর্ণ নূতন পথে রবীন্দ্রকাব্য লইয়া আলোচনার নানা ইঙ্গিত পাইবেন ও সাহস পাইবেন; আমাদের এই দাগা বুলানোর দেশে চিন্তাশক্তির চিরদুর্ভিক্ষ দশায় সে বড় অল্প আশার কথা নহে।" —আনন্দবাজার পত্রিকা

"রবীন্দ্রনাথকে লইয়া উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের কবিগুরু। অমূল্যবাবু···অপূর্ব বিশ্লেষণ বিচারের দ্বারা তাঁহার মর্মবাণী উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন এবং তাঁহার বিচিত্র সাধনার সহিত সাধারণ পাঠকের পরিচয় সাধন করিয়াছেন।" —শনিবারের চিঠি

অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

আধুনিক সাহিত্য-জিজ্ঞাসা

॥ বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে একটি মূল্যবান সংযোজন ॥

মূল্য ৬·০০ টাকা

—কয়েকটি অভিমত—

"শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় বয়োপ্রবীণ এবং সাহিত্যের সমালোচক হিসাবে খ্যাতির অধিকারী। বলা বাহুল্য, তাঁর এই খ্যাতির সূচনা রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায়; অন্তত ছন্দ বিষয়ে তাঁর অমূল্য গবেষণা তৎকালেই তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর সমকালীন অধিকাংশ সমালোচক যখন অতীত কীর্তি ও পুরনো ধারণার উঞ্ছবৃত্তিতে মগ্ন, সেই সময়, আধুনিক কালে প্রাচীন ও নবীনের সার্থক সেতু-সম্ভাবনা তাঁর রচনায় মেলে। বর্তমান গ্রন্থ—আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসা —এক হিসেবে উল্লিখিত ধারণার পরিপূরক।"...

"সাহিত্য-সমালোচনা কেবল বিচার নহে, 'তাহাও এক প্রকারের সৃষ্টি' গ্রন্থকারের এই প্রাসঙ্গিক উক্তি সমগ্র গ্রন্থটিতে আদর্শ হিসেবে ব্যবহৃত।"...

—দেশ ৪।১১।৬১

"গ্রন্থকারের নিজেরই স্বীকৃতি রয়েছে যে, তিনি সনাতনী। তবে একালের সাহিত্যের রসগ্রহণে তাঁর আন্তরিকতা অনস্বীকার্য। বস্তুত তাঁর প্রসারিত দৃষ্টি, তাঁর ভাবনার অনুভবের ব্যাপ্তি থেকে এই আন্তরিকতা উৎসারিত। একালের সাহিত্যপাঠে যে আনন্দ তিনি পেয়েছেন এবং কেন পেয়েছেন, তাই তিনি যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন।...জীবনের গভীরতম উপলব্ধি প্রকাশের বিচিত্র প্রয়াস হিসেবে তিনি একালের সাহিত্যকে সানন্দে গ্রহণ করেছেন। আসলে সাহিত্যের একটা ধ্রুবরূপ আছে তা তিনি মনে করেন না। বইটিতে তাঁর সাহিত্য-বিচারের যে পদ্ধতি প্রকাশিত তাতে মনে হয়, ধ্রুপদের নানা গৌরব তাঁকে টানে, তবে টপ্পা ঠুংরীতেও তাঁর রুচি রয়েছে।"

—আনন্দবাজার ১০।৯।৬১

Dr. Subodhchandra Sengupta, ***Professor of English, Jadavpur University says :-***

"...Readers of this collection will be struck by the wide catholicity of the author's tastes and his infectious enthusiasm for literature. The essays range over various fields of Bengali literature, drama, poetry, novel, criticism and belles letters, and there are a few incursions into English literature also. Surveying the many schools of criticism in Bengali, the author says that

criticism proper awakens our mind and heart and not only reveals the poet or his poetry but also lets us into the deeper meaning of life; true criticism is charged with human significance. The author believes in this theory as an ideal and has also practised it in the essays under review.

There are illuminating comments of Bankimchandra and Rabindranath, Girish Chandra Ghosh as a dramatist and D. L. Roy as a writer of comic songs, on Bernard Shaw and Whitman, but these comments are not merely exercises in critical gymnastics, they also knit us through the works of these masteros to a closer understanding of life"... —*Amrita Bazar Patrika 8/10/61*

যুগান্তরের সহ-সম্পাদক **শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত** লিখেছেন—

"জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হঠাৎ এক-একজন মানুষের দেখা মেলে, যাঁরা হাতের কাজে যতটা ফোটেন, তাঁদের ভিতরের মানুষটা থাকে তার চেয়ে অনেক বড়। অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় এমনি একজন মানুষ। দেশী ও বিদেশী সাহিত্যে তাঁর বোধ ও বিদ্যা যতটা, সে তুলনায় লেখা তাঁর কতটুকু ?...

সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর এই প্রবন্ধ সংগ্রহটি পড়ে প্রকৃতই আনন্দিত ও উপকৃত হয়েছি। সাহিত্যের মূলতত্ত্ব বা সাহিত্যধর্ম সম্বন্ধে যেমন এতে কয়েকটি গভীর চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে, তেমনি বাংলা সাহিত্য ও বিদেশী সাহিত্যের বিশিষ্ট স্রষ্টাদের সম্বন্ধেও কয়েকটি সত্যিকার বিচারাত্মক প্রবন্ধ গ্রথিত হয়েছে। সাহিত্যে চিরন্তনতা বনাম আধুনিকতার দ্বন্দ্ব আজকের নয় এবং এ দ্বন্দ্বের হয়ত ষোলো আনা সমাধানও কোনোদিন হবে না। কিন্তু অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় এই দ্বন্দ্বের আলোচনায় যে সুস্থ ও অপ্রমত্ত বিচারশক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে অনেকের পথ দেখার সহায়ক হবে। বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, দেবেন্দ্রনাথ সেন ও শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে এতদিনেও আর নূতন কথা বোধ হয় কিছু বলার নেই। তবু বেশ দু-চারটি নূতন কথাই পেলাম মনে হল তাঁর রচনার মধ্যে। বার্নার্ড'শ প্রবন্ধটিতে শুধু নূতন কথা নয়, একটু নূতন উপলব্ধিরও সাক্ষাৎ হল। একটা জিনিষ যা বেশী মুগ্ধ করল, সে হল প্রবীণ অধ্যাপকের মননভঙ্গীর সজীবতা। যুগ ও জীবনের প্রবহমাণ ধারাকে নস্যাৎ না করে, দরদের সঙ্গে বুঝতে চেয়েছেন তিনি, এবং তাঁর বিচার বয়সের কুয়াসামুক্ত, তাই নির্মল ও সত্যনিষ্ঠ।... —যুগান্তর ৪।৬।৬১

"...লক্ষ্য করবার বিষয় প্রবন্ধগুলি কোথাও পণ্ডিতম্মন্য হয়ে ওঠেনি, পাঠককে ছাত্র ব'লে ধরে নেওয়া হয়নি। 'জিজ্ঞাসাটা' সাহিত্যের তত্ত্ব অপেক্ষা সাহিত্যের রস গ্রহণের প্রতিই বিশেষ দৃষ্টি রেখেছে। ফলে প্রবন্ধগুলি সৃষ্টিমূলক এবং সাহিত্যের মর্যাদাসম্পন্ন হ'য়ে উঠেছে।...প্রবন্ধকার নিঃসন্দেহে কৃতকার্য হয়েছেন।"... —আকাশবাণী ২৯।৭।৬১